

রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৫৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : রথযাত্রা ১৩৬০
তৃতীয় সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১৫-এ ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট ও আর্ট প্লেট
মোহন প্রেস
২ করিসচার্চ লেন
কলিকাতা ৯

বাঁধিয়েছেন
মডার্ণ বাইণ্ডাস

দাম : পাঁচ টাকা

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত
করকমলে

ভূমিকা

তখন ইংরাজি ১৯৪২ সালের প্রথম দিক্। জাপানী বোমার আতঙ্কে কলিকাতা জনহীন প্রায়। প্রতিকার না করিলে নয়—অথচ প্রতিকারের উপায় হাতে নাই; তখন কোনো একটা গুরুতর কাজের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতে পারিলে পারিপার্শ্বিক বিস্মৃতির এক প্রকার শান্তি পাওয়া যায়। এই রকম অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির বিস্তৃত আলোচনাতে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম।

কাজটি হাতে লইবার সময়ে তাহার বিরাটত্ব বুঝিতে পারি নাই। কাজের মধ্যে অনেকটা অগ্রসর হইবার পরে, ফিরিবার পথ যখন সংকীর্ণ, তখন বুঝিলাম যে, বিষয়টি যেমন মনে করিয়াছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল, অনেক বেশি ব্যাপক। কাজ খানিকটা অগ্রসর হইলে বিষয়ান্তর মনকে আকর্ষণ করিল। অনেক বিষয়ে যাহার লিখিবার অভ্যাস কোনো একটি বিশেষ বিষয় তাহাকে দীর্ঘকাল আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে না। ফল হইল এই যে, রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। কখনো কখনো দুই-চারিটা অধ্যায় সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থাকারে সজ্জিত করিতে আর উৎসাহ পাই নাই। বুঝিলাম সম্পূর্ণ শেষ করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ হইয়া উঠিবে না। তাই খণ্ডশ প্রকাশ করা স্থির করিলাম। প্রথম খণ্ড বাহির হইল। এখন দেখি যদি প্রকাশিত পুস্তকের মোহ বাকি খণ্ডগুলিকে প্ররোচিত করিয়া বাহির করিতে পারে। দ্বিতীয় খণ্ডে তত্ত্বনাট্য, তৃতীয় খণ্ডে বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত নাটক এবং চতুর্থ খণ্ডে প্রাসঙ্গিক সাধারণ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু সে ইচ্ছাই, ততোধিক কিছু মনে করিতে কাহাকেও বলি না।

এই গ্রন্থ কাহার কাজে লাগিবে?

রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী পাঠক বিষয়ের গৌরবে বইখানা একবার দেখিবেন বলিয়া মনে হয়। সাধারণ পাঠকের আকর্ষণ হইবার কথা নয়, হইলে বই-খানা পড়িতে অন্তত মন্দ লাগিবে না, মাঝে মাঝে সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি আছে, আর কিছু না হোক রবীন্দ্রসাহিত্যের নমুনা তো পড়া হইবে।

পরীক্ষার্থী ছাত্রসমাজের কি এ বই কাজে লাগিবে? আমাদের দেশে যে রীতিতে পরীক্ষা হইয়া থাকে তাহাতে না লাগিবারই কথা। এদেশের ছাত্র-সমাজে পাঠ্য বই লিখিবার জন্য বিশেষ এক রীতি অনুসৃত হয়। ছাত্র-পাঠ্য সাহিত্যের বাহিরে সেই রীতি বা সেই সব লেখকের বড় দেখা পাওয়া যায় না। অনেকের ধারণা আমাদের ছাত্ররা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সব বিষয়েই সমাজের অগ্রণী, কেবল বই পড়িবার সময় পশ্চাৎপদ কল্পনা করিয়া যাঁহারা ছাত্র-পাঠ্য সরল পুস্তক লিখিয়া থাকেন—তাঁহারা আর যাই করুন ছাত্রসমাজের প্রতি সম্মান দেখান না। এ বইখানা আমি বিশেষভাবে ছাত্রসমাজের জন্য লিখি নাই—এবং সেই জন্যই ভরসা করিতেছি তাহাদের কাজে লাগিবে, আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্কের রসদ যোগাইতে পারিবে—এমন কি পরীক্ষা ব্যাপারেও হয় তো অকেজো হইবে না।

এই গ্রন্থ প্রণয়নের সূচনায় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আনুকূল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশের উপলক্ষে ডাঃ মুখোপাধ্যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃ-পক্ষকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

লেখক

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এবারে পুস্তকখানিতে নূতন একটি অধ্যায় ও একটি নির্ঘণ্ট সংযোজিত হওয়াতে বইয়ের আকার কিছু বাড়িল, মূল্যও কিছু বাড়িল।

প্রকাশক

সূচী

প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রধান বাহন কবিতা ও গান। কবিতা ও গানের পরেই নাটককে তাঁহার প্রতিভার বাহন বলা যাইতে পারে। কি সংখ্যার বিচারে, কি রসের বিচারে কবিতার নীচেই রবীন্দ্রসাহিত্যে নাটকগুলির স্থান ; নাটকের সংখ্যাও বড় অল্প নয়। তাহা ছাড়া নাটকের সংস্করণান্তর ও নামান্তর বিষয়টিকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছেন। কোনো কোনো নাটককে কবি তিন চার বার অবধি পরিবর্তন করিয়াছেন ; অনেক পরিবর্তন এখনো পাণ্ডুলিপিতেই আবদ্ধ, মুদ্রিত মূর্তি পায় নাই, কাজেই তাঁহার নাটকের সম্যক্ আলোচনা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু আর-একদিক দিয়া বিচার করিলে কাজটি তেমন কঠিন নয়। তাঁহার কবিতার মতোই তাঁহার নাটকেরও, বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনারই, একটিমাত্র মূল সুর। কবি জীবনস্মৃতিতে বলিতেছেন—

"আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্য ভাবে নানা-বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।"

বাস্তবিক ইহাই রবীন্দ্রসাহিত্যের মূলতম সূত্র। রবীন্দ্রসাহিত্যের বিস্তীর্ণ ও জটিল জগতে এ সূত্র অবলম্বন করিয়া প্রবেশ করিলে পাঠক অনেক বাধা উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। লেখকের রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর এবং রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ নামক গ্রন্থদ্বয় এই সূত্রেরই টীকা ও ভাষ্য। আবার এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহের মধ্যেও অবতীর্ণ হওয়া যাইতে পারে। স্বয়ং কবিকর্তৃক স্বীকৃত মূল সুর বা সূত্রটিকে মনে রাখিলে তাঁহার নাটকের সংখ্যা ও ভাবের জটিলতা অনেক পরিমাণে সরল হইয়া সহজ আয়ত্ত হইয়া পড়িবে।

অনেক সময় নাটকের কারুখচিত বৈচিত্র্যের অন্তরালবর্তী আইডিয়াটিকে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়, কিন্তু দৃষ্টি একবার অভ্যস্ত হইয়া আসিলে সত্য

আপনি ধরা দিবে। কবির তত্ত্বপ্রধান নাটকগুলিতে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া তেমন কঠিন নয়; কাহিনীপ্রধান নাটকে কিছু কঠিন, কিন্তু কঠিন বলিয়াই তাহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। দুইটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি সহজ হইবে। চিত্রাঙ্গদা ও চিরকুমার সভা লইয়া আলোচনা করা যাক। এ দুটিকে কেহ নিশ্চয় তত্ত্বপ্রধান নাটক বলিবেন না, এমন কি এ দুটির মধ্যে যে সীমা ও অসীমের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা থাকিতে পারে তাহাই বিস্ময়কর লাগিবে। তবু আছে।

চিত্রাঙ্গদার দ্বন্দ্ব তাহার ধার-করা বাহিরের সৌন্দর্যের সঙ্গে ভিতরকার নিত্য-সত্তার। তাহার ভাষায়—'অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতীন'। চিত্রাঙ্গদা কিছুতেই এ দুয়ের বনিবনাও করিয়া লইতে পারিতেছে না। অবশেষে এই দ্বন্দ্ব তাহার পক্ষে এমন মর্মান্তিক হইয়া উঠিল যে, বাহিরের দৈহিক সৌন্দর্যকে বিদায় করিয়া দিয়া সে অন্তরের আমিত্বের মুখরক্ষা করিতে বাধ্য হইল। ইহা রূপান্তরে ভাবান্তরে সান্ত ও অনন্তের দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নয়, কবি যাহাকে বলেন 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা'। মানুষের দেহ স-সীম, তাহার 'আমি' সীমাহীন; আর এই দুইটি বিপরীতগুণ-সম্পন্ন বলিয়া নিরন্তর ইহাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের আর অবসান নাই। চিত্রাঙ্গদার সমস্যা মানুষ মাত্রেরই সমস্যা—ওইখানে চিত্রাঙ্গদার সহিত মানব-সমাজের মিল। চিত্রাঙ্গদা যেভাবে সমস্যার সমাধান করিয়া লইল তাহা আদর্শ না হইতে পারে, কিন্তু সমস্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। এ সমস্যা রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল সমস্যা।

চিরকুমার সভার সভ্যগণ মানবপ্রকৃতির দাবি লঙ্ঘন করিয়া মনগড়া একটা আদর্শকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, অপমানিত মানবপ্রকৃতি সভ্যদের উপরে প্রতিশোধ লইল। ইহাও একপ্রকার প্রকৃতির প্রতিশোধ। চিরকুমার সভায় যে আইডিয়া লঘুভাবে চিত্রিত হইয়া প্রহসন হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই গভীরতর রেখায় 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে অঙ্কিত। প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকখানি ট্রাজেডি। চিরকুমার সভার সভ্যগণ সান্ত মানবপ্রকৃতির উপরে মনগড়া আদর্শের সীমাহীন সত্তাকে বসাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, এ এক-প্রকার ভ্রান্তি। চিত্রাঙ্গদার ভ্রান্তি আবার আর-একপ্রকার। সীমাহীন আমির মুখে সে ধার-করা দৈহিক সৌন্দর্যের মুখোশ পরাইয়াছিল, তাহার ফলে রমণীর সীমাহীন অন্তঃপ্রকৃতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। চিত্রাঙ্গদা ও চিরকুমার সভা—দুইই ভ্রান্ত, তবে দুইয়ের ভ্রান্তি দুইশ্রেণীর।

কবির মূল আইডিয়াটি কিভাবে তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই সামান্য উদাহরণ স্বরূপ দুটি নাটকের আলোচনা করা গেল।

কিন্তু একটি কথা ভুলিলে চলিবে না যে, 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা' তাঁহার সমস্ত রচনার মূলগত ভিত্তি হইলেও রবীন্দ্র-সাহিত্যে সীমা ও অসীমের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে ইহা ধরিয়া লওয়া উচিত হইবে না। সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্বের লীলাই রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ, যদি কোথাও এ দুইয়ে সমন্বয় ঘটিয়া থাকে তবে তাহা উপরি লাভ। আমার নিজের ধারণা, রবীন্দ্রসাহিত্যে এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনে এ দুইয়ে সম্পূর্ণ মিলন ঘটিয়া ওঠে নাই, অর ঘটিয়া ওঠে নাই বলিয়াই একপ্রকার অশান্তি তাহার মধ্যে শেষ পর্যন্ত বিরাজমান ছিল, এই আত্মিক অশান্তিই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার বীণাকে ঝংকৃত করিয়া রাখিয়াছিল। সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্বের সমাধান কিভাবে হইয়াছে বা হইতে পারে তাহা সাহিত্যসমালোচকের এলাকা বহির্ভূত, এ দুইয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনুসরণই সমালোচকের কর্তব্য—রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহে তাহাই করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

গীতিনাট্য

বাল্মীকি-প্রতিভা

বাল্মীকি-প্রতিভা ১৮৮১-তে প্রকাশিত। পর বৎসর ১৮৮২-তে কালমৃগয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

"১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসে (২০-এ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬) পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হইয়া 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়, কালমৃগয়ার কিয়দংশ তখনই ইহাতে যুক্ত হয়।"[১]

"পরে, এই গীতিনাট্যের (কালমৃগয়ার) অনেকটা অংশ বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।"[২]

"মায়ার খেলা ১২৯৫ (১৮৮৮) সালের অগ্রহায়ণে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।...মায়ার খেলার প্রথম সংস্করণ ও বর্তমান সংস্করণে প্রভেদ অতি সামান্য।"[৩]

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বর্তমানে প্রচলিত বাল্মীকি-প্রতিভা আসলে তাহার পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। কালমৃগয়ার বহুলাংশ বাল্মীকি-প্রতিভায় যুক্ত হওয়াতে তাহা অচলিত সংগ্রহের পূর্বে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। মায়ার খেলা প্রায় অবিকল আছে।

এক্ষণে বাল্মীকি-প্রতিভার প্রথম সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। পরিত্যক্ত কালমৃগয়াও ঐ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। মায়ার খেলা রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই তিনখানিই যদিচ গীতিনাট্য তবু ইহাদের মধ্যে জাতিগত ভেদ আছে। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়াতে নাট্যরস মুখ্য, সঙ্গীত গৌণ; আর মায়ার খেলাতে গীতিরসই প্রধান—নাট্যরস গৌণস্থান অধিকার করিয়াছে। বস্তুত মায়ার খেলাই বিশুদ্ধ গীতিনাট্য।

"এই দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি-প্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলির অধিকাংশই দিশি, কিন্তু গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশা করি একথা

---

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৫৪৮।

২ জীবনস্মৃতি, বাল্মীকি-প্রতিভা, র-র, ১৭শ খণ্ড, পৃ ৩৮২।

৩ র-র, ১ম খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬২৯-৬৩।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সঙ্গীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসঙ্গত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সঙ্গীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসঙ্কোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল। বাল্মীকি-প্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি গানভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতি-দাদার রচিত গতের সুরে বসানো—এবং গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া।······বস্তুত, বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সঙ্গীতের একটি নূতন পরীক্ষা—অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার স্বাদগ্রহণ সম্ভব নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে বাল্মীকি-প্রতিভা তাহা নহে—ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র—স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে।······

"হর্বর্ট স্পেন্সরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না—কথার সঙ্গে সুর থাকে, এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ সঙ্গীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন। আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমানসঙ্গত রীতিমত সঙ্গীত নহে। ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ, ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই—একটা লয়ের মাত্রা আছে, ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা—কোনো বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকি-প্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।

"বাল্মীকি-প্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া।···

"ইহার অনেক কাল পরে মায়ার খেলা বলিয়া আর একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়া ছিল।"[১]

সঙ্গীতের এই নূতন পরীক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলেও নানা কারণে বাল্মীকি-প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই নাটক লিখিবার সময়ে তিনি যে অপূর্ব উত্তেজনা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনেকটা বাল্মীকির ছন্দ-লাভের 'অপূর্ব উদ্বেগে'র অনুরূপ। সঙ্গীতের নূতন পরীক্ষা, যৌবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে চৈতন্য, অভিনয়ের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ সব মিলিয়া কবিকে যেন মত্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

"বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ঐ দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সঙ্গীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক একটি অপূর্বমূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে সকল সুর বাঁধানিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত।

"এইরূপ একটা দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাটক লেখা। এই জন্য উহাদের মধ্যে তালবেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি বাংলার বাছ-বিচার নাই।...

"তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না;—তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সঙ্গীতের অবিরলবিগলিত ঝরনা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ ছড়াইয়া দিতেছে; তখন নব-যৌবনে নব নব উদ্যম নূতন

১ জীবনস্মৃতি, বাল্মীকি-প্রতিভা, র-র, পৃ ৩৮১-৩৮৩।

নূতন কৌতূহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে; তখন সকল জিনিসই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, কিছু যে পারিব না এমন মনেই হয় না; তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুর ভাবে ঢালিয়া দিতেছি—আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে এমন করিয়াই পদক্ষেপ করিয়াছি।"[১]

বাল্মীকি-প্রতিভা সম্বন্ধে আর-একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে বাল্মীকির ছন্দ-লাভ কাহিনীটির প্রতি কবির মনের একটি স্বাভাবিক নিগূঢ় আকর্ষণ ছিল—খুব সম্ভব এই আকর্ষণ তাঁহার অগোচরে তাঁহাকে এই কাহিনীর দিকে টানিয়া উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। পরিণত বয়সেও এই কাহিনীর উত্তেজনা পুনরায় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায়।

আদিকবির ছন্দ-লাভ যে-কোনো কবির পক্ষেই আকর্ষণজনক; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনে যেন ইহার বিশেষ অর্থ ছিল। সরস্বতী কর্তৃক বাল্মীকিকে বীণা উপহারদান—বাল্মীকিকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার

'আমি বীণাপাণি, তোরে শিখাতে এসেছি গান,
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ প্রাণ...'

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে আশ্চর্যভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহা বিস্ময়কর ভাবে Prophetic।

রবীন্দ্রনাথই এখানে বাল্মীকি, তিনিই নূতন ভারতবর্ষের আদিকবি।

রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে এই নাটকের ঘটনার কিছু কিছু প্রভেদ আছে। বাল্মীকির কালীপূজা, সরস্বতীর বালিকার ছদ্মবেশে বাল্মীকিকে ছলনা নূতন। এই বালিকাটির ছলনায় ও করুণায় আগে হইতেই বাল্মীকির মন বিগলিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছিল, এমন সময়ে চূড়ান্তরূপে আসিল ক্রৌঞ্চ-বধের ঘটনা। পূর্ব হইতেই বাল্মীকির হৃদয়কে এই নূতন অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া কবি রামায়ণের ঘটনার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

বাল্মীকির কালীপূজা পরিত্যাগ ও জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর আরাধনার মধ্যেও গভীরার্থ নিহিত আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। যথাস্থানে ইহার আলোচনা করিয়াছি।

বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়ার বনদেবীগণ ও মায়ার খেলার অদৃশ্য মায়া-কুমারীগণ—একই ভাবের রকমফের মূর্তি। ইহারা অনেকটা বিদেশী নাটকের

১ জীবনস্মৃতি, বাল্মীকি-প্রতিভা, পৃ ২০৪-২০৬।

কোরাসের অনুরূপ—নাটকের মূল অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। তানপুরায় যেমন গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত মূল সুরটিকে ধরিয়া রাখে, অনেকটা তেমনি। ইহারাই নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাটকের 'গানের দল'-এ পরিণত হইয়াছে।

কালমৃগয়া বাল্মীকি-প্রতিভার মতো উল্লেখযোগ্য নহে, কারণ বাল্মীকি-প্রতিভার ঘটনার প্রতি কবি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন, ইহাতে তাহার অভাব ছিল। কালমৃগয়ার ঘটনার প্রতি কবির যে আকর্ষণ তাহা কেবল শিল্পগত, মর্মগত নহে। বিশেষ, বাল্মীকি-প্রতিভার প্রাথমিক সাফল্যকে কবি পুনরায় কালমৃগয়ায় অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—এ রকম প্রচেষ্টা প্রায়ই সার্থক হয় না। খুব সম্ভব এই সব কারণেই কালমৃগয়ার যতটা-সম্ভব অংশ বাল্মীকি-প্রতিভার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া কবি পরবর্তী কালে কালমৃগয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মায়ার খেলা

মায়ার খেলা গীতিনাট্য হইলেও অন্য জাতের নাটক। ইহাতে সঙ্গীতটাই মুখ্য, নাট্যঘটনা নিতান্ত গৌণ; কাজেই এই গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথের গীতি-প্রধান প্রতিভা বিকাশের যেমন পূর্ণ সুযোগ ঘটিয়াছে, তেমনি আবার নাট্য-ব্যাপার গৌণ হইয়া পড়াতেও তাঁহার সুবিধা হইয়াছে। নাটকের ঘটনা-শৃঙ্খলা ইহাতে এমনি অস্পষ্ট যে, পাছে বুঝিতে অসুবিধা হয় তাই একটি বস্তু-সংক্ষেপ ইহার প্রথম সংস্করণের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

মায়ার খেলার গল্পাংশ সংক্ষেপে এই রকম। অমর মানসী প্রতিমাকে জগতে খুঁজিতে বাহির হইল, শান্তা যে তাহাকে নীরবে ভালোবাসে তাহা জানিতেও পারিল না।

প্রমদার উপবনে আসিয়া হাস্যময়ী চপলা প্রমদাকে দেখিয়া সে ভালো-বাসিয়া ফেলিল। অমরকে দেখিয়া প্রমদার মনেও ভালোবাসার উন্মেষ হইল। কিন্তু লজ্জাতে কেহ কাহাকেও প্রেম নিবেদন করিতে পারিল না। অমর দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, শান্তার প্রেম তাহার প্রতি নিশ্চল আছে। সে শান্তাকে বিবাহের আয়োজন করিল। ইতিমধ্যে অমরের সন্ধানে সখীগণ সহ প্রমদা মিলনোৎসবের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। "সহসা অনপেক্ষিত ভাবে উৎসবের মধ্যে বিষাদ-প্রতিমা প্রমদার নিতান্ত দীন

করুণভাব অবলোকন করিয়া নিমেষের মতো আত্মবিস্মৃত অমরের হাত হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িয়া গেল। উভয়ের এই অবস্থা দেখিয়া শান্তা ও আর সকলের মনে বিশ্বাস হইল যে, অমর ও প্রমদার হৃদয় গোপনে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা আছে। তখন শান্তা ও সখীগণ অমর ও প্রমদার মিলন সংঘটনে প্রবৃত্ত হইল। প্রমদা কহিল—'আর কেন! এখন বেলা গিয়াছে, খেলা ফুরাইয়াছে, এখন আর আমাকে কেন। এখন এ মালা তোমরা পরো, তোমরা সুখে থাকো।' অমর শান্তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল—'আমি মায়ার চক্রে পড়িয়া আপনার সুখ নষ্ট করিয়াছি, এখন আমার এই ভগ্নসুখ ম্লানমালা কাহাকে দিব, কে লইবে?'—শান্তা ধীরে ধীরে কহিল—'আমি লইব। তোমার দুঃখের ভার আমি বহন করিব। তোমার সাধের ভুল, প্রেমের মোহ দূর হইয়া জীবনে সুখনিশা অবসান হইয়াছে—এই ভুলভাঙা দিবালোকে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার হৃদয়ের গভীর প্রশান্ত সুখের কথা তোমাকে শুনাইব।' অমর ও শান্তার এইরূপে মিলন হইল—"[১]

মায়ার খেলার কবিলিখিত প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে আছে—"আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটিকার সহিত এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারি সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।"

পূর্বরচিত সেই নাটিকাটি 'নলিনী'। ইহা এক্ষণে অচলিত সংগ্রহের ১ম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে।

'নলিনী'র গল্পাংশ এইরূপ।

নীরদ নলিনীকে ভালোবাসিত। বালিকা স্বভাবত চপলা—তখনো তাহার হৃদয়ে প্রেমোন্মেষ হয় নাই; সে নীরদের ভালোবাসার প্রতিদান দিতে পারে নাই।

নীরদ বিদেশে গিয়া প্রেমময়ী গম্ভীর নীরজাকে বিবাহ করিয়া দেশে আনিল।

ইতিমধ্যে নলিনীর হৃদয়ে প্রেমোন্মেষ হইয়াছে, সে এখন নীরদের বিরহে মৃতপ্রায়।

নীরজা উভয়ের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিল। মৃত্যুশয্যায় শুইয়া সে নীরদ ও নলিনীর মিলন করাইয়া দিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

১ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, মায়ার খেলা, ১ম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

দুইটি নাটকের মধ্যে ভাবের ঐক্য আছে বটে। দুটি নাটকেই প্রেমের দুটি করিয়া মূর্তি দেখানো হইয়াছে। প্রেমের একটি রূপ চপল, হাস্যময়, মোহ তাহার প্রধান অঙ্গ। আর একটি মূর্তি গভীর, গম্ভীর, তাহাকে প্রেমের আশ্রয় বলা যাইতে পারে। স্বভাবত মানুষ প্রেমের চপলতায় মুগ্ধ হয়, কিন্তু চপলতা বেশি দিন শান্তি দিতে পারে না, আবার সে অবজ্ঞাত অনাদৃত প্রেমের আশ্রয় স্বরূপে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। প্রেমের মোহ-ভঙ্গ হইলে তবেই প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ে।

'নলিনী' নাটকে নলিনী প্রেমের চপল মূর্তি। সে নিজেও যেমন হৃদয়ের ইঙ্গিত বুঝিতে পারে নাই, নীরদও তেমনি ভুল করিয়াছে। গম্ভীর প্রেমময়ী নীরজাকে নীরদ বিবাহ করিল; নীরজা ভগ্নমোহ প্রেমের পরম আশ্রয়।

নীরদ শেষ পর্যন্ত এই আশ্রয়স্বরূপিণীকে ত্যাগ করিয়া নলিনীকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল, কিন্তু দুঃখভোগের দ্বারা নলিনীও তখন তাহার পূর্ব চপলতা পরিহার করিয়াছে; তখন সে প্রেমের স্বরূপ খানিকটা যেন বুঝিতে পারিয়াছে।

কবি মায়ার খেলাকে নলিনীর সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। বাস্তবিক মায়ার খেলা নলিনী নাটকের ভাবগত সংশোধন ছাড়া আর কিছু নয়।

নলিনী ১৮৮৪-তে লিখিত; মায়ার খেলা ১৮৮৮-তে। এই চারি বৎসরের অভিজ্ঞতা কবিকে কিয়ৎপরিমাণে প্রেমের স্বরূপ বুঝিতে যেন সাহায্য করিয়াছে; তাহারই ফলে নলিনীর ভাবগত ভ্রান্তি মায়ার খেলায় কথঞ্চিৎ পরিমাণে শোধিত হইয়াছে।

অমর গম্ভীর-প্রকৃতি শান্তাকে অবহেলা করিয়া চপলা প্রমদাকে ভালো-বাসিল। কিন্তু ভালোবাসার প্রতিদান না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া সে শান্তাকে আশ্রয় করিল। ইতিমধ্যে প্রমদার প্রেমোন্মেষ ঘটিয়াছে, সে অমরের সন্ধানে যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন অমর ও শান্তার মিলনের পরম মুহূর্ত। অমরের মন পুনরায় প্রমদার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু এবারে প্রমদা বুঝিতে পারিয়াছে বাস্তবের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া ফল নাই—সে ফিরিয়া গেল। তখন অমর সঙ্কটে পড়িল, তাহার প্রত্যাখ্যাত প্রেম কে লইবে? শান্তা কি আর গ্রহণ করিবে? কিন্তু শান্তা অতিবড় রিয়ালিস্ট, সে অমরের প্রেম অম্লানচিত্তে গ্রহণ করিল।

মায়ার খেলা নাটিকায় কবি প্রেমকে আশ্রয়ে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। নলিনী নাটকেও প্রেম আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাস্তবের আঘাতে শেষ পর্যন্ত আশ্রয়টাই ভাঙিয়া পড়িল। নীরদ শেষ পর্যন্ত নলিনীর হাতে গিয়া পড়িল। এখানে নলিনীর প্রতিই অর্থাৎ প্রেমের মোহের প্রতিই যেন কবির অন্তরের আকর্ষণ; নীরজাকে অর্থাৎ প্রেমের আশ্রয়কে বাধ্য হইয়াই যেন আনিয়াছেন এবং প্রথম সুযোগেই মৃত্যুর সুলভ সমাধানের দ্বারা তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছেন।

মায়ার খেলাতে এত সহজ সমাধান তিনি গ্রহণ করেন নাই। দুঃখকে বাদ দিয়া প্রেমের কল্পনা তিনি করেন নাই। মায়ার খেলার অবসান প্রেমে, কিন্তু সে প্রেম দুঃখের সঙ্গে জড়িত। শান্তা, অমর, প্রমদা কেহই সুখী হইল না, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রেমের স্বরূপকে চিনিতে পারিল—ইহা সুখ না হইলেও মহৎ সান্ত্বনা।

এই দুটি নাটকেই দেখা যায় যে, প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরিণত ধারণার পূর্বাভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রথমত, তাঁহার ধারণা এই যে, প্রেমের পরিপূর্ণতার জন্য দুঃখ ও বিরহের প্রয়োজন আছে। এই ভাবটি কবির পরিণত বয়সের নাটক, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধে অবিরল।

মায়ার খেলাতে দেখি—শান্তা অমরকে বলিতেছে—

যদি কেহ নাহি চায়, আমি লইব,
তোমার সকল দুখ আমি সহিব।
আমার হৃদয় মন, সব দিব বিসর্জন,
তোমার হৃদয়-ভার আমি বহিব।
ভুল-ভাঙা দিবালোকে চাহিব তোমার চোখে,
প্রশান্ত মোহের কথা আমি কহিব।

শান্তা যাহা মৃদুভাবে, সমবেদনার সঙ্গে বলিয়াছে, চিত্রাঙ্গদাও ঠিক সেই ভাবটি আত্মপরিচয়ের শেষ মুহূর্তে প্রকাশ করিয়াছে। চিত্রাঙ্গদা সগর্বে, স্বহস্তে মোহযবনিকা অপসারিত করিয়া সাহসের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিয়াছে আর শান্তা ঘটনাচক্রে অপসারিত মোহযবনিকার প্রান্তে নীরবে প্রশান্তভাবে আসিয়া দেখা দিয়াছে।

প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ধারণা এই যে, প্রেমের মোহ বা

রোমান্সের চেয়ে মানুষের পক্ষে প্রেমের আশ্রয়ের প্রয়োজন বেশি। এই ভাবটিও কবির বহু রচনায় আছে।

প্রমদা ও নলিনী প্রেমের মোহ। শান্তা ও নীরজা প্রেমের আশ্রয়; চোখ মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা তাহাদের অল্প, কিন্তু জীবন স্নিগ্ধ করিবার ক্ষমতায় তাহারা অসাধারণ।

নলিনী নাটকে নীরজার মৃত্যুতে সেই আশ্রয়ভঙ্গ। মায়ার খেলাতে সেই আশ্রয়ে অমরের প্রত্যাবর্তন। প্রমদা কাঁদিল। তাহার আর উপায় কি? প্রেমের খেলায় "এখন কেহ হাসে, কেহ বসে ফেলে অশ্রুজল।" সুখের জন্য প্রেম নয়, এবং মোহে প্রেমের চূড়ান্ত নয়। "এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।"

দুখের মিলন টুটিবার নয়।
নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়।
নয়ন-সলিলে যে হাসি ফুটে গো,
রয় তাহা রয় চিরদিন রয়।

ইহাই মায়ার খেলার ধুয়া। আবার রবীন্দ্র-প্রেমতত্ত্বের ধুয়াও ইহাই।

রবীন্দ্র-প্রেমতত্ত্ব বলে যে—প্রেমের পূর্ণতার পক্ষে দুঃখের আবশ্যক। প্রেমে মোহ আছে বটে তবে তাহা প্রাথমিক মাত্র, সেই মোহ কাটাইয়া প্রেমের আশ্রয়ে পৌঁছানো দরকার—নতুবা প্রেম চিরস্থায়ী হয় না।

কিন্তু নাট্য, এমনকি গীতিনাট্য হিসাবে মায়ার খেলার অসাধারণত্ব নয়। গান হিসাবেই মায়ার খেলা অদ্বিতীয়। রবীন্দ্রনাথ মায়ার খেলার আগেও গান রচনা করিয়াছেন, কিন্তু মায়ার খেলায় আসিয়া তাঁহার গানের কলম যেন খুলিয়া গিয়াছে; তাহার কারণ, এতদিনে তিনি তাঁহার প্রতিভার অনুকূল জীবনবস্তু খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া tour-de-force, কিন্তু মায়ার খেলাতে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সাঙ্গীতিক প্রতিভার প্রথম ও অসংশয়িত উন্মেষ।

কাব্যনাট্য

চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ, গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ ও লক্ষ্মীর পরীক্ষাকে কাব্যনাট্য বলা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা, সতী ও লক্ষ্মীর পরীক্ষাতে নাটকের গুণ অপরগুলির চেয়ে কিছু বেশি পরিমাণে আছে, কিন্তু তাহা এত যৎসামান্য যে, কাব্যনাট্য পর্যায়ে ফেলিলে ইহাদের মর্যাদাহানির কোনো সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না।

এগুলিকে কাব্যনাট্য বলিবার তাৎপর্য এই যে, কাহিনী-রীতি এবং নাটকীয় রীতির সমন্বয়ে এগুলি গঠিত। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে কবির কৈশোর ও প্রথম যৌবনের রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সময়টাকে কবির বাহন-পরীক্ষার যুগ বলা হইয়াছে। তিন শ্রেণীর বাহন লইয়া তিনি পরীক্ষা সুরু করিয়াছিলেন; কাহিনী—যথা, বনফুল ও কবি-কাহিনী; নাটক—যথা, রুদ্রচণ্ড ও নলিনী; আর লিরিক বা গীতিশ্রেণীর কবিতা, যাহার অধিকাংশ স্থান পাইয়াছে শৈশব-সঙ্গীত সংগ্রহে। এই তিন শ্রেণীর বাহনকে মিলাইয়া মিশাইয়া আবার মিশ্রবাহন রচনা করিবার পরীক্ষাও কবি সঙ্গে সঙ্গে করিতেছিলেন; দৃষ্টান্তচ্ছলে বলা যায় যে, গান ও নাটকের মিশ্রণে রচিত বাল্মীকি-প্রতিভা এবং কালমৃগয়া; আবার নাটক ও কাহিনীর মিশ্রণে রচিত ভগ্নহৃদয়ের মতো কাব্যনাট্য। ভগ্নহৃদয়ের আকৃতিটা নাটকের হইলেও প্রকৃতিটা কাহিনীকাব্যের। পাছে আকৃতির মোহে পড়িয়া কেহ ইহাকে নাটক মনে করে তাই কবিকে ভূমিকায় বলিতে হইয়াছে যে "এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক না মনে করেন।" ইহা বস্তুত কাব্য এবং কাহিনীকাব্য; কবিকাহিনী ও বনফুলের সহিত প্রকৃতিগত ঐক্য তাহার, যদিচ আকৃতিতে নাটকীয় লক্ষণ দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

বর্তমান অধ্যায়ের কাব্যনাট্যগুলির আলোচনায় 'ভগ্নহৃদয়'-এর বিশেষ প্রয়োজন আছে, কারণ এগুলি ভগ্নহৃদয়ের মিশ্ররীতির পরীক্ষার পরীক্ষোত্তীর্ণ ফল। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে নাটক লিখিয়াছেন, কিন্তু দীর্ঘাকারের কাহিনীকাব্য আর লেখেন নাই, বনফুল এবং কবিকাহিনীর ধারা পরিত্যক্ত, কিন্তু একেবারে পরিত্যক্ত একথা বলা উচিত হইবে না, যেহেতু কাব্যনাট্য-পর্যায়ে কাহিনী-কাব্যের মিলন রহিয়া গিয়াছে। কাব্যনাট্য কাহিনী ও নাটকের মিশ্ররীতির রচনা।

এই মিশ্ররীতিই রবীন্দ্রনাট্যপ্রতিভার যথার্থ বাহন, সেই কারণে বর্তমান আলোচ্য কাব্যনাট্যগুলিকে রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহের শ্রেষ্ঠফল বলা যাইতে পারে। এই মিশ্ররীতিতে নাট্যকারের দায়িত্ব লঘু, অথচ কবির কৃতিত্ব-প্রকাশের অবকাশ প্রচুর, ফলে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা এখানে আপনার পক্ষ মেলিবার সুযোগ পাইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ কখনোই বিশুদ্ধ নাটকীয় কৌশলকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। নাটকের মূল রহস্য এই যে, নাট্যকারকে একই সঙ্গে নাটকের পাত্রপাত্রীর মনের গভীরতার মধ্যে তলাইয়া যাইতে হইবে আবার সেই সঙ্গে সমস্ত ঘটনাটিকে অনিবার্য পরিণামের দিকে দুর্নিবার বেগে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। গতির এই দ্বিত্ব গভীরতামুখী ও পরিণামমুখী, শ্রেষ্ঠ নাটকের লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ একই সময়ে এই দুই গতিকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে পারেন না, অন্তত সম্পূর্ণ-ভাবে, সুনিপুণভাবে পারেন না। তাঁহার প্রতিভার স্বাভাবিক প্রবণতা অন্তর্মুখী, পাত্রপাত্রীর মনের গভীরতার দিকে তাঁহার ঝোঁক বেশি; নাটকীয় পরিণামমুখী সক্রিয় সচলতার প্রতি তাহার একটা অবহেলার ভাব আছে। কাজেই বিশুদ্ধ নাটকে এই দ্বিত্বগতির বিপরীতমুখী প্রেরণায় তাঁহার প্রতিভা যেন আংশিক বাধাগ্রস্ত; কখনো কখনো অলৌকিক শক্তির সাহায্যে কতক পরিমাণে তিনি সফলতা লাভ করিয়াছেন, যেমন রাজা ও রাণীতে, মালিনীতে ও বিসর্জনে।

কিন্তু এই কাব্যনাট্যগুলির সুবিধা এই যে, ইহাতে পরিণামের অনিবার্য আহ্বান নাই; কেবল পাত্রপাত্রীর মানসিক গভীরতার বিশ্লেষণের সুযোগ আছে; পরিণামের তাগিদে বিশ্লেষণের বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া ছুটিবার প্রয়োজন ইহাতে নাই; রহিয়া বসিয়া গভীরতার মধ্যে তলাইয়া যাইবার ইহাতে প্রশস্ত অবকাশ। এই কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু ঘটনার সমগ্রতা নয়, ঘটনার এক একটি খণ্ড; পঞ্চাঙ্ক নাটকের ইহা যেন পঞ্চম অঙ্কটি।

এই কাব্যনাট্যগুলিতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, কিছুই ঘটিতেছে না; যাহা ঘটিবার তাহা পূর্বেই ঘটিয়াছে; এখন সেইসব ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ, এখন কেবল অনুতাপ ও পরিতাপ, আবেদন-নিবেদন ও আত্মসংবেদনের সুযোগ মাত্র আছে।

এই কাব্যনাট্যগুলির মধ্যে চিত্রাঙ্গদা লিখিত হয় সকলের আগে আর কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ সকলের শেষে; প্রথমটি ১৮৯২-এ, শেষতমটি ১৯০০-তে;

প্রথম ও শেষটির মধ্যে আট বৎসরের ব্যবধান থাকিলেও দেখা যাইবে মূলভাবের অসাধারণ ঐক্য। আর শুধু তাহাই নয়, ইহাতে ধর্মের যে আদর্শ, সামাজিক গুণের যে আদর্শ কবি স্থাপিত করিয়াছেন, ইহাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালেও সেইসব আদর্শ স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে।

কবির জীবনের একটা পর্বকে প্রাচীন ভারতে মানসভ্রমণের পর্ব বলা হইয়াছে। কল্পনায় প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যলোকের বার্তা; নৈবেদ্য প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মলোকের বার্তাবাহী আর কথা ও কাহিনী প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক মহত্ত্বের বার্তাবহনকারী। আলোচ্য কাব্যনাট্যগুলিকে, বিশেষভাবে গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদকে এই পর্বের অনুগত করিয়া দেখিতে হইবে; এইগুলিতেও প্রাচীন ভারতের আদর্শের মহত্ত্বকে স্থাপিত করিবার সেই একই চেষ্টা। চিত্রাঙ্গদা ও বিদায়-অভিশাপ রচনাকাল হিসাবে কিছু দূরস্থ বটে কিন্তু মূলভাবের অসঙ্গতি ঘটে নাই। চিত্রাঙ্গদা ও বিদায়-অভিশাপের সচেতন সৌন্দর্যলোক কল্পনা কাব্যের প্রেরণার অনুবর্তী। আর গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস ও কর্ণ-কুন্তী-সংবাদের বিরলসৌন্দর্য, অন্তর্মহৎ গম্ভীর আদর্শ নৈবেদ্য কাব্যের অনুষঙ্গ।

বিদায়-অভিশাপ

"দেবগণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৃহস্পতিপুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করেন। সেখানে সহস্র বৎসর অতিবাহন করিয়া এবং নৃত্যগীতবাদ্য দ্বারা শুক্রদুহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জনপূর্বক সিদ্ধকাম হইয়া কচ দেবলোকে প্রত্যাগমন করেন। দেবযানীর নিকট হইতে বিদায়কালীন ব্যাপার পরে বিবৃত হইতেছে।"

কবির পঞ্চভূত গ্রন্থের 'কাব্যের তাৎপর্য' অংশে বিদায়-অভিশাপ সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রত্যালোচনা আছে। তন্মধ্যে শ্রীমতী স্রোতস্বিনী যাহা বলিয়াছেন তাহাই অনুধাবনযোগ্য। "কচদেবযানী-সংবাদেও মানবহৃদয়ের এক অতি চিরন্তন এবং সাধারণ বিষাদকাহিনী বিবৃত আছে, সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেন তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।"

সহস্র বৎসরের শেষে বেদনায় রক্তাভ বিদায়ের সূর্যাস্তের পরমক্ষণটি সমাগত। যাহা ঘটিবার তাহা ঐ হাজার বছরে ঘটিয়া গিয়াছে, এখন আর

কোনো ঘটনা নাই, কেবল ভাবনা আছে, গত হাজার বছরের ভাবের শেষতম অনুবর্তন।

দেবযানী অত্যন্ত সুকৌশলে সুনিপুণভাবে ধীরে ধীরে হাজার বছরের সহস্রস্মৃতির বীণায় আঘাত করিয়া কচের মনে বাঞ্ছিত সুরটি ধ্বনিত করিয়া তুলিতে চায়। সে নিজের হৃদয়গ্রন্থটির পাতার পর পাতা উল্টাইয়া অন্তরতম অধ্যায়টি কচের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল; কিন্তু কচ কি তাহাকে ভালোবাসে? হায়, মুগ্ধ রমণী কেমন করিয়া বুঝিবে কাহার অন্তর আজ বিদ্রাবিত করিয়া বিদায়ের সূর্যাস্ত এমন পরম মনোহর হইয়া উঠিয়াছে?

কচ

আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখি! বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব?

কর্তব্যনিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে মর্মকথা প্রকাশ সহজ নয়, মর্মপথ অনুসরণ আরো কঠিন। বিদায়-অভিশাপের ইহাই ট্র্যাজেডি। দেবযানী স্বাধীন, কচ কর্তব্য-পাশে আবদ্ধ। দেবযানী প্রণয়ৈকসত্তা, কচ প্রেম ও কর্তব্যের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত। এ দুয়ের মধ্যে যদি কোনোটাকে ত্যাগ করিতে হয় তবে পৌরুষগর্বী পুরুষকে প্রণয়িনীকেই ত্যাগ করিতে হয়। দেবযানী কচকে অভিশাপ দিয়াছে যে, সে সঞ্জীবনীবিদ্যা শিখাইতে পারিবে, প্রয়োগ করিতে পারিবে না; কিন্তু এ অভিসম্পাতের কোনো প্রয়োজন ছিল না। সঞ্জীবনীবিদ্যা যদি নবজীবন-লাভের বিদ্যা হয়, জীবনের আনন্দকে পুনরায় লাভের বিদ্যা হয়, কচ কি আর স্বর্গে ফিরিয়া গিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিবে? তাহার যে জীবনটা এখানে তপোবনতরুতলে ছায়ার চেয়েও ম্লান হইয়া পড়িয়া রহিল তাহাকে কচ কি আর সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে? বিরহবেদনায় ভস্মীকৃত জীবনকে আর কি সে আনন্দলোকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিবে? নিজের হৃদয়ের প্রতি নিজের আয়ত্ত বিদ্যা প্রয়োগের ক্ষমতা আর তাহার রহিল না। এত দুঃখ সত্ত্বেও তাহার সান্ত্বনার স্থল থাকিত যদি দেবযানী তাহার মর্ম দেখিতে পাইত; সে দেবযানীর হৃদয় দেখিয়া গেল, কিন্তু নিজের হৃদয় দেখাইতে পারিল কই!

এই বেদনাই এ কাব্যের মৌলিক রস। ব্যর্থ প্রেম নয়, কারণ এ প্রেমে ব্যর্থতা নাই; পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা আছে, কিন্তু ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তাহারা পরস্পরকে বুঝিতে পারিতেছে না—ইহাই কাব্যের মৌলিক

বেদনা ; ইহা বোধকরি ব্যর্থ প্রেমের চেয়েও মর্মান্তিক। ব্যর্থপ্রেমে ফিরিবার পথটাই রুদ্ধ ; এখানে পথ আছে, আকর্ষণ আছে, কিন্তু ফিরিবার উপায় চিরকালের জন্য বিঘ্নিত।

কচ ও দেবযানীর সংলাপের মধ্য দিয়া প্রেমোন্মেষের বিশ্লেষণে কবি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রাথমিক পরিচয়ের বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাত্যহিক খুঁটিনাটির সূত্র ধরিয়া হৃদয়ের জটিল গোলক-ধাঁধার মধ্যে চলিতে চলিতে হঠাৎ একজায়গায় কচের বিদীর্ণ হৃদয়ের ফাটলে আশার আলোকরেখা দেখিয়া দিব্য স্পর্ধার সঙ্গে দেবযানী বলিয়া উঠিয়াছে—

ধরা পড়িয়াছ বন্ধু, বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে। এ বন্ধন নারিবে কাটিতে।
ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে।

প্রণয়স্পর্ধার এই পরম মুহূর্তে দেবযানী স্বয়ং ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া উঠিয়াছে ; সামান্য মানব সমালোচকের হাতের কলম 'মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো' তাহার পায়ের কাছে মূঢ় বিস্ময়ে মাথা নত করিয়া পড়িয়া থাকে ; আপন কর্তব্য ভুলিয়া যায়।

শ্লেষচতুরা দেবযানী প্রথমে স্বর্গের ঐশ্বর্য ও মর্ত্যের দীনতা, সুর-ললনাদের সৌন্দর্য ও মর্ত্যবাসিনীদের রূপহীনতা, কচের জন্য স্বর্গে যে গৌরব অপেক্ষা করিয়া আছে ও এখানকার তপোবনের অত্যন্ত অকিঞ্চিৎ-করতার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখাইয়া কচের প্রেমপ্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কচ কর্তব্যে অটল। সে বলিল—

সুকল্যাণ হাসে
প্রসন্ন বিদায় আজি দিতে হবে দাসে।

দেবযানী

হাসি ? হায় সখা, এ তো স্বর্গপুরী নয় !
পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্মমাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে,
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে। হেথা সুখ গেলে
স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
শূন্য গৃহে ; হেথায় সুলভ নহে হাসি।

স্বর্গে কায়া আছে ছায়া নাই; সুখ আছে কিন্তু সুখের স্মৃতি থাকে না। মর্ত্যের নিয়ম আর এক রকম।

ইহাতেও যখন কচের গাম্ভীর্য টলিল না, তখন দেবযানী পারিপার্শ্বিকের তারে আঘাত করিয়া কচের মনে বাঞ্ছিত সুর ধ্বনিত করিতে চেষ্টা করিল। এই সেই "সুন্দরী অরণ্যভূমি" যে "সহস্রবৎসর বল্লভ ছায়া" দিয়াছে; "এই সেই বটতল, যেথা তুমি প্রতিদিবসেই গোধন চরাতে" আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িতে; আর এই সেই কামধেনুটি স্বর্গপুরীর স্বাদ যাহার দুগ্ধে; আর ওই আমাদের "কলস্বনা স্রোতস্বিনী বেণুমতী";

হায় বন্ধু, এ প্রবাসে
আর কোনো সহচরী ছিল তব পাশে,
পরগৃহদুঃখবাস ভুলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রি দিন ধরে;
হায় রে দুরাশা!

কচ কি তাহাকে ভুলিতে পারে? সে যে নবজীবনের উষার মতো একদিন তাহার জীবনশৈলের শৃঙ্গে দেখা দিয়াছিল! তাহার স্মৃতি চিরদিনের জন্য কচের মর্ম-গ্রন্থিতে গাঁথা হইয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির ধাপে ধাপে উঠিয়া মানুষের দ্বারে পৌছানো রবীন্দ্রকাব্যের প্রথমার্ধের রীতি; দ্বিতীয়ার্ধে মানুষের ধাপে ধাপে উঠিয়া তিনি প্রকৃতির দ্বারে পৌছিয়াছেন; এইভাবে জীবনচক্রের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতি ও মানুষের মালা-বদল সম্পূর্ণ হইয়া দুইটি সত্তা দিক্‌মালাবলয়ে অখণ্ডভাবে বিধৃত হইয়াছে।

প্রেমস্পর্ধায় দেবযানী এমন মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছে যে, সে নিজেকে সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে কচের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে। আজ তাহার সিদ্ধিলাভের চরমক্ষণে সঞ্জীবনী বিদ্যা ও দেবযানী প্রার্থিনীরূপে সমাগত।

আজ মোরা দোঁহে এক দিনে
আসিয়াছি ধরা দিতে। লহ সখা চিনে
যারে চাও। বল যদি সরল সাহসে
বিদ্যায় নাহিক সুখ, নাহি সুখ যশে,
দেবযানী, তুমি শুধু সিদ্ধি মূর্তিমতী,
তোমারেই করিনু বরণ—নাহি ক্ষতি,

নাহি কোনো লজ্জা তাহে ; রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন।

দেবযানী বলিল—কচ তাহাকে খুশি করিয়া পিতার কাছে বিদ্যা লাভ করিবার উপায় খুঁজিয়াছিল, দীর্ঘকাল ধরিয়া সে দেবযানীকে প্রতারণা করিয়াছে।

কচ বলিল, সে প্রতারণা করে নাই—আর
ভালোবাসি কি না আজ
সে তর্কে কী ফল। আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ ব'লে
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগসম,
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্বকার্য মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে।

প্রেমৈকসত্তা দেবযানী ত্যাগের এ মহিমা বুঝিতে পারিবে না—তাহার কুলিশকঠোর নারীচিত্তে ত্যাগের স্থান নাই, ক্ষমার স্থান নাই। প্রস্থাননিষ্ঠ কচকে সে এই বলিয়া অভিশাপ দিল যে, সে সঞ্জীবনীবিদ্যা কেবল শিখাইতে পারিবে, নিজে কখনো প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে না।

কিন্তু দেখা গেল প্রেমতপস্বী কচ অনায়াসে বিদায়-মুহূর্তের সমস্ত গ্লানিকে মুছিয়া দিয়া দেবযানীকে আশীর্বাদ করিল—

আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে।
ভুলে যাবে সর্ব গ্লানি বিপুল গৌরবে।

দেবযানীই সুখী—তাহার সহস্রস্মৃতির কাঁটার উপরে আশীর্বাদের তিরস্করণী ঝরিয়া পড়িল আর হতভাগ্য কচ অন্তরে নিদারুণ ব্যর্থতা ও বাহিরে সার্থক সিদ্ধি বহন করিয়া প্রতীক্ষমাণ স্বর্গলোকে ফিরিয়া চলিল ; আপনাকে ছাড়া আর সকলকেই সঞ্জীবিত করিবার ক্ষমতা সে আজ লাভ করিয়াছে। প্রাণকে সঞ্জীবিত করিবার বিদ্যা সে শিখিয়াছে বটে, কিন্তু হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিবার বিদ্যা সে শিখিতে পারিল কই? দৈত্যরা বহুবার তাহাকে বধ করিয়াছে, দেবযানীর আগ্রহে দৈত্যগুরু প্রত্যেকবার তাহাকে জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, আজ বিদায়ের সময়ে সে অন্তরে মূর্ছিত হৃদয়কে বহন করিয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল, তাহার

আয়ত্ত বিদ্যায় তাহা সঞ্জীবিত হইবার নয়। যে পরম স্পর্শে তাহার হৃদয় সঞ্জীবিত হইতে পারিত, কর্তব্যের অনুরোধে, পৌরুষগর্বী কচ স্বেচ্ছায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

গান্ধারীর আবেদন

গান্ধারীর আবেদন যদি কাব্যমাত্র হইত, গান্ধারী ছাড়া অপর কোনো চরিত্র যদি ইহাতে না থাকিত, তবে ইহার যে-রস হইত, নাটক হওয়াতে সে-রসের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই কাব্যনাট্যে গান্ধারীর চরিত্র প্রধান হইলেও, ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত অপ্রধান হইলেও সে-ই ইহার নায়ক হইয়া উঠিয়াছে। কবির হয়ত ইচ্ছা ছিল গান্ধারী পাঠকের সমবেদনাকে সবচেয়ে বেশি করিয়া আকর্ষণ করুক, কিন্তু কার্যত তাহা হয় নাই; ধৃতরাষ্ট্রই পাঠকের সমবেদনার সকলের চেয়ে বড় অংশীদার। এমন হইবার কারণ ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রে ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্বজাত বেদনা আছে, গান্ধারীচরিত্রে তাহা নাই। রাজমাতার হৃদয়ে পুত্রদের পাপাচারজনিত মাতৃগর্বনাশী গ্লানি আছে, পুত্রত্যাগের দুঃখ আছে, কিন্তু ধর্মত্যাগের মহত্তর দুঃখ নাই। 'অন্তরে বাহিরে অন্ধ' ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রে পুত্রের জন্য ধর্মত্যাগের দুঃখ আছে; ধর্মত্যাগের জন্য গ্লানি আছে; এই দুঃখের বেদনাই তাহার শুভ্রশীর্ষে ট্র্যাজেডির আগ্নেয় কিরীট পরাইয়া দিয়াছে।

এই বিরাট পুরুষের চরিত্র ছাড়া আলোচ্য কাব্যে আর কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব-বিদীর্ণ চরিত্র নাই। গান্ধারীচরিত্রে সত্যকার দ্বন্দ্ব নাই, পুত্র ও ধর্মের মধ্যে কে রক্ষণীয় সে বিষয়ে তাহার কোনো ভ্রান্তি নাই; দুর্যোধনও সুনির্দিষ্ট পথের যাত্রী, রাজধর্ম ও লোকধর্মের মধ্যে কোন্ পথ অনুসরণীয়, সে বিষয়ে তাহার মনে কোনো প্রশ্ন নাই; কেবল অন্ধ পিতা উদ্যতদণ্ড বিধাতার পতনোন্মুখ গদার তলে বসিয়া স্বহস্তে পাপের সেতুবন্ধ ভাঙিয়া দিয়াছেন, তিনি বেশ জানেন তাঁহার কার্যের ফলে পুত্রকলত্র, রাজ্যসম্পদ, পুরাতন কুরুবংশ অচিরকালের মধ্যে রসাতলের মুখে ভাসিয়া যাইবে, কিন্তু যতক্ষণ না যায়—

> ততক্ষণ পিতৃস্নেহে কোরো না সংশয়,
> আলিঙ্গন কোরো না শিথিল, ততক্ষণ
> দ্রুতহস্তে লুটি লও সর্ব স্বার্থধন;

হও জয়ী, হও সুখী, হও তুমি রাজা
একেশ্বর।—ওরে, তোরা জয়বাদ্য বাজা।
জয়ধ্বজা তোল্ শূন্যে। আজি জয়োৎসবে
ন্যায় ধর্ম বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি রবে,
না রবে বিদুর ভীষ্ম, না রবে সঞ্জয়,
নাহি রবে লোকনিন্দা, লোকলজ্জা ভয়,
কুরুবংশরাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর—
শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার,
আর কালান্তক যম, শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ—আর নহে কেহ।

গান্ধারীর আবেদনের সার্থকতার পক্ষে নাটকটির অন্যান্য চরিত্র অবান্তর। গান্ধারীর আবেদন প্রথমে রাজার কাছে, অবশেষে ভগবানের কাছে। ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্থানের পরে গান্ধারীর উক্তিগুলিই তাহার মনোভাব প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট; বরঞ্চ ইহা নাট্যাকারে গ্রথিত না হইয়া একভাষণ কাব্যাকারে লিখিত হইলে সমস্ত বক্তব্য ঠাসবুনানিতে জমিয়া উঠিয়া যেন গভীরতর রসের সঞ্চার করিত; নাট্যাকারে লিখিত হওয়াতে পাত্রপাত্রীর সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে যেন অনেকটা রস গলিয়া গিয়াছে, পাঠকের পাতে পড়ে নাই। সতী ও লক্ষ্মীর পরীক্ষা ছাড়া এই পর্যায়ের সমস্ত কাব্যনাট্য সম্বন্ধেই ইহা সত্য।

এইরূপ হওয়াতে গান্ধারীর আবেদনের যে ক্ষতিই হোক বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা পৌরুষদর্পী স্বৈরশাসক দুর্যোধনকে পাইয়াছি। ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রের পতনোন্মুখ বিরাট অট্টালিকাকে পাইয়াছি; ভানুমতীর স্বল্পায়ত চরিত্রে দুর্যোধনের যোগ্য সহধর্মিণীকে পাইয়াছি; গান্ধারীর আবেদনের রচনারীতির কাল্পনিক ক্ষতির তুলনায়—এই তিনটি চরিত্র যথেষ্ট লাভ; দুঃখ করিবার কারণ নাই।

কপটদ্যূতে পরাজিত হইয়া পাণ্ডবেরা বনগমন করিতে উদ্যত হইলে গান্ধারী পাপাচারী পুত্রদের নির্বাসনের আদেশের জন্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদন করিতে আসিয়াছেন। দুর্যোধন গান্ধারীকে ভয় করে; পিতার অন্ধ স্নেহের উপরেই তাহার যাহা কিছু ভরসা; সে গান্ধারীর আগমনবার্তা শুনিবামাত্র প্রস্থান করিল।

ন্যায়ধর্ম-রক্ষার জন্য পুত্রকে নির্বাসিত করিবার আবেদন গান্ধারীর।

তুমি রাজা, রাজ-অধিরাজ,
বিধাতার বামহস্ত, ধর্মরক্ষা-কাজ
তোমা'পরে সমর্পিত।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে কথা বলিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার আবেদন সফল হইবার নয়, তখন তিনি বিধাতার নিকটে দণ্ডের জন্য আবেদন করিলেন।

হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি।

বিধাতার দণ্ড যখন পড়িবে তখন যে কেবল দুর্যোধন শাসিত হইবে এমন নয়, পাপী, পাপের ফলভাগী, পাপকে যাহারা বাধা দেয় নাই, যাহারা অলস-ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সকলকে পিষ্ট করিয়া বিধাতার উদ্যত গদা আসিয়া পড়িবে।

তার পরে যবে
গগনে উড়িবে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি—
হায় হায় হা রমণী, হায় রে অনাথা,
হায় হায় বীর-বধূ, হায় বীর-মাতা,
হায় হায় হাহাকার—তখন সুধীরে
ধূলায় পড়িস্ লুটি অবনত শিরে
মুদিয়া নয়ন। তার পরে নমো নমঃ
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি; নমো নমো নমঃ
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম।
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্বৃতি।
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি।

গান্ধারী নিশ্চিতভাবে জানে যে, তাহার আবেদনের ইহাই পরিণাম; এখন এই পরিণামের জন্য 'ছিন্নসিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্ত শতদলে' অর্ঘ্য রচনা করিয়া এই 'দারুণ করুণ শান্তি'র জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকাই একমাত্র কর্তব্য; গান্ধারী

সেই লগ্নের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছে, ভানুমতীকেও প্রস্তুত হইতে উপদেশ করিয়াছে।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে—পরে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিলেই চলিবে। রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্মই একমাত্র বস্তু যাহা রক্ষণীয়। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এই বস্তুর নাম ন্যায়ধর্ম; ন্যায়রক্ষা ধর্মরক্ষারই অঙ্গ; আর এই ন্যায়ধর্ম রক্ষার ভার রাজার উপরে, কারণ রাজা 'বিধাতার বামহস্ত', ধর্মরক্ষা-কাজ তাঁহার উপরে সমর্পিত। ন্যায়রক্ষা যে কেবল রাজনীতির সুবিধার জন্যই প্রয়োজন একথা রবীন্দ্রনাথ কখনো স্বীকার করেন না; ন্যায়রক্ষা ধর্মরক্ষার অঙ্গ বলিয়াই তাহা পালনীয়, আর রাজার উপরে সেই ভার বলিয়া রাজা সামাজিক কাঠামোর অপরিহার্য অংশ। সমস্ত সামাজিক গুণের মধ্যে ন্যায়কেই রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন; বিধাতা যে কেবল ন্যায়ের চরম রক্ষক তাহা নয়, তিনি স্বয়ং ন্যায়মূর্তি; বিধাতার পরেই নৃপতি, তিনি সংসারে বিধাতার প্রতিনিধি।

কাব্যে ও উপন্যাসে আদর্শচরিত্র আঁকিবার অভ্যাস রবীন্দ্রনাথের আছে। আদর্শচরিত্র ব্যক্তি সুখদুঃখের অতীত; তাহার প্রতি পাঠকের প্রশংসমান মনোভাব, একাত্মতার নয়; সে পাঠকের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তি; সত্যকথা বলিতে কি, সাহিত্যে আদর্শচরিত্র অঙ্কনের স্থান আছে কি না সে বিষয়েও তর্ক চলিতে পারে।

আদর্শমাতা গান্ধারী ও আনন্দময়ী; আদর্শপিতা পরেশবাবু; আদর্শভ্রাতা গোবিন্দমাণিক্য; আদর্শস্বামী নিখিলেশ; আদর্শবন্ধু দেবদত্ত, আর আদর্শ-মানুষ রামচন্দ্র (ভাষা ও ছন্দ)।

এই আদর্শরমণী গান্ধারীর প্রতি যে-একাত্মতার ভাব অনুভব করি না (গান্ধারীর তাহাতে প্রয়োজনও নাই), অন্তরে বাহিরে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাহা করি। আসন্ন বিপদের দিনে যে তাহাকে একান্ত আপন বলিয়া আশ্রয় করিয়াছে সেই পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম রক্ষা করিতে ধৃতরাষ্ট্র চাহেন না।

পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি, আমি তার
একমাত্র; উন্মত্ত তরঙ্গ-মাঝখানে
যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ তারে কোন্ প্রাণে

ছাড়ি যাব। উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি
তবু তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি,
তারি সাথে এক পাপে ঝাঁপ দিয়া পড়ি,
এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি
অকাতরে, অংশ লই তার দুর্গতির,
অর্ধফল ভোগ করি তার দুর্মতির,
সেই তো সান্ত্বনা মোর। এখন তো আর
বিচারের কাল নাই, নাই প্রতিকার,
নাই পথ, ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে।

ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের শেষ কথা। গান্ধারীর দৃপ্তদৃষ্টির অদৃশ্য আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া অন্ধ, অসহায়, নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ পিতার স্খলিতগতি-প্রস্থান পাঠকের সমবেদনার শেষ গণ্ডূষটি পর্যন্ত টানিয়া লয়।

সুস্থ মস্তিষ্কে বিচার করিলে দুর্যোধনের যুক্তির ফাঁকি ধরা অসম্ভব নয়, তাহার রাজনীতির চাল যে সর্বনাশা তাহাও বোঝা যায়, দুর্যোধনের ঈপ্সিত পথ যে সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের অর্ধ-শিলাখণ্ডের দ্বারা চিহ্নিত তাহাও পরিজ্ঞাত; কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্বে, দম্ভোক্তিতে কি-একটা অদৃশ্য সুরাসম আকর্ষণ আছে ক্ষণকালের জন্য পাঠককে যাহা আত্মবিস্মৃত করিয়া দেয়। ব্যক্তিত্বের চৌম্বক শক্তির উপরেই স্বৈর-শাসকদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। শাসন করিবার জন্যই তাহার জন্ম, তাহার ক্ষুদ্রতম কথাটিও প্রজাদের পক্ষে অনুশাসন, যত দিন জীবিত থাকিবে তাহার থামিবার উপায় নাই—আগাইয়া যাইতেই হইবে—আর তাহার পতনের ভৈরবরবের তাল পতন ধ্বনিতে দিগ্‌গজগণ যেন চমাকত হইয়া উঠিবে। যে-সব চরিত্র সমালোচকগণকে হতবুদ্ধি করিয়াছে দুর্যোধন-চরিত্র তাহাদের অন্যতম, দেবযানী-চরিত্র অন্যতম; ইহারা বিস্ময়ের, বিশ্লেষণের নহে।

এই নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে কাব্যোৎকর্ষের বিচারে গান্ধারীর আবেদন দুর্বলতম। দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের অংশ নিখুঁত; গান্ধারীর দীর্ঘ উক্তিগুলি অতিভাষণে পূর্ণ; পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর প্রবেশ প্রায়নিরর্থক। তা সত্ত্বেও যে ইহা বাঙালী পাঠকসমাজের এত প্রিয় তাহার কারণ সাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ। দুর্যোধনের দম্ভোক্তিতে 'কুর্জনীয়' দর্পিত অসৌজন্যের

আভাষ; ধৃতরাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন-আঘাত রাষ্ট্রনীতি যে বৃটিশ রাজনীতি হইতে খুব ভিন্ন এমন মনে করিবার কারণ নাই। আবার দুর্যোধনের—

এতকাল তব সিংহাসন
আমার নিন্দুকদল নিত্য ছিল ঘিরে,
কণ্টকতরুর মতো নিষ্ঠুর প্রাচীরে
তোমার আমার মধ্যে রচি ব্যবধান;
শুনায়েছে পাণ্ডবের নিত্য গুণগান,
আমাদের নিত্য নিন্দা।

কৌরব-পাণ্ডবকে ভিন্ন করিয়া রাখিয়া উভয়কেই দুর্বল করিবার এই ভেদনীতির মধ্যে যদি কোনো সমালোচক হিন্দু-মুসলমান শাসনের রাজকীয় নীতির আভাস দেখিতে পান, তিনি ভুল দেখিয়াছেন এমন মনে করিব না। ক্লাসিক্‌স্ মানেই সাহিত্যের সেই ধ্রুবপদ অংশ যাহা যুগে যুগে অবস্থাভেদে নূতনতর অর্থে জ্যোতিষ্মান হইয়া দেখা দেয়; প্রতি যুগ তাহার মধ্যে আপন অন্তর্নিহিত মহিমার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায়।

সতী

সতী নাটকের সহিত গান্ধারীর আবেদনের ঐক্য ও দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। এখানেও ধর্মরক্ষার জন্য মাতা-কর্তৃক সন্তান-পরিত্যাগ; মাতার গ্রাস হইতে বাঁচিবার জন্য সন্তানের পিতার আশ্রয় গ্রহণ; বিনায়করাও ধৃতরাষ্ট্রের মতোই সন্তান-বৎসল; রমাবাই গান্ধারীর মতোই ধর্মের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য নিষ্করুণ; কিন্তু সব উলটপালট হইয়া গিয়াছে দুই নাটকের ধর্মের আদর্শের ভেদে।

বিনায়করাও ও রমাবাই-এর কন্যা অমাবাই-এর বিবাহ স্থির হইয়াছিল জীবাজীর সহিত। কন্যাপক্ষ যখন বিবাহসভায় বিলম্বিত জীবাজীর জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছে তখন জীবাজীর শিবিকায় চড়িয়া বিজাপুররাজের এক মুসলমান সভাসদ আসিয়া উপস্থিত হইল। হতবুদ্ধি সভাস্থল হইতে অমাবাইকে হরণ করিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল। কিছু পরে বন্ধনমুক্ত জীবাজী আসিয়া উপস্থিত। তখন জীবাজী, বিনায়ক ও সভাস্থ সকলে হোমাগ্নিস্পর্শ করিয়া শপথ করিল যে, দস্যুকে বধ করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ তাহারা গ্রহণ করিবে।

ইতিমধ্যে অমাবাই বিধর্মী স্বামীকে ভালোবাসিয়া বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের সন্তানও হইয়াছে।

অনেকদিন পরে বিবাহরাত্রির সেই শপথ পালনের সুযোগ ঘটিয়াছে। রণক্ষেত্রে জীবাজী ও অমাবাই-এর স্বামী উভয়েই নিহত। অমাবাই বিনায়ক-রাও-এ সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। পিতা কন্যাকে বাগ্‌দত্ত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাইতে উপদেশ করিল। কিন্তু করুণায় যখন তাহার হৃদয় বিগলিতপ্রায় তখন রমাবাই আসিয়া উপস্থিত। পিতার করুণা মাতাকে স্পর্শ করিল না; সে জীবাজীর সৈন্যদের সাহায্যে কন্যাকে জীবাজীর সহিত এক চিতায় দগ্ধ করিবার আয়োজন করিল; অসহায় কন্যা অসহায়তর পিতাকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিল, কিন্তু বিনায়ক তখন নিরুপায়, সে রমাবাই-এর আদেশে সৈন্যগণ-কর্তৃক বন্দীকৃত। বাগ্‌দত্ত পতির সহিত অমাবাইকে স্থাপিত করিয়া চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইল, রমাবাই-এর ধর্মের আদর্শ রক্ষিত হইল।

ইহাই সতীর গল্পাংশ। শ্মশানক্ষেত্রের একটি মাত্র দৃশ্যে নাটকের সূচনা ও পরিণাম; পিতা ও কন্যার সংলাপের মধ্য দিয়া নাটকের পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে; পিতা, মাতা ও কন্যার সংলাপ ও কন্যাকে দাহ ঘটনারূপে দেখানো হইয়াছে; আগেই বলিয়াছি এই কাব্যনাট্যগুলির মধ্যে সতী নাটকেই নাটকের গুণ সবচেয়ে বেশি। এই নাটকটিকে একটি পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজেডির পঞ্চম অঙ্ক বলিয়া মনে করিলে নিতান্ত ভুল হইবে না; পঞ্চমাঙ্কের অনিবার্য পরিণামের প্রায় সকল লক্ষণই ইহার মধ্যে আছে।

বিনায়করাও ধৃতরাষ্ট্রের ছাঁচে ঢালাই-করা; ধৃতরাষ্ট্রের মতোই সন্তান-বাৎসল্য ও ধর্মাদর্শের দ্বন্দ্ব তাহার চরিত্রে; ধৃতরাষ্ট্রের মতোই সে পত্নীর আহ্বান উপেক্ষা করিয়া ধর্মবোধকে লঙ্ঘন করিয়া অসহায় সন্তানকে আশ্রয় করিয়াছে; ধৃতরাষ্ট্রের মতোই ট্র্যাজিক দ্বন্দ্বের তরঙ্গাভিঘাত তাহাকে সবলে ঠেলিয়া পাঠকের সমবেদনার সিক্তবেলাভূমিতে পৌছাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তবু কত প্রভেদ! ধৃতরাষ্ট্র যে ধর্মকে উপেক্ষা করিয়াছে তাহা নিত্যধর্ম, বিনায়কের ধর্মবোধ কেবল সামাজিক সংস্কার মাত্র; পূর্বোক্ত নাটকের ধর্মের উদ্ভব মানবহৃদয়ের অমর গ্রন্থে, পরবর্তী নাটকের ধর্মের আশ্রয় শাস্ত্রের খানকতক জীর্ণ পাতা মাত্র।

রমাবাই-চরিত্র গান্ধারী-চরিত্রের মতোই ক্লাসিকাল শিলাখণ্ড কুঁদিয়া কাটা; তাহার ধর্মাদর্শের সঙ্গে পাঠকের সহানুভূতি না থাকিতে পারে, কিন্তু দুর্নিবার ইচ্ছাশক্তির প্রভায় মহিমময়ী এই বীররমণী বিস্ময় উদ্রেক না করিয়া

ছাড়ে না ; ইহাকে দেখিয়া গ্রীক ট্র্যাজেডির মীডিয়া ও ক্লাইটেম্‌নেস্‌ট্রাকে মনে পড়িয়া যায়। এই নাটকে সত্যই যদি কেহ করুণার পাত্র থাকে তবে সে বিনায়ক বা অমাবাই নয় ; সে এই নিষ্করুণ জননী ; শাস্ত্রাচার কতখানি প্রবল হইয়া উঠিলে হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারে! কিংবা এই নিষ্ঠুরতা আদৌ ধর্মরক্ষার জন্য নয়!

কন্যার কুযশে
মাতার সতীত্বে যেন কলঙ্ক পরশে।
অনলে অঙ্গার সম সে কলঙ্ককালী
তুলিব উজ্জ্বল করি চিতানল জ্বালি।

কন্যার মৃত্যুর দ্বারা ইহা কি তবে আত্মসমর্থনেরই উপায় মাত্র! যে রকম অনায়াসে সে মরিতে পারিত—তাহাই যেন সে কন্যার উপরে আরোপ করিয়াছে, কারণ এখনো সে কন্যাকে ভালোবাসে—কন্যার ব্যক্তিত্বকে নিজেরই ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করে। বিনায়কের চেয়ে সন্তানস্নেহ তাহার অল্প নয় ; কিন্তু বিনায়ক এখন কন্যাকে আত্মনিরপেক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে দেখে ; তাহার হৃদয় যেন অপরের দুঃখে বিগলিত হইয়াছে ; রমাবাই কন্যাকে এখনো আত্মনিরপেক্ষ ভাবে দেখে না—নিজেরই অংশ বলিয়া দেখে ; প্রয়োজন হইলে মানুষ যেমন নিজের অঙ্গে অস্ত্রোপচারের কষ্ট সহ্য করে—তেমনি ভাবেই রমাবাই কন্যার মৃত্যু সহ্য করিতে প্রস্তুত।

ইহা তো গেল রমাবাই-এর মনোভাবের বিশ্লেষণ কিংবা পাঠকের উপরে তাঁহার চরিত্রের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু তাহার মনে কোনো দ্বন্দ্ব নাই ; সে জানে সে যাহা করিতেছে তাহাই একমাত্র পথ, দ্বিতীয় পথের দ্বিধা তাহার চরিত্রে নাই। কন্যাকে দগ্ধ করিয়া মারা—সে-তো কন্যারই মঙ্গলের জন্য, তাহাতে দ্বন্দ্ব কোথায়? নিজের অঙ্গে অস্ত্রোপচারের কষ্ট কি ট্র্যাজেডির কষ্ট? সে-তো নিরাময়ের পূর্বাভাস। ধর্মাদর্শের ভেদ ছাড়িয়া দিলে গান্ধারী ও রমাবাই-চরিত্রে মৌলিক ঐক্য আছে ; দ্বন্দ্বহীন, কৃতনিশ্চয়, স্থিরপন্থা, অনমনীয়, প্রবল ইচ্ছাশক্তিময়ী এই দুই রমণী। তবে ইচ্ছার প্রবলতা যেন রমাবাই-এর চরিত্রে কিছু বেশি, কিংবা ঘটনাস্রোত গান্ধারীর বেলায় প্রবলতর ; গান্ধারী যে ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে স্থাপিত তাহার প্রসার ভারতবর্ষব্যাপী রাজনীতির জটিলতায়, আর রমাবাই-এর ট্র্যাজেডির ক্ষেত্র সংকীর্ণ, ইহাকে স্থানিক মাত্র বলা যাইতে পারে। ইহারা উভয়েই পাঠকের বিস্ময় উদ্রেক করে, কিন্তু

সমবেদনা আকর্ষণ করে না, কারণ আদর্শ চরিত্র পাঠকনিরপেক্ষ, আর রমাবাই-চরিত্রকেও এক হিসাবে আদর্শ চরিত্র বলা যাইতে পারে—নিজের আদর্শের সঙ্গে, সে আদর্শ পাঠকের আদর্শ না হইতে পারে, লেখকের তো নিশ্চয়ই নয়, সে একাত্ম হইয়া গিয়াছে, কাজেই গান্ধারীর মতো সে-ও অন্যনিরপেক্ষ।

অমাবাই-চরিত্রেও দ্বন্দ্ব নাই। মৃত্যুর কষ্ট আছে, শিশু সন্তান ত্যাগের দুঃখ আছে, পরপুরুষের সঙ্গে সহমরণে মরিবার অপরিসীম লজ্জা আছে, মাতার বিবেকহীনতায় ধিক্কার আছে, কিন্তু বিভিন্ন আদর্শের ইশারায় উদ্‌ভ্রান্তি তাহার চিত্তে নাই। সে জানে, যাহা সে করিয়াছে তাহাতে লজ্জিত হইবার, গ্লানিবোধ করিবার কিছু নাই।

এক সময়ে তাহার চরিত্রে দ্বন্দ্ব ছিল, কিন্তু সে-কাল অনেকদিন অতিক্রান্ত। প্রেম ও সংস্কার, শাস্ত্রাচার ও চিত্তাচারের সংঘর্ষ তাহার জীবনে একসময়ে আসিয়াছিল, সে-দ্বন্দ্ব কাটাইয়া উঠিয়া এখন তাহার জীবনে পত্নীধর্ম ও সতীধর্ম এক হইয়া গিয়াছে; শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা নয়, প্রেমের অভিজ্ঞতার দ্বারা সে সমাজ-অতিক্রামী মানুষের সাক্ষাৎ পাইয়াছে; সে স্বজাতীয় বর পায় নাই, প্রেমবৃত প্রেমবৃত স্বামী পাইয়াছে। সেই সময় সত্যই তাহার দ্বন্দ্বের সময়—কিন্তু সে তো নাট্যঘটনার বাহিরে।

হৃদয় অর্পণ
করেছিনু বীরপদে। যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়।
অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে। মাঝে মাঝে তবু
সংস্কার উঠিত জাগ; কোনোদিন কভু
নিগূঢ় ঘৃণার বেগ শিরায় অধীর
হানিত বিদ্যুৎকম্প—অবাধ্য শরীর
সংকোচে কুঞ্চিত হ'ত; কিন্তু তারো পরে
সতীত্ব হয়েছে জয়ী। পূর্ণভক্তিভরে
করেছি পতির পূজা; হয়েছি যবনী
পবিত্র অন্তরে; নহি পতিতা রমণী,
পরিতাপে অপমানে অবনতশিরে

মোর পতিধর্ম হতে নাহি যাব ফিরে
ধর্মান্তরে অপরাধী সম।

জননীর ধিক্কারের প্রতিবাদে সে বলিতেছে—

উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি তবুও যবনে
ঘৃণা করি নাই আমি, কায়বাক্যেমনে
পূজিয়াছি পতি বলি; মোরে করে ঘৃণা
এমন কে সতী আছে? নহি আমি হীনা
জননী তোমার চেয়ে, হবে মোর গতি
সতীস্বর্গলোকে।

বিনায়ক-ও পত্নীর মতো শাস্ত্রাচার-মূঢ়; শাস্ত্রের চেয়ে মহত্তর কিছু আছে বলিয়া জানিত না; কিন্তু আজ রণক্ষেত্রে, শ্মশানক্ষেত্রে, কন্যার দুঃখের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আঘাতে তাহার দীর্ঘাচরিত সংস্কারের জীর্ণ খোলস ভেদ করিয়া নব আদর্শের গগনগামী অমৃতপ্রয়াসী বিষ্ণুবাহন বাহির হইয়া আসিল। অমাবাই যে-জ্ঞান দিনে দিনে ঠেকিয়া ঠেকিয়া লাভ করিয়াছে, রমাবাই যাহা কখনো লাভ করিতে পারিল না, বেদনার বজ্রাঘাতে সেই উৎস এক মুহূর্তে বিনায়কের চিত্ত হইতে বাহির হইয়া পড়িল। এখন পিতার অভিজ্ঞতা ও কন্যার অভিজ্ঞতা অভিন্ন। নিম্নোদ্ধৃত বাক্য অমাবাই-এর হইতে পারিত, তাহা বিনায়কের—

সমাজের চেয়ে
হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন।
পিতৃস্নেহ নির্বিচার বিকারবিহীন
দেবতার বৃষ্টি সম; আমার কন্যারে
সেই শুভ স্নেহ হতে কে বঞ্চিতে পারে—
কোন্ শাস্ত্র, কোন্ লোক, কোন্ সমাজের
মিথ্যা বিধি, তুচ্ছ ভয়।

কিন্তু বাস্তব নির্মম, রমাবাই নির্মমতর। চিতাশয্যায় শায়িত অসহায় অমাবাই ধর্মরাজকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—

জাগো জাগো জাগো ধর্মরাজ!
শ্মশানের অধীশ্বর, জাগো তুমি আজ।
হেরো তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত

ক্ষুদ্র শক্র—জাগো, তারে করো বজ্রাঘাত
দেবদেব! তব নিত্যধর্মে করো জয়ী
ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।

অমাবাই-এর মনে যে দ্বন্দ্ব নাই ধর্মরাজের প্রতি এই আবেদন হইতেই তাহা বোঝা যায়। নিজের মৃত্যুতে তাহার দুঃখ নয়, নিত্যধর্মের পরাজয়ে তাহার গ্লানি। অমাবাই-এর এই আর্ত-আবেদন ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে বিদীর্ণ করিয়া বিশ্ববেদনায় পরিণত হইয়াছে; জগতের ধর্মব্যবস্থায় আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া আজ সে পীড়িত; সে যেন এখন বিশ্ব-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত, নিজের ক্ষুদ্র সত্তা কোন্ পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

ধর্মরাজকে আহ্বানের পর সে রক্ষা পাইবার জন্য পিতাকে ডাকিয়াছে—

পিতা, পিতা, পিতা মোর!

বাহ্য দৃষ্টিতে ইহাকে Bathos বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহা একমাত্র অসাধারণ কবিশ্রেষ্ঠের পক্ষেই সম্ভব; এই আপাত Bathos-এর প্রকৃত ব্যবহার গ্রীক-ট্র্যাজেডি-লেখকরা জানিত, ফরাসী ক্ল্যাসিকাল রীতির শ্রেষ্ঠ নাট্যকার-দ্বয় জানিত,—মানবচরিত্রের অন্তর্দর্শন যাহাদের না ঘটিয়াছে তাহাদের পক্ষে ইহা জানা সম্ভব নয়।

এমন মর্মভেদী, মর্মান্তিক, অসহায় আর্তনাদ বাংলাসাহিত্যে আর নাই বলিলেই চলে। মনের গুহার ভিতরে এই ধ্বনি সহস্র প্রতিধ্বনি তুলিয়া দিয়া সুপ্ত করুণার স্রোতস্বিনীতে বন্যা জাগাইয়া দেয়! মাঝে মাঝে এইরকম দু'একটি ছত্র নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দেয় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অলৌকিক নাট্য-প্রতিভার অঙ্কুর ছিল, যাহাকে সফল করিয়া তুলিবার দিকে তাঁহার মনোযোগের কেন যেন একান্ত অভাব।

নরকবাস

বিদেহরাজ সোমক বহু আরাধনা ও যজ্ঞাদি করিয়া প্রাচীন বয়সে এক পুত্র লাভ করিয়াছিল। তাহারই স্নেহে মুগ্ধ হইয়া সে রাজকর্মে অবহেলা করিত। একদিন রাজা পুত্রের ক্রন্দন শুনিয়া অকালে রাজসভা ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া যায়। রাজা ফিরিয়া আসিলে রাজপুরোহিত তাহাকে ধিক্কার দিলে লজ্জিত রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করে। ঋত্বিক বলে যে, এই পুত্র-মোহ কাটাইবার

শাস্ত্রীয় উপায় আছে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত কঠিন; তাহা পালন করিলে মহিষীরা শতপুত্রবতী হইবেন। রাজা এই ব্রত পালন করিবার প্রতিজ্ঞা করিল। ঋত্বিক বলিল—হোমাগ্নিতে শিশুপুত্রকে আহুতি দিতে হইবে। রাজ্যের প্রজাগণ ইহাতে তীব্র আপত্তি জানাইল, কিন্তু রাজা প্রতিজ্ঞায় অটল রহিল। হোমাগ্নিতে রাজার শিশুপুত্র নিক্ষিপ্ত হইল।

তার পরে বহু কাল চলিয়া গিয়াছে। দেহান্তের পরে বিদেহরাজ দেবরথে চাপিয়া স্বর্গে চলিয়াছে। এমন সময়ে 'স্বর্গের পথের পার্শ্বে'র 'বিষাদলোক' নরক হইতে ঋত্বিক ও প্রেতগণ তাহাকে আহ্বান করিল।

এখানে প্রেতগণের অনুরোধে সোমক ও ঋত্বিক তাহাদের মর্ত্য জীবন বিবৃত করিল। এমন সময়ে স্বর্গ হইতে ধর্ম আসিয়া সোমককে ত্বরায় স্বর্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন—দেবতারা তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। ঋত্বিক রাজাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিল যেন সে তাহাকে ছাড়িয়া না যায়। সোমক ঋত্বিককে ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতে সম্মত হইল না এবং যতকাল তাহার নরকবাস লিখিত আছে ততকাল নরকে থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। ধর্ম তাহাকে নরকবাসের অনুমতি দিয়া ফিরিয়া গেলেন।

নরকবাসের মূল ভাব পূর্বোক্ত দুইখানি নাটকের অনুরূপ হইলেও একটু ভিন্ন। গান্ধারীর আবেদনে সন্তানকে রক্ষা করিয়া ধর্মত্যাগের কাহিনী; সতীতে পিতা-কর্তৃক সন্তানকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় ধর্মত্যাগ; এখানে ধর্ম-রক্ষার জন্যই পিতার সন্তানকে পরিত্যাগ, তাহাকে হোমানলে সমর্পণ।

এ কথা সত্য বটে যে, এই সব নাটকের বিভিন্ন পাত্রপাত্রী ধর্মকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সকলেই ধর্ম শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে, আর, যেমনি হোক ধর্মের একটা আদর্শ প্রত্যেকের মনে আছে।

সোমকের চরিত্র ধৃতরাষ্ট্র, বিনায়কের চরিত্রের মতোই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র, আবার সোমক-চরিত্র পূর্বোক্ত দুইটি চরিত্রের মতোই ট্রাজিক সৃষ্টি; তাহার হৃদয়ে বিভিন্ন ভাবের দ্বন্দ্বজাত সংঘর্ষ আছে। একদিকে রাজকর্তব্য ও ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞার অহংকার, অন্যদিকে অন্ধ পুত্রস্নেহ—দুইটিতে মিলিয়া সোমকের হৃদয়ে সমুদ্রমন্থনের আন্দোলন তুলিয়াছে; সমুদ্রের জল চঞ্চল, কিন্তু সীমা স্থির; সোমকের হৃদয়ে আন্দোলন আছে বটে, কিন্তু চরিত্র অটল। পুত্রস্নেহের উপরে রাজধর্ম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম জয়ী হইয়াছে।

তার পরে বহু কাল চলিয়া গিয়াছে। জীবলীলা অবসানে সোমক দেবরথে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘকালেও সেই দারুণ মুহূর্তের স্মৃতি সে ভুলিতে পারে নাই—তবে দুঃখের অভিজ্ঞতায় এইটুকু বুঝিয়াছে যাহাকে সে ধর্ম বলিয়া মনে করিয়াছিল তাহা ধর্ম নয়, তাহা ধর্মের ছদ্মবেশী আত্মাভিমান। সত্যই তাহা ধর্ম হইলে তাহার পালনে সোমকের দুঃখ হইতে পারিত, কিন্তু গ্লানি বোধ হইত না। সে পাপের ফলে ঋত্বিকের মতো তাহাকে নরকানল ভোগ করিতে হয় নাই বটে, কিন্তু দীর্ঘজীবন সে হৃদয়ানলে দগ্ধ হইয়াছে—এখনো তাহা নির্বাপিত হয় নাই। নরকানল হৃদয়ের মধ্যেই জ্বলে, তবে যে হতভাগ্যের সেখানে অগ্নি জ্বলে না, তাহার জন্যই নরকের বাহ্যরূপ কল্পনা করা হইয়াছে।

তব সাথে মোর গতি নরক-মাঝারে
হে ব্রাহ্মণ! মত্ত হয়ে ক্ষাত্র অহংকারে
নিজ কর্তব্যের ত্রুটি করিতে ক্ষালন
নিষ্পাপ শিশুরে মোর করেছি অর্পণ
হুতাশনে, পিতা হয়ে। বীর্য আপনার
নিন্দুক সমাজ-মাঝে করিতে প্রচার
নরধর্ম, রাজধর্ম, পিতৃধর্ম হায়
অনলে করেছি ভস্ম। সে পাপজ্বালায়
জ্বলিয়াছি আমরণ, এখনো সে তাপ
অন্তরে দিতেছে দাগি নিত্য অভিশাপ।
... ...
হে নরক, তোমার অনলে
হেন দাহ কোথা আছে যে জিনিতে পারে
এ অন্তরতাপ। আমি যাব স্বর্গদ্বারে!
দেবতা ভুলিতে পারে এ পাপ আমার,
আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার,
সে অন্তিম অভিমান?

স্বর্গ-গমনোদ্যত সোমক-চরিত্র শেষ মুহূর্তে তাহার নিদারুণ মর্ত্য মাহাত্ম্যকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ঋত্বিকের ধারণা, এক পাপে দুইজনেই সমপাপী; এতদিন পরে যখন মর্ত্য জীবনের কথা প্রায় সে

ভুলিয়াছে এমন সময়ে সোমক স্বর্গে চলিয়া যাইবে আর সে পড়িয়া থাকিবে নরকে! সে সোমককে বলিল—

যেয়ো না যেয়ো না তুমি চলে
মহারাজ! সর্পশীর্ষ তীব্র ঈর্ষানলে
আমারে ফেলিয়া রাখি যেয়ো না যেয়ো না
একাকী অমরলোকে। নূতন বেদনা
বাড়ায়ো না বেদনায় তীব্র দুর্বিষহ
সৃজিয়ো না দ্বিতীয় নরক।

সোমক পরমতম শত্রুর সঙ্গে অকারণে নরকবাস করিতে সম্মত হইল। 'দ্বিতীয় নরক' সোমকের পক্ষেই সত্য হইল, অন্তরের নরকাগ্নির সহিত বাহিরের নরকাগ্নি মিলিত হইল।

এই মহিমার উদারতা এমনই মর্মস্পর্শী যে, নরকের প্রেতগণ পর্যন্ত তাহাতে বিচলিত হইয়াছে।

জয় জয় মহারাজ, পুণ্যফলত্যাগী!
নিষ্পাপ নরকবাসী, হে মহা বৈরাগী,
পাপীর অন্তরে করো গৌরব সঞ্চার
তব সহবাসে। করো নরক উদ্ধার।

সোমক এক সময়ে পার্থিব সুখ ত্যাগ করিয়াছিল পুণ্যের আশায়, এবারে সেই পুণ্যফলকেও সে পরিত্যাগ করিল।

ঋত্বিক-চরিত্র রঘুপতির ছাঁচে ঢালা। ইহারা শাস্ত্রাভিমান ও আত্মাভিমানকেই ধর্ম বলিয়া জানে; দেবতার স্থানে ইহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ধর্মের নামে রঘুপতি শিশুহত্যা, রাজহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ধর্মের নামে ঋত্বিক শিশুহত্যা করিয়াছে। রঘুপতির চেয়েও তাহার দায়িত্ব বেশি, সে পিতাকে ইহার মধ্যে টানিয়া লইয়াছে। হত্যার আঘাত যে কত নিদারুণ জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতি তাহা বুঝিয়াছে, তাহার নরকভোগ পৃথিবীতেই ঘটিয়া গিয়াছে, সে অভিজ্ঞতা ঋত্বিকের জীবনে হয় নাই বলিয়াই মৃত্যুর পরে এখানে আসিতে সে বাধ্য হইয়াছে।

শাস্ত্রদম্ভ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অহঙ্কার মানুষকে যে কত নিষ্ঠুর, কত অন্ধ, কত অস্বাভাবিক করিয়া তুলিতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত ইহাদের মতো লোক। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ইহারা এই সব হত্যাকাণ্ডকে সত্য সত্যই ধর্ম

বলিয়া মনে করিয়াছে; কাজেই ব্যক্তিগত ভাবে ইহাদিগকে খুব বেশি দোষী করা যায় না। তাহারা এমন একটা আচারবিচার কর্মকাণ্ডের জগতে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, যেখানে ব্যক্তিগত বিচার ও রুচির স্থান নাই বলিলেই হয়। বাল্যকাল হইতে সেই আবহাওয়ায় মানুষ হওয়াতে ধর্মের আর কোনো রূপ যে থাকিতে পারে তাহা এই দুর্ভাগারা জানিতেও পারে নাই। ভুল করিয়া হোক, নির্ভুল করিয়া হোক, ধর্মপালন করিতেছে—এই বোধ তাহাদের চরিত্রে একপ্রকার প্রস্তরোপম অটলতা দিয়াছে—তাহারা আর যাহাই হোক দুর্বল জীব নয়।

এই নাটকে একদল ছায়াশরীরী প্রেত আছে। আজ সদ্য পৃথ্বীচ্যুত সোমককে তাহাদের মাঝে পাইয়া পুরাতন পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ হঠাৎ তাহাদের ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। স্বদেশের জন্য, স্বস্থানের জন্য, স্বজনের জন্য মানুষের মনে যে চিরন্তনী ব্যাকুলতা আছে, বিরহের নিত্য-হৃৎস্পন্দনের সেই নিগূঢ় বেদনা বড় সুন্দরভাবে বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছে।

ক্ষণকাল থামো
আমাদের মাঝখানে। ক্ষুদ্র এ প্রার্থনা
হতভাগ্যদের। পৃথিবীর অশ্রুকণা
এখনো জড়ায়ে আছে তোমার শরীর,
সদ্য ছিন্ন পুষ্পে যথা বনের শিশির।
মাটির, তৃণের গন্ধ, ফুলের, পাতার,
শিশুর, নারীর, হায়, বন্ধুর, ভ্রাতার,
বহিয়া এনেছ তুমি—ছয়টি ঋতুর
বহু দিন-রজনীর বিচিত্র মধুর
সুখের সৌরভরাশি।

এই নাটকে নরকের ধারণাটিতেও নূতনত্ব আছে। নরক আর কোথাও নয়—পৃথিবী ও স্বর্গের মাঝখানে, স্বর্গের পথের ঠিক পার্শ্বেই এই বিষাদপুরী।

স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদলোক,
এ নরকপুরী। নিত্য নন্দন-আলোক
দূর হতে দেখা যায়, স্বর্গযাত্রিগণে
অহোরাত্রি চলিয়াছে, রথচক্রস্বনে
নিদ্রা তন্দ্রা দূর করি ঈর্ষা-জর্জরিত

আমাদের নেত্র হতে। নিম্নে মর্মরিত
ধরণীর বনভূমি, সপ্তপারাবার
চিরদিন করে গান—কলধ্বনি তার
হেথা হতে শুনা যায়।

এখান হইতে কাম্যলোক স্বর্গ দেখা যায়, একদা প্রিয় পৃথিবীও অদৃশ্য নয় —কাম্য ও দুর্লভ, ভূত ও ভবিষ্যের মাঝখানে নরক।

নিখিলের অশ্রু যেন করেছে সৃজন
বাষ্প হ'য়ে এই মহা-অন্ধকারলোক—
সূর্যচন্দ্রতারাহীন ঘনীভূত শোক
নিঃশব্দে রয়েছে চাপি দুঃস্বপ্ন মতন
নভস্তল;

বিষাদ ও ঈর্ষার উপাদানে এই নরক গঠিত।

কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

অর্জুনের সঙ্গে কর্ণের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বদিন সন্ধ্যায় কুন্তী সন্ধ্যা-সবিতার বন্দনায় রত কর্ণকে পরিচয় দিয়া ফিরাইয়া লইবার জন্য আসিয়াছেন। প্রশ্নোত্তরের ভাঁজ খুলিয়া ধীরে ধীরে কুন্তী আপন পরিচয় দান করিলেন, কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন, কর্ণকে আপন ভ্রাতাদের সঙ্গে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মাতৃহীন কর্ণের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার ফিরিবার পথ বন্ধ; সে কুন্তীকে ফিরাইয়া দিয়া বিধি-নির্দিষ্ট নিয়তির পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া স্বনিকেতনে ফিরিয়া গেল। ইহাই কর্ণ-কুন্তী-সংবাদের সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

এখানেও দেখিতে পাই, পূর্বোক্ত নাটকগুলির মতো ধর্মরক্ষার ইচ্ছা হইতেই এই ট্র্যাজেডির উদ্ভব।

কুন্তী কানীন পুত্র শিশু কর্ণকে অসহায়ভাবে জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, ধর্মরক্ষাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আবার আজ কর্ণ যে আজন্ম স্বপ্নিত মাতা ও ভ্রাতাদের মধ্যে ফিরিতে পারিল না, তাহারও মূলে কর্ণের ধর্মরক্ষার ইচ্ছা। দুর্যোধনের কাছে সে বাক্যপণে আবদ্ধ, অর্জুনের সঙ্গে সে যুদ্ধ করিবে; ক্ষত্রিয় সমাজ বহুকাল হইতে এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, আজ

ঠিক তার পূর্বাহ্নে কি করিয়া সমস্ত অঙ্গীকার, কৃতজ্ঞতার ঋণ জলে ভাসাইয়া দিয়া আবাল্যের শত্রুদের সঙ্গে গিয়া সে মিত্রতা করিবে?

এই কর্তব্যনিষ্ঠ ধর্মবোধই কর্ণের চরিত্রের প্রকৃত ভিত্তি। এই দিক দিয়া কচের চরিত্রের সঙ্গে কর্ণ-চরিত্রের মিল আছে। দেবযানীর আকর্ষণে ধরা দিতে কচের পক্ষে বাহিরের কোনো বাধা নাই, বরঞ্চ তাহাই স্বাভাবিক; আবার কর্ণের পক্ষে মাতা ও ভ্রাতাদের পক্ষে যোগদান করাই স্বাভাবিক; কিন্তু গোড়ায় যে দুর্যোধনের কাছে সে অঙ্গীকার করিয়া বসিয়া আছে। কচ ও কর্ণ উভয়েই স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধে কর্তব্যের ব্রত মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। একজনের প্রেমের আকর্ষণ, আর একজনের স্নেহ ও সৌভ্রাত্রের আকর্ষণ! হৃদয়ধর্ম ও কর্তব্যের দড়ি টানাটানিতে তাহারা শেষেরটির দিকেই হেলিয়াছে।

কর্ণের মধ্যে ধর্মবোধ কত প্রবল তাহা দানশীল কর্ণের একটি উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

কুন্তী

পুত্র, ভিক্ষা আছে—
বিফল না ফিরি যেন।

কর্ণ

ভিক্ষা মোর কাছে!
আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া আর
যাহা আজ্ঞা করো দিব চরণে তোমার।

দেবযানীর অনুরোধে কচও ঠিক এই উত্তর দিতে পারিত।

কর্ণ-চরিত্রে দ্বন্দ্ব আছে বটে, কিন্তু সে দ্বন্দ্বে ট্র্যাজেডির দুঃখ নাই; ধর্মই একমাত্র রক্ষণীয়; সে সম্বন্ধে তর্কের কোনো অবকাশ কর্ণ-চরিত্রে নাই।

কর্ণ-চরিত্রের দ্বন্দ্বের চেয়ে তাহার জীবনের irony, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসটাই অধিকতর লক্ষণীয়। সে জানে না যে, শ্রেষ্ঠ রাজকুলে তাহার জন্ম, অর্জুন তাহার ভ্রাতা। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ তাহার জীবনের চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আজ বহু বৎসর অপেক্ষার পরে সেই সুযোগ প্রত্যাসন্ন; আগামী কল্যই তাহার কীর্তিসৌধের উপরে শেষ প্রস্তরখানা বসাইবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে নিদারুণ বিধি বলিয়া গেল—ভুল! ভুল! সমস্তই ভুল! কুন্তী তোমার মাতা, অর্জুন তোমার ভ্রাতা।

যে মুহূর্তে তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখনি তো কর্ণের জীবনের ট্র্যাজেডির উপরে যবনিকা পড়িয়া গেল! তারপরে সে মাতার সঙ্গে ফিরিল কি না, যুদ্ধ করিল কি না, সে যুদ্ধের কি ফলাফল হইল—তাহা একান্ত অবান্তর। যথাকালে যে পরিচয় তাহার সৌভাগ্যের চরম হইতে পারিত, কালাত্যয়ে সেই পরিচয় আসিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিল।

কুন্তী আত্মপরিচয় দানের মুখে,

কুন্তী

ধৈর্য ধর্‌,
ওরে বৎস, ক্ষণকাল। দেব দিবাকর
আগে যাক্‌ অস্তাচলে। সন্ধ্যার তিমির
আসুক নিবিড় হয়ে। কহি তোরে বীর,
কুন্তী আমি।

কর্ণ

তুমি কুন্তী! অর্জুন-জননী!

'তুমি কুন্তী! অর্জুন-জননী!' এই তিনটি শব্দের মধ্যে যে ভয়, বিস্ময়, কৌতূহল, রহস্যবোধ আছে তাহার তুলনা বঙ্গ-সাহিত্যে নাই; অন্ত সাহিত্যেও আমার চোখে পড়ে নাই। বজ্রের অকস্মাৎ অট্টকরতালি ও দিগ্‌বক্ষোবিদারী বিদ্যুতের অগ্ন্যুচ্ছ্বাস এই শব্দ তিনটিতে একত্র ধ্বনিত ও প্রতিফলিত; স্বয়ং Irony-র ইহা যেন নিদারুণ অট্টহাসি! ওই ছত্রটির নির্মেঘ, নির্মম, সংক্ষিপ্ত বজ্রাঘাতে কর্ণের সমাপ্ত-প্রায় কীর্তিসৌধ সশব্দে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ওই ছত্রটি যুগপৎ তাহার জীবনের ব্যর্থতার সূচনা ও পরিণাম বহন করিতেছে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই অত্যাশ্চর্য ছত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ সঞ্চয়িতার পরবর্তী এক সংস্করণে পরিবর্তিত করিয়া লিখিয়াছেন—

"তুমিই কি কুন্তী, তুমি অর্জুন-জননী।

দুটিমাত্র অক্ষর 'ই' ও 'কি' ছত্রটির সমস্ত মহিমা ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। 'তুমিই কি কুন্তী' ইহা চিন্তার ভাষা, যেন কর্ণ একেবারে এ বিষয়ে অচেতন ছিল না, এখন যেন ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিতেছে। আর 'তুমি কুন্তী!' বিস্ময়ের ভাষা। এখানে কর্ণের তো কিছু ভাবিয়া দেখিবার নাই,

চমকিয়া উঠিবার কথা। 'তুমিই কি কুন্তী'তে নাটকীয় সেই চমক নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা ভাবিবার মতো। এই ছত্রটিকে কবি যখন পরিবর্তন করিলেন, তখন বুঝিতে হইবে ইহার নাটকীয় চমৎকার সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না। সচেতন নাট্যপ্রতিভা তাঁহার বিশেষ শক্তি নহে বলিয়াই তাঁহার পক্ষে ইহা যেমন অনায়াসে বদলানো সম্ভব, তেমনি অলৌকিক কবিপ্রতিভা ও মানবহৃদয়ঙ্গমতা আছে বলিয়াই অবচেতনভাবে এমন একটা শেক্সপীয়র-সুলভ ছত্র তাঁহার পক্ষে লেখা অসম্ভব নয়।

কুন্তী কর্ণকে ফিরাইয়া লইবার জন্য একে একে ধীরে ধীরে মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ, এবং সিংহাসনের কথা তুলিয়াছেন। যতক্ষণ মাতৃস্নেহ ও ভ্রাতৃস্নেহের কথা চলিতেছিল, কর্ণ একটা মোহ, একটা nostalgia অনুভব করিতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল—

তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে ; নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরী, জয়শঙ্খ, মিথ্যা মনে হয়
রণহিংসা, বীরখ্যাতি, জয় পরাজয়।

কিন্তু সিংহাসনের কথা উঠিতেই এই স্নেহ বিরহের মোহ ভাঙিয়া গেল।

সিংহাসন! যে ফিরালো মাতৃস্নেহপাশ
তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস!

কুন্তীর খেদোক্তিতে কর্ণ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছে—

মাতঃ, করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।…
যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে।
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন গৃহহীন—আজিও তেমনি
আমারে নির্মম চিত্তে তেয়াগো জননী,
দীপ্তিহীন, কীর্তিহীন পরাভব 'পরে।

শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে—
জয়লোভে, যশোলোভে, রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

কর্ণ আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছে বটে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে এমন মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে, কুন্তীর চেয়ে এত বড় হইয়া উঠিয়াছে যে, প্রকারান্তরে কুন্তীকেই সে যেন বরদান করিয়াছে। ওই শেষ ছত্র কয়টিতে সে নিজের প্রাণ দান করিয়াছে, পাণ্ডবদের রাজ্য দান করিয়াছে, কুন্তীকে পুত্রের জীবন দান করিয়াছে—নিজের জন্য কেবল সে রাখিয়াছে 'বীরের সদ্‌গতি', 'আপন পৌরুষ ও ধর্ম'; বাস্তবিকপক্ষে ইহা ছাড়া আর সমস্তই কুন্তীর চরণে জীবনের প্রথম ও চরম মাতৃ-প্রণামীরূপে সে দান করিয়াছে।

এই কাব্যে কুন্তীই সত্যিকার ট্র্যাজিক চরিত্র, এবং তাহার জীবনের irony-টাও বড় কম নয়। কন্যাবয়স হইতে তাহার সমস্যা—ধর্ম রাখিবে, না পুত্র রাখিবে? ধর্মরক্ষার জন্য কানীন পুত্রকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম রক্ষা করিয়াও তো মনে কখনো শান্তি পায় নাই। তবে কি যাহাকে সে ধর্ম বলিয়া রক্ষা করিয়াছিল আদৌ তাহা ধর্ম নয়? আবার জীবনের শেষে কন্যাবয়সের সেই সমস্যা ফিরিয়া আসিল। ধর্ম রাখিবে না পুত্র রাখিবে? তখন পুত্রকে ত্যাগ করিয়া তবেই ধর্মরক্ষা চলিত, এখন পুত্রকে আহ্বান করিয়া তবেই ধর্ম রক্ষা করা চলে। যে লজ্জা সে বিশ্বের কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিয়াছে, নিয়তির পরিহাসে, ঘটনাচক্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষে আজ তাহা নিজ মুখে তাহারই কাছে প্রকাশ করিতে হইল, বোধ করি যাহার কাছে প্রকাশ করা সবচেয়ে লজ্জাজনক।

কিন্তু ধর্মের গতি সূক্ষ্ম এবং অভাবিত। আজ কুন্তী পুত্রকে ফিরাইতে আসিয়াছে, কিন্তু পুত্রের যে ফিরিবার পথ রুদ্ধ! মাতার ধর্মে এবং পুত্রের ধর্মে যে বহুকাল হইতে বিরোধ বাধিয়া বসিয়া আছে।

Irony-র লঘু অঙ্গুলি জীবনে কি সূক্ষ্ম ও নিষ্করুণ জালই না বুনিতে পারে! কুন্তীর কানীন পুত্র ও বিবাহজ পুত্র আজ ভ্রাতৃঘাতী রণে উদ্যত। পরিত্যক্ত পুত্র কোন্ গুপ্ত পথের সূত্র ধরিয়া কেমন করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধর্মলঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত বোধ করি এমনি করিয়াই হয়, লঙ্ঘনকারীকে মারিয়া ফেলে না, বাঁচাইয়া রাখিয়া দণ্ড দেয়—তাহার সম্মুখে প্রিয়জনেরা

হানাহানি করিয়া মরে। ধর্ম এইভাবেই ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তীকে দণ্ডিত করিয়াছে। কুন্তীও ধর্মের দণ্ড সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত সচেতন।

বীর তুমি, পুত্র মোর,
ধন্য তুমি! হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর
দণ্ড তব। সেই দিন কে জানিত হায়,
ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়,
সে কখন্ বল বীর্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে,
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে।
এ কী অভিশাপ!

এই ক্ষুদ্র কাব্যের বিস্তৃত আলোচনার কারণ, রবীন্দ্রনাথের যে কয়টি রচনা জন্মমুহূর্তেই অমরতার টিকা লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, ইহা তাহাদের অন্যতম। এই নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে যে ইহা শ্রেষ্ঠ শুধু তাহা নয়, রবীন্দ্রকাব্যেও এমন 'কালের কপোলতলে শুভ্রসমুজ্জ্বল' সৃষ্টি অল্পই আছে, বাংলা সাহিত্যে নাই, পৃথিবীর সাহিত্যেও অল্প থাকিবার কথা।

সাধারণ লক্ষণ

এই কাব্যগুলিতে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে।

ধর্মাদর্শের আলোচনা এই কাব্যগুলির প্রধান সাধারণ লক্ষণ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিশ্বাসমতো ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ করিয়াছে। কিন্তু একের আদর্শের সঙ্গে অপরের আদর্শে ভেদ থাকায় বিরোধ বাধিয়া নাটক চলমান হইয়া উঠিয়াছে।

কচ প্রতিশ্রুতি-পাশে আবদ্ধ। এই কর্তব্যই তাহার কাছে ধর্ম।

দেব-সন্নিধানে, শুভে, করেছিনু পণ—
মহা-সঞ্জীবনীবিদ্যা করি উপার্জন
দেবলোকে ফিরে যাব; এসেছিনু তাই,
সেই পণ মনে মোর জেগেছে সদাই,
পূর্ণ সেই প্রতিজ্ঞা আমার, চরিতার্থ

এতকাল পরে এ জীবন ; কোনো স্বার্থ
করি না কামনা আজি।

দেবযানীর কোনো ধর্মাদর্শ নাই ; কিংবা কচের জীবনে প্রতিজ্ঞাপালনের আকাঙ্ক্ষা যে দৃঢ়তা দিয়াছে, দেবযানীর মনে ভালোবাসার সর্বগ্রাসী আকর্ষণের সেই স্থান।

পাপিষ্ঠ দুর্যোধন অমিতসাম্রাজ্যলিপ্সাকে একটা ধর্মের pattern-ভুক্ত করিয়াই প্রকাশ করিয়াছে। তাহার মতে রাজার পক্ষে রাজধর্মই একমাত্র ধর্ম এবং এই

রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই,
শুধু জয়ধর্ম আছে, মহারাজ, তাই
আজি আমি চরিতার্থ, আজি জয়ী আমি।

গান্ধারী ধর্মের জন্যই দুর্যোধনকে ত্যাগ করিতে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আবেদন করিয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র
কী রাখিব তারে ত্যাগ করি ?
গান্ধারী
ধর্ম তব
ধৃতরাষ্ট্র
কী দিবে তোমারে ধর্ম ?
গান্ধারী
দুঃখ নব নব।
গান্ধারী
ধর্ম নহে সম্পদের হেতু,
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু,
ধর্মেই ধর্মের শেষ।

বিনায়কের ধর্মের ধারণায় ক্রমবিকাশ আছে। প্রথমে যাহাকে সে ধর্ম বলিয়াছে তাহা সামাজিক আচার মাত্র। সে কন্যাকে বলিতেছে—

ওরে দুর্ভাগিনী নারী,
যে বৃক্ষে বাঁধিলি নীড় ধর্ম না বিচারি
সে তো বজ্রাহত, দগ্ধ, যাবি কার কাছে
ইহকাল-পরকাল-হারা।

কিন্তু শেষদিকে কন্যার আর্তি দেখিয়া তাহার চৈতন্য হইয়াছে। সে বলিতেছে—

সমাজের চেয়ে
হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন।
পিতৃস্নেহ নির্বিচার বিকারবিহীন
দেবতার বৃষ্টি সম।

এখানে নিত্যধর্ম ও পিতৃধর্ম এক হইয়া গিয়াছে।

রমাবাই যাহাকে ধর্ম বলিতেছে তাহাও সামাজিক আচার মাত্র—

যবনের গেহে
কার কাছে সমর্পিলি ধর্ম আপনার?

এই ধর্ম তাহার কাছে এত সত্য যে, তাহা রক্ষা করিবার জন্য কন্যাকে অসঙ্কোচে চিতায় তুলিয়া দিতে তাহার বাধে নাই।

অমাবাই চিতায় উঠিয়া আহ্বান করিয়াছে—

জাগো জাগো জাগো ধর্মরাজ!
শ্মশানের অধীশ্বর, জাগো তুমি আজ।
হেরো তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত
ক্ষুদ্র শত্রু—জাগো, তারে করো বজ্রাঘাত
দেবদেব। তব নিত্যধর্মে করো জয়ী
ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।

যবন-গৃহিণী অমাবাই যে ধর্মরাজকে আহ্বান করিয়াছে তিনি কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের নহেন, তিনি মানুষের দেবতা; যে ধর্মকে সে শ্রেয় মনে করে তাহা কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম নহে, তাহা নিত্যধর্ম, তাহা মানুষের ধর্ম; অমাবাই-এর জীবনে পতিধর্ম, সতীধর্ম ও নিত্যধর্ম এক হইয়া উঠিয়াছে।

নরকবাস কাব্যে সোমকের ধর্মধারণাতেও কিছু বিবর্তন আছে। একদা সে শিশুপুত্রকে ধর্মরক্ষার ছলে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

বীর্য আপনার
নিন্দুকসমাজ-মাঝে করিতে প্রচার
নরধর্ম রাজধর্ম পিতৃধর্ম হায়
অনলে করেছি ভস্ম।

এ কথা তখন সে বুঝিতে পারে নাই—দুঃখের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরে এখন বুঝিতে পারিয়াছে। এখন সে ভাবিতেছে জীবনে এমন কি সুকৃতি করিয়াছে যাহার ফলে স্বর্গে যাওয়া তাহার সম্ভব ?

আমি যাব স্বর্গদ্বারে !
দেবতা ভুলিতে পারে এ পাপ আমার,
আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার,
সে অন্তিম-অভিমান ?

সোমক প্রথমে ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞাপালনকেই ধর্ম মনে করিয়াছিল, সে ধর্ম যতই হৃদ্‌ধর্ম-বিরোধী হোক না কেন ; এখন সে নিত্যধর্মের দ্বারে উপনীত।

কর্ণের কাছে পৌরুষ ও অঙ্গীকার-ই ধর্ম।

কুরুপতি-কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন ক'রে ধাই যদি রাজসিংহাসনে
তবে ধিক্ মোরে।

আগেই সে কুন্তীকে বলিয়াছে—

আপন পৌরুষ ছাড়া ধর্ম ছাড়া আর
যাহা আজ্ঞা কর দিব চরণে তোমার।

আর কুন্তীর ধর্ম কি ? একদা সামাজিক সম্মানকেই সে ধর্ম মনে করিয়াছিল, তাই কানীন পুত্রকে জলে ভাসাইয়া দিয়া সেই ধর্ম সে রক্ষা করিয়াছিল। আর আজ যখন সেই পুত্র তাহার আর এক পুত্রকে হত্যা করিতে উদ্যত, যখন রাজ্যলোভেও মাতৃক্রোড়ে ফিরিল না, তখন ধর্মের স্বরূপ, ধর্মের বিচার, ধর্মের রহস্যের নিষ্ঠুরতা খানিকটা সে যেন বুঝিতে পারিল !

হায়, ধর্ম, একি সুকঠোর
দণ্ড তব !

এই তো নানাজনের নানারকম ধর্মের আদর্শ গেল। এখন, কবি নিজে কোন্ ধর্মকে আদর্শ মনে করেন ? অবশ্য, নিত্যধর্মই তাঁহার আদর্শ। কিন্তু তাহা হইলে কি সমাজে রাজধর্ম, পিতৃধর্ম, ভ্রাতৃধর্ম, ক্ষত্রিয়ধর্ম, সমাজধর্মের স্থান নাই ? কবি বলিবেন, সমাজে রাজধর্ম, ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রভৃতির শুধু যে স্থান আছে তাহা নয়, আবশ্যক আছে ; কিন্তু কেবলমাত্র ততক্ষণই যতক্ষণ তাহা নিত্যধর্মের প্রতিকূল না হইয়া উঠিতেছে ; নিত্যধর্মের সঙ্গে বিরোধ বাধিলে বুঝিতে হইবে রাজধর্ম, পিতৃধর্ম প্রভৃতি খণ্ডধর্ম ভ্রান্ত ; তাহাতে পরিবর্তনের

প্রয়োজন হইয়াছে। বস্তুত নিত্যধর্মের সঙ্গে খণ্ডধর্মের বিরোধ নাই ; খণ্ডধর্ম স্বতন্ত্র নয়, তাহা অখণ্ড নিত্যধর্মেরই অংশ মাত্র।

ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধনকে রক্ষা করা যেমন অন্যায়, সোমকের পুত্রকে ত্যাগ করাও তেমনি অন্যায়, কারণ দুটাই নিত্যধর্মের বিরোধী। ঋত্বিকের শাস্ত্রীয় নিষ্ঠুরতা ও রমাবাইয়ের অপঠিত আচারগত নৃশংসতা—দুই-ই অন্যায়ের সমশ্রেণীভুক্ত। কুন্তীর কানীন পুত্রকে ভাসাইয়া দেওয়া যেমন অন্যায়, আজ সেই কুলে ফিরিয়া গেলে কর্ণের পক্ষেও ঠিক তেমনি অন্যায় হইত।

ধর্মের ফল হইতে মানুষকে পথভ্রান্ত করিতে কে না পারে? স্নেহ পারে—যেমন ধৃতরাষ্ট্রকে করিয়াছে; আচার পারে—যেমন রমাবাইকে করিয়াছে; শাস্ত্র পারে—যেমন ঋত্বিককে করিয়াছে; অহঙ্কার পারে—যেমন সোমককে করিয়াছে; আবার কুলমার্যাদা পারে—যেমন কুন্তীকে করিয়াছে!

এখন, নিত্যধর্ম ও মানুষের ধর্ম কথাগুলি খুব প্রাঞ্জল নয়। নিত্যধর্ম বা মানুষের ধর্ম খণ্ড খণ্ড ধর্মের মহত্তম মূর্তি; ইহা ধর্মের সমগ্রতা, বা সংক্ষেপে ইহাকে ধর্ম বলা যাইতে পারে।

এই ধর্ম বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি বোঝেন?

"সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভুক্ত, তাহাই মনুষ্যত্বের ছোট বড় অন্তর বাহির সর্বাংশে পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।"[১]

আবার?

"প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র, তাহার মধ্যে যথাযোগ্য ভাবে 'রিলিজন', 'পলিটিক্স' সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে, কারণ সমাজেই তাহার মর্মস্থান, তাহার জীবনীশক্তির অন্য কোনো আশ্রয় নাই।"[২]

১ ধর্মপ্রচার, ধর্ম, পৃ ৬৫।

২ সমাজভেদ, স্বদেশ, পৃ ১০৩।

এখানে কবি যাহাকে ধর্ম বলিয়াছেন তাহা গান্ধারীর অমাবাই-এর নিত্যধর্ম, তাহা কুন্তীর ধর্ম। কবির মতে আমাদের দেশে ধর্ম ও সমাজ একার্থক, কাজেই ধর্মে আঘাত পড়িলে সমাজ কাতর হইয়া ওঠে। আর ইহা সামাজিক দুর্যোগ বলিয়াই গান্ধারী পাপী দুর্যোধনকে ত্যাগ করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছে। গান্ধারী ব্যক্তিগতভাবে স্বামিপদতলে আসে নাই, 'সমস্ত নারীর হ'য়ে নয়নের জলে' সে রাজপদতলে প্রার্থনায় আসিয়াছে, কারণ ধর্মহানি আমাদের দেশে ব্যক্তিগত বিপদ নয়, সামাজিক বিপদ, আর রাজা তো সমাজ ও ধর্মকে রক্ষার কর্তা।

কবি উপরি-উক্ত অংশে যাহাকে 'রিলিজন' বলিয়াছেন তাহা রমাবাই-এর আচার, ঋত্বিকের শাস্ত্রানুশাসন; যাহাকে 'পলিটিক্স' বলিয়াছেন তাহা দুর্যোধনের রাজধর্ম। কারণ, প্রাচ্য সভ্যতায় ধর্ম এ সমস্তকেই অঙ্গীভূত করিয়া বিরাজ করে, তাহা 'অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না।'

এখানে আর একটি সাধারণ লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যগুলিতে ন্যায়-ধর্মের উপরে খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। সামাজিক সর্বগুণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ন্যায়ধর্মকে, justice-কে প্রধান মনে করেন। ন্যায়ধর্ম কেবল রাজনীতির ব্যাপার নয়, ইহা ধর্মনীতির অঙ্গ। আর সমাজ ও ধর্ম এ দেশে একার্থক হওয়াতে ন্যায়বিচারে যে কেবল সমাজরক্ষা হয় এমন নহে, প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-রক্ষাই হয়। সেইজন্য এ দেশে ন্যায়ধর্মের গুরুত্ব অন্যদেশের চেয়ে অনেক বেশি। রাজার উপরে একাধারে সমাজ ও ধর্মের ভার থাকাতে ন্যায়ধর্ম-রক্ষার জন্য তাঁহার দ্বিগুণ সজাগ থাকা উচিত। ন্যায়বিচার উপেক্ষা করিবার দৃষ্টান্ত যেমন ধৃতরাষ্ট্র, তেমনি আবার ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া ভুল করিবার দৃষ্টান্ত সোমক। সোমকের বিচারে ভুল হইতে পারে, কিন্তু বিচারের সঙ্কল্পে যে তিনি আদর্শ তাহাতে তো ভুল নাই।

কেবল এই সব নাটকে নয়, বহুত্র এই ভাবটি আছে।

বিসর্জন নাটকের ট্র্যাজেডির উৎস গোবিন্দমাণিক্যের ন্যায়ধর্মের রক্ষায় অটল সঙ্কল্প।

আবার, রাজা ও রাণীতে ঠিক তাহার বিপরীত। বিক্রমের ন্যায়ধর্মের প্রতি অবহেলা হইতেই নাটকীয় ঘটনাচক্রের আবর্তন সুরু হইয়াছে।

এসব ক্ষেত্রে ন্যায়ধর্মের রক্ষক যেমন রাজা, তেমনি অন্যত্র দেখি যিনি

রাজার রাজা, ঈশ্বর, সেই ভগবানের ঐশ্বর্যের দিকটাই রবীন্দ্রনাথকে যেন বেশি আকর্ষণ করিয়াছে, তিনিও জগতের শ্রেষ্ঠ বিচারক, ন্যায়ধর্মের চরম রক্ষক।[১]

আর একটি সাধারণ লক্ষণেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস এবং কর্ণ-কুন্তী-সংবাদে প্রধান পাত্র-পাত্রী পিতা, মাতা এবং পুত্রকন্যা। ইহাতে কোনো গভীরার্থ আছে কি না? আগেই বলিয়াছি ধর্মাদর্শের পরীক্ষা এই সব কাব্যে চলিয়াছে। ধর্মের জন্য মানুষ কতখানি ত্যাগ করিতে পারে, কতটা সহ্য করিতে পারে—তাহারই যেন ইহা বীক্ষণাগার। ধর্মের জন্য মানুষ ছোটখাট ত্যাগস্বীকার করিতে পারে, কিন্তু চরম পরীক্ষা যখন আসে মর্মস্থানে আঘাত পড়ে। পুত্র, কন্যা মানুষের মর্মতম স্থান। একেবারে সেই কোমলতম মর্মে আঘাত করিয়া ধর্মের সোনা যাচাই করিতে ইচ্ছা কবি যেন করিয়াছেন; কাজেই এইজাতীয় নাটকে মানুষের কামনার উপরিতলের বস্তুগুলিকে বাদ দিয়া কবি একেবারে অস্তিত্বের তলদেশে গিয়া আঘাত হানিয়াছেন; তাহাতে কতক কৃত্রিম বলিয়া ধরা পড়িয়াছে, আবার অকৃত্রিম রত্নও উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে।

লক্ষ্মীর পরীক্ষা

ইহাতে ছন্দকে নূতন একটি কাজে কবি ব্যবহার করিয়াছেন। মুখের কথার ছন্দকে স্পন্দকে ইহাতে সংলাপের ছন্দে ধরিবার চেষ্টা। এই নাটকের আবহাওয়া ঘরোয়া, ইহার বিষয়বস্তুর সীমানা অন্তঃপুরের বহির্ভূত নয়, চরিত্রগুলি সমস্তই নারীর, এ রকম ক্ষেত্রে ঘরোয়া ছন্দটিকে পরীক্ষার একটা অপূর্ব সুযোগ কবি পাইয়াছেন।

এই পরীক্ষার ক্ষেত্র ও সুযোগ বাংলা কাব্যে এখনো যথেষ্ট রহিয়াছে।

অত্যন্ত সহজ, সরল ও সরসভাবে বহু উচ্চাঙ্গের ভাব ইহাতে কথিত হইয়াছে। 'কণিকা'তে যে কাজ কবির করিবার চেষ্টা, সেই কাজ অধিকতর কৌশলে ও আয়াসহীনতায় এখানে সম্পন্ন হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই লঘু সরস নাট্যখানি হইতেই কবির সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃতি প্রবাদ ও বাক্যাংশ-রূপে বাংলা ভাষায় চালু হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

১ দ্রষ্টব্য নৈবেদ্য ৭০, বলাকা ১১, ৩৭।

চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা ও লামিয়া, দুইজন কবির তরুণ বয়সের রচিত কাব্য; ইহাদের মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায়, তাহা কেবল ঘটনার নহে, ভাবনারও বটে, দুইজন তরুণ কবির জীবনদর্শনের চিহ্ন ইহাতে আছে, আর আসল ঐক্য সেই জীবনদর্শনের ভঙ্গীতে। অন্তরের কল্পলোক হইতে বাস্তবের বহির্জগতে বাহির হইয়া পড়িবার প্রয়াস এই দুইখানি কাব্যে আছে; এই অন্তর্লোক রবীন্দ্রনাথের ভাষায় হৃদয়-অরণ্য, কীট্‌সের ভাষায় রোমান্স।

স্বল্পস্থায়ী কবি-জীবনে কীট্‌স্ দ্রুতপদে নিশ্চিত সন্ধানে এই অন্তর্জগৎ হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন—প্রত্যেকটি কাব্য তাঁহার বহির্মুখী পদচিহ্ন বহন করিয়া সাক্ষ্য দিতেছে। কীট্‌সের কাব্য আছে, আবার তাঁহার চিঠি-পত্র ও বন্ধুবান্ধবদের স্মারক আছে, এখন এই দুইয়ে মিলাইয়া একটিকে অপরটির প্রতিপূরক ভাবে ব্যবহার করিয়া আমরা জানি যে, কীট্‌সের জীবনে রোমান্সের মোহভঙ্গের একটা পালা চলিতেছিল; যে মোহভঙ্গে ভগ্নহৃদয় হইয়া লামিয়া কাব্যের নায়ক Lycius প্রাণত্যাগ করিয়াছিল তদনুরূপ একটি অভিজ্ঞতা কবির জীবনেও ঘটিতেছিল; Lycius প্রাণত্যাগ করিয়াছিল—রোমান্স-বিজয়ী কবিচিত্ত তাহাতে মরে নাই, বাস্তবের সত্যতর জগতে নূতনতর জন্ম লাভ করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের বেলাতে আমরা কেবল অর্ধেক জানি; কাব্যকে জানি, অন্তর্জীবনের কোনো ইতিহাস এ পর্যন্ত জানিতে পারি নাই, কিন্তু অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, অনুরূপ একটা অভিজ্ঞতা তাঁহার জীবনেও চলিতেছিল, আর কেবল চিত্রাঙ্গদা কাব্যে নয়—পরবর্তী বহু গ্রন্থে অভিজ্ঞতার একই ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাই মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, অভিজ্ঞতার এই চংক্রমণ শেষ পর্যন্ত তাঁহার জীবনে চলিতেছে।

২

কাব্যের প্রথমেই দেখি চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুন দুইজন দুই ধরনের অবাস্তবতার কল্পলোকে বাস করিতেছে, এই কল্পলোক উভয়েরই স্বেচ্ছাসৃষ্টি—এবং দুইজনেই ইহাকে মানবস্বভাবের উপরে ব্যক্তিগত অভিরুচির বিজয় মনে করিয়া গৌরব বোধ করিতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু ঘটনাস্রোতে দুইজনে মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইতেই ইহার অবাস্তবতা ধরা পড়িয়া গেল—আর শুধু তাই নয়—তখন এই গৌরবের চিহ্নকে ধূলায় লুটাইয়া দিতে দুইজনের কত প্রয়াস!

চিত্রাঙ্গদার অবাস্তবতা তাহার নারীস্বভাব-লোপকারী পুরুষের পরিচ্ছদ ও পুরুষের বীর্য ; ইহাতে সে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত।

মোর পিতৃবংশে কভু পুত্রী জন্মিবে না—
দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি
তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতাবাক্য
মাতৃগর্ভে পশি, দুর্বল আরম্ভ মোর
পারিল না পুরুষ করিতে শৈবতেজে,
এমনি কঠিন নারী আমি।

কিন্তু যেদিন তাহার পরুষ নারীত্ব অর্জুনের মনোহরণ করিতে অসমর্থ হইল সেদিন বুঝিতে পারিল, যাহাতে গর্ব তাহাতে তৃপ্তি নাই, বুঝিতে পারিল ব্যক্তিগত অভিরুচির দ্বারা মানবস্বভাবকে জবরদস্তি করিয়া চাপিয়া ধরিলে তাহাতে নিজেরই শ্বাসরোধ হইয়া আসে। এতদিন যাহাকে অটল দুর্গ বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহার দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য সে বসন্ত ও মদনের সাহায্য লইতে বাধ্য হইল। বাস্তবের ধাতুকলসের আঘাতে রোমান্সের মৃৎকলসে প্রথম বারের জন্য টোল্ পড়িল ; প্রথমবার এই জন্য যে, এখনো শেষ হয় নাই, মৃৎকলসটা শতখণ্ড হইয়া অতলে তলাইয়া যাওয়া দরকার।

অর্জুনের অবাস্তবতা আবার আর এক রকমের। সে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আর একটা বড় রকমের অপরাধ করিতেছিল—সেটারও তো প্রায়শ্চিত্ত হওয়া দরকার। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া সে ব্রহ্মচারী সাজিয়াছিল—অর্থাৎ মানবপ্রকৃতিকে অস্বীকার করিতে বসিয়াছিল ; মানবপ্রকৃতি ছাড়িবে কেন—ঘটনার আবর্ত তাহাকে সেই ঘাটে আনিয়া ফেলিল, যে ঘাটের সে ভয় করিতেছিল ; ব্রহ্মচারীর গৌরবকে ঘটনাস্রোত নারীর পদপ্রান্তে আছাড় মারিয়া চুরমার করিয়া ফেলিল।

যে অর্জুন একদা দেবতার বরলাভের আগের চিত্রাঙ্গদার বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া বলিয়াছিল—

ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।—

সেই অর্জুনের রূপময়ী চিত্রাঙ্গদার কাছে নিজের একদা অহঙ্কৃত ব্রহ্মচর্য ভাঙিবার সে কি প্রয়াস!

চিত্রাঙ্গদা

শুনেছিনু, ব্রহ্মচর্য
পালিছে অর্জুন দ্বাদশবরষব্যাপী।
সেই বীর কামিনীরে করিছে কামনা
ব্রত ভঙ্গ করি'! হে সন্ন্যাসী, তুমি পার্থ?

অর্জুন

তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার।

এইরূপে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের স্বেচ্ছারচিত মোহদুর্গের প্রথম প্রাকার ভাঙিয়া পড়িল—কিন্তু এই অলঙ্ঘ্য দুর্গের প্রাকার তো আর একটা নয়, একটার পরে আর একটা; কাব্যের পরবর্তী অংশ এই প্রাকারভঙ্গের ইতিহাস।

৩

এবারে চিত্রাঙ্গদা দেখিল যে, সে এক মোহ ভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে আর এক গভীরতর মোহের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে, আর এ মোহ তাহার স্বয়ংবৃত, এ মোহের দ্বন্দ্ব মায়াতে মানবে, দেহে মনে, রূপে অরূপে। অর্জুনের চোখ ভুলাইবার জন্য সে বসন্ত মদনের নিকট হইতে বর্ষভোগ্য মোহিনীকান্তি ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিল, এই ভিক্ষালব্ধ সৌন্দর্যই শেষে তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

চিত্রাঙ্গদা নিজের বাস্তব কুরূপকে ঢাকিবার জন্য যে রোমান্টিক মায়ার সাহায্য লইয়াছিল অবশেষে তাহাকে সেই রোমান্টিক ছলনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইল—ইহা বাস্তবতার প্রতিশোধ।

দেবতার বরে রূপময়ী চিত্রাঙ্গদার কাছে অর্জুন ধরা দিতে আসিলে সে সুখী না হইয়া অননুভূতপূর্ব একপ্রকার ঈর্ষা বোধ করিল।

মুহূর্তেকে সত্য ভঙ্গ
করি, অর্জুনেরে করিতেছ অনর্জুন
কার তরে? মোর তরে নহে। এই দুটি
নীলোৎপল নয়নের তরে; এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী

অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করি সত্যের বন্ধন।
… … …
হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা—
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী।

আবার—

আমি নহি, আমি নহি, হায় পার্থ, হায়,
কোন্ দেবের ছলনা।
… … মিথ্যারে কোরো না
উপাসনা। শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পদে।

এখানে মিথ্যা বলিতে চিত্রাঙ্গদা যাহা বুঝিতেছে তাহা নিজের দেবদত্ত রূপ ; পার্থ এই দেবদত্ত রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছে, অন্তরের আসল ব্যক্তিটিকে সে দেখিতে পায় নাই ; কিংবা আসল ব্যক্তিটিকে অর্জুন দেখিয়াছিল, চিত্রাঙ্গদার সেই রূপহীন রূপ তাহাকে মুগ্ধ করে নাই। তখন সৌন্দর্যহীন সত্যকে মিথ্যা সৌন্দর্যের দ্বারা কোনোমতে ঢাকিয়া দিবার জন্য দেবতাদের সাধনা করিয়াছিল—আর এখন বুঝিতে পারিল—সৌন্দর্যহীন সত্য, মিথ্যা সৌন্দর্যের চেয়ে অনেকগুণে বরণীয় ; বাস্তব আমাদের যতই আঘাত করুক শেষ পর্যন্ত তাহাই শেষনির্ভর।

৪

চিত্রাঙ্গদাকাব্য রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা ; শকুন্তলা কাব্যে একটি মাত্র নায়িকার দ্বারা বিরহমিলনের শেষ কথাটি বলা হইয়াছে, এমন বোধহয় আর কোনো সংস্কৃত কাব্যে হয় নাই। চিত্রাঙ্গদাকাব্যেতে একমাত্র নায়িকা চিত্রাঙ্গদা। কিন্তু এই একের মধ্যে দুই সৃষ্টি করা হইয়াছে, আর এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে প্রেমের অভিজ্ঞতা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

চিত্রাঙ্গদার দুইটি সত্তা ; বাহিরে সে রূপময়ী, অন্তরে সে প্রেমময়ী ; বাহিরের রূপ দেবদত্ত, অন্তরের প্রেম স্বাভাবিক। অর্জুন যাহাতে আকৃষ্ট

চিত্রাঙ্গদার তাহা সত্য রূপ নয়, প্রেমময়ী ত্রাসমিশ্র ঈর্ষার সঙ্গে দেখিতেছে অর্জুনের হৃদয়ের অর্ঘ্য ঐ মিথ্যার পদপ্রান্তে পড়িতেছে—কাজেই

কারে, দেব, করাইলে পান। কার তৃষা
মিটাইলে। সে চুম্বন, সে প্রেমসংগম
এখনো উঠিছে কাঁপি যে-অঙ্গ ব্যাপিয়া
বীণার ঝংকার সম, সে তো মোর নহে।
... ...
মীনকেতু,
কোন্ মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি ছায়ার মতন—
কী অভিসম্পাত!

আবার

অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতিন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে, আমার আকাঙ্ক্ষাতীর্থ
বাসরশয্যায়
... ...
ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর। হে অতনু,
বর তব ফিরে লও।

একদা যে বর পাইয়া নিজেকে সে সৌভাগ্যবতী মনে করিয়াছিল, আজ তাহা ফিরাইয়া দিবার জন্য কি আগ্রহ! অনঙ্গের কাছে অঙ্গের প্রার্থনা করিলে বোধহয় এইরূপ দণ্ডই হইয়া থাকে।

মদন জিজ্ঞাসা করিল এখন তাহার রূপ কাড়িয়া লইলে অতৃপ্ত অর্জুন কি তাহা সহ্য করিতে পারিবে? অর্জুন কি তাহাকে আক্রোশে পরিত্যাগ করিবে না? চিত্রাঙ্গদা বলিতেছে—

সেও ভালো। এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে। সেই আপনারে

করিব প্রকাশ ; ভালো যদি নাই লাগে,
ঘৃণাভরে চলে যান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তবু আমি আমি রব।

'এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে', অর্থাৎ মিথ্যা সৌন্দর্যের চেয়ে সত্য রূপহীনতা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, রোমান্টিক ছলনার চেয়ে রূঢ়বাস্তব শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু

'মরি যদি আমি, তবু আমি আমি রব'।...

বৈষ্ণব কবিদের রাধিকা হইলে অন্য উত্তর দিত ; সে বলিত, আমি মরি আর বাঁচি তাহা ভাবিবার নয়—আমার প্রিয় তৃপ্ত হইলেই হইল ; তাহাতেই আমার তৃপ্তি। প্রেমের আসল লক্ষণ আত্মবিস্মৃতি চিত্রাঙ্গদার প্রেমে নাই, সে 'আমি'টাকে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। 'আমি'-বিস্মরণের বৈরাগ্য তাহার মধ্যে নাই।

কবি লিখিয়াছেন—'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়!'

তিনি জগৎকে ভালোবাসেন বলিয়াই বৈরাগ্যব্রত তাঁহার নয় ; কিন্তু প্রেমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য আর কী আছে? যে প্রেম প্রেমাস্পদকে ছাড়া আর সকলকে, এমন কি নিজেকে পর্যন্ত ভুলিয়া যায়, তাহাই তো প্রকৃত বৈরাগ্য ; সে হিসাবে রাধা প্রেমের বৈরাগী, চিত্রাঙ্গদা কেবল অনুরাগী মাত্র।

চিত্রাঙ্গদার দেবদত্ত সৌন্দর্য ফিরাইয়া দিবার আগ্রহ দেখিয়া বসন্ত বলিতেছেন,

ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে
আপনি ঝরিয়া পড়ে যাবে, তাপক্লিষ্ট
লঘু লাবণ্যের দল ; আপন গৌরবে
তখন বাহির হবে, হেরিয়া তোমারে
নূতন সৌভাগ্য বলি মানিবে ফাল্গুনী।

মিথ্যাই হোক, আর সত্যই হোক, প্রেমের বিকাশে রূপেরও সার্থকতা আছে। রূপ ও প্রেম, বাহির ও অন্তর, দেহ ও আত্মা, দুইয়ে মিলিয়াই পরিপূর্ণ সত্তা।

গ্রীক শিল্পীরা এ সত্য জানিতেন ; আবার এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ গ্রীক প্লেটো ইহাকে অস্বীকার করিয়াছিলেন ; তিনি অন্তর্লোকের উপরে অধিকতর আস্থা

স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু রোমান্টিক সাহিত্যের আমলে এই দু'য়ের সন্ধি ভাঙিয়া গিয়া বাড়াবাড়ি ঘটিয়াছে—

'Life, like a dome of many-coloured glass
Stains the white radiance of eternity,
Until death tramples it to fragments.'

সূর্যের শুভ্রকিরণ ও সপ্তচ্ছদ বর্ণমালা বস্তুত একই, তবে চিত্রবর্ণ জীবন-দেউলের স্ফটিক ভাঙিয়া ফেলিয়া নিরঞ্জন শুভ্রতাকে দেখিবার অস্বাভাবিক আগ্রহ কেন? কারণ, রোমান্টিক মনোবৃত্তির কাছে বহিঃ অপেক্ষা অন্তঃ-র মূল্য অধিক; দেহ অপেক্ষা আত্মার দাবী বড়; তথ্যনিরপেক্ষ সত্যর প্রতি তাহার আকাঙ্ক্ষা অত্যুগ্র। রোমান্টিক মনোবৃত্তি জানে না যে, বহিঃ ও অন্তঃ মিলাইয়াই সত্তার সমগ্রতা, দেহ ও আত্মা, তথ্য ও সত্য মিলিয়াই সত্তার সম্পূর্ণ রূপ। রোমান্টিক মনোবৃত্তির ট্র্যাজেডি এই যে, জীবনকে সে ভালোবাসে, কিন্তু ভালোবাসায় যে ধৈর্য, যে সহিষ্ণুতার আবশ্যক সে গুণ তাহার নাই; জগৎকে সে জানিতে চায়, কিন্তু জ্ঞানের জন্য যে অবিচলিত নিষ্ঠার আবশ্যক সে নিষ্ঠা তাহার নাই; রোমান্টিক মনোবৃত্তির ট্র্যাজেডি এই যে, কাজ সে করিতে চায়, কিন্তু কর্মে প্রতিপদে যে আত্মনিয়ন্ত্রণ আবশ্যক সে নিয়মানুবর্তিতা তাহার নাই; রোমান্টিক মনোবৃত্তি "a beautiful and ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain."

প্রেমের বিকাশে রূপের প্রয়োজন আছে বসন্ত তাহা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা বুঝিয়াছে বলিয়া মনে হয় না—কারণ এই ধার-করা রূপে তাহার 'আমিত্ব' তৃপ্ত হইতেছে না; অর্জুনকে তৃপ্তি দিতে গিয়া তো আর সে নিজের আমিত্বকে খর্ব করিতে পারে না! ধার-করা রূপে যে তাহার আমিত্ব খর্ব হয়—তাহার প্রেমের লক্ষ্য প্রেমিক নয়—সে নিজে, তাহার বিশ্বগ্রাসী 'আমি'।

এই পর্যন্ত গেল চিত্রাঙ্গদার রূপের ট্র্যাজেডি। এবারে তাহার প্রেমের ট্র্যাজেডি দেখা যাক্। সে জানিত তাহার বাহিরের রূপ অন্তরের 'আমি'র শত্রু। তাহার ভয় ছিল একদিন অর্জুন রূপের এই ছলনা ধরিয়া ফেলিবে, তাই সে নিজে হইতেই ছলনাকে দূর করিয়া দিবার জন্য মদনবসন্তকে অনুরোধ করিয়াছিল। অনুরূপ একটা ভীতি প্রেম সম্বন্ধেও তাহার মনে ছিল; বিশ্ববিহীন, সমাজসম্বন্ধহীন, উন্মাদনসর্বস্ব, আরণ্য প্রেম চিরস্থায়ী নয়;

অরণ্যের পরিবেশ হইতে ইহাকে ছিন্ন করিয়া সংসারে লইয়া গেলে ছিন্নবৃন্ত অরণ্যের ফুলের মতোই ইহা ঝরিয়া যায়; জীবনের সমগ্র দাবিকে উপেক্ষা-কারী এ প্রেম টিকিতে পারে না, এ-মোহ একদিন ভাঙিবেই। কিন্তু মোহ-ভঙ্গের আগে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই লাভ; কালের দৈর্ঘ্যে আনন্দের বিচার নয়, স্বল্পস্থায়ী বলিয়াই আনন্দ আনন্দদায়ক, হীরার টুকরা ছোটই হয়।

এইদিক দিয়া দেখিতে গেলে চিত্রাঙ্গদা পুরাপুরি রিয়ালিস্ট, প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে এতটুকু ভ্রান্তিও তাহার মনে ছিল না। বরঞ্চ অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করিলে এ বিষয়ে তাহার দৃষ্টিকে স্বচ্ছতর বলিয়া মনে হয়।

চিত্রাঙ্গদা জানিত প্রেমের উন্মাদনায় শ্রান্তি আছে; যে-প্রেমের জীবন তাহারা যাপন করিতেছে, সেই রোমান্টিক প্রেমের স্থান সংসারে নয়; সমাজ বংশ গোত্রের দ্বারা ধরিতে গেলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়; অর্থাৎ প্রণয়িনা আর গৃহিণী একসঙ্গে পাওয়া যায় না; প্রণয়িনীর কালক্রমে গৃহিণী হইয়া উঠিতে আপত্তি নাই, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে প্রণয়িনী তখন আর প্রণয়িনী থাকে না।

অর্জুন এমন স্পষ্টভাবে এ বিষয়টি ধরিতে পারে নাই; সে প্রণয়িনীকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া চিত্রাঙ্গদার নামধাম বংশপরিচয় জানিতে চাহিয়াছিল। অথবা আরও সত্য কথা এই যে, অর্জুন চিত্রাঙ্গদার মধ্যে প্রণয়িনী ও গৃহিণীর সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা সেদিক দিয়াই গেল না—সে এই দুইটাকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে চায়; সে গৃহিণী হইবে, কিন্তু এখন নয়; প্রণয়িনীর পালা ফুরাইলে গৃহিণীরূপে সে দেখা দিবে। বসন্তের উক্তিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া লইলেই আমাদের কাজ চলিবে—

ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল।

ফুলের স্থানে প্রণয়িনী আর ফলের স্থানে গৃহিণী।

এইদিক দিয়া দেখিতে গেলে চিত্রাঙ্গদাকাব্যকে প্রেমের বিকাশের কাব্য বলা যাইতে পারে—প্রণয়িনী হইতে গৃহিণীর বিকাশ; পত্নীরূপ হইতে মাতৃ-রূপের বিকাশ; এই হিসাবেও ইহা শকুন্তলাকাব্যের সগোত্র।

অর্জুনের বীরচিত্তকে প্রেমের মদিরা বেশিদিন মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই; মোহ তাহার হইয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে মোহভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিল; একে একে বিরাট বিশ্ব আবার তাহার চোখে পড়িয়াছে।

প্রেমের সংগ্রাম হইতে পৃথিবীর সঙ্গলিপ্সা আবার তাহার মনে দেখা দিল; সে বুঝিল প্রেম যত বড়ই হোক বিশ্ব তাহার চেয়ে বড়। তাই সে একদিন চিত্রাঙ্গদাকে বলিল—প্রেমের পালা সাঙ্গ হইয়াছে; প্রেমের স্মৃতিকে বহন করিয়া এখন গৃহে ফিরিবার দিন আসন্ন।

শঙ্কিত চিত্রাঙ্গদা বলিতেছে—

. এ প্রেমের গৃহ আছে? ... ...

অর্জুন

গৃহ নাই?

চিত্রাঙ্গদা

নাই।

গৃহে নিয়ে যাবে! বোলো না গৃহের কথা!
গৃহ চিরবরষের; নিত্য যাহা থাকে
তাই গৃহে নিয়ে যেয়ো।

গৃহ শাশ্বত, শাশ্বতগৃহে প্রেমের শাশ্বতী মূর্তি—গৃহিণীমূর্তি সাজে; প্রেমের উন্মাদিনী মূর্তি, যে অবাস্তব রোমাণ্টিক প্রেমজীবন তাহারা যাপন করিতেছে, তাহার যথার্থ স্থান এই অরণ্যেই, সেখানে সমাজ নাই, সংসার নাই, বিশ্ব নাই—কেবল তাহারাই আছে।

কিন্তু অর্জুনের মন আজ লোকালয়ের জন্য আকুল; চিত্রাঙ্গদার প্রেমের প্রতিযোগিতার এই কি যোগ্য উত্তর—

... ... ওই শোনো
প্রিয়তমে, বনান্তের দূর লোকালয়ে
আরতির শান্তিশঙ্খ উঠিল বাজিয়া।
... ...

৬

চিত্রাঙ্গদা চায় মোহকে দীর্ঘায়িত করিতে—কারণ, মোহ তো একসময়ে ভাঙিবেই; অর্জুন চায় মোহাতীত মানুষকে। মোহের ক্ষণস্থায়িত্ব তাহাকে ভীত করে, মোহকে ধরা-ছোঁয়া যায় না; মানুষকে সে নামগোত্রবংশ দশ রকমে দৃঢ় করিয়া ধরিতে চায়।

চিত্রাঙ্গদা যখন দেবদত্ত রূপ দেবতাদের ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল—তারপরে কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে! এখন অর্জুন সেই রূপের আবরণ খুলিয়া

ফেলিয়া আসল মানুষটাকে চায় আর আসল মানুষ রূপের আড়াল ছাড়িয়া এখন বাহির হইয়া আসিতে রাজী নয়।

অর্জুন

কোনো গৃহ নাই তব, প্রিয়ে, যে ভবনে
কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয় পরিজন?
... ...

চিত্রাঙ্গদা

তুমি যারে ভালোবাসিয়াছ, সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধামহীন!

অর্জুন

কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে? এক
বিন্দু স্বর্গ শুধু ভূমিতলে ভুলে প'ড়ে
গেছে? ... ...
তাই সদা হারাই হারাই
করে প্রাণ, তৃপ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি
মানি। সুদুর্লভে, আরো কাছাকাছি এসো।
নামধাম-গোত্রগৃহ-বাক্যদেহমনে
সহস্র বন্ধন-পাশে ধরা দাও প্রিয়ে!
... ...

চিত্রাঙ্গদা

নাই, নাই, নাই। যারে বাঁধিবারে চাও
কখনো সে বন্ধন জানে নি। ... ...

অর্জুন

তাহারে যে ভালোবাসে
অভাগা সে। প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে
আকাশকুসুম! বুকে রাখিবার ধন
দাও তারে, সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দিনে।

এখানে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার দ্বন্দ্বের মূলে দুটি বিভিন্ন বস্তু, অর্জুন ভালো-মন্দ-ভুলত্রুটি-পূর্ণ মানুষের কথা বলিতেছে—আর চিত্রাঙ্গদা নিখুঁত, নিটোল

নিছক প্রেমের কথা বলিতেছে, যে প্রেম—"মেঘের স্বর্ণ ছটা, গন্ধ কুসুমের, তরঙ্গের গতি।"

অর্জুনের বীরচিত্তের জাগরণের মুখে এমন এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে কাহিনীর গতি ত্বরিত হইয়া উঠিয়া পরিণামকে অবশ্যম্ভাবীর মুখে ঠেলিয়া দিল। পার্বত্য জাতির অকস্মাৎ আক্রমণে মণিপুর রাজ্যে হাহাকার উঠিয়াছে; আগে চিত্রাঙ্গদা রাজ্যের রক্ষক ছিল—এখন সে তীর্থযাত্রা করাতে অসহায় প্রজাদের কে আর রক্ষা করিবে! চিত্রাঙ্গদার নর্মালাপের আহ্বানে অর্জুন বলিল—

আজ নহে
প্রিয়ে।

চিত্রাঙ্গদা

কেন নাথ?

অর্জুন

শুনিয়াছি, দস্যুদল
আসিছে নাশিতে জনপদ। ভীত জনে
করিব রক্ষণ।

চিত্রাঙ্গদা বলিল, কোনো ভয় নাই; তীর্থযাত্রাকালে রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা চিত্রাঙ্গদা করিয়া গিয়াছে। কিন্তু

অর্জুন

তবু আজ্ঞা করো, প্রিয়ে, স্বল্পকালতরে
করে আসি কর্তব্যসাধন। বহুদিন
রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু।

তারপরে চিত্রাঙ্গদা অন্যমনস্ক অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিতেছে সে কাহার কথা ভাবিতেছে। চিত্রাঙ্গদার? অর্জুন জানিত না যে, চিত্রাঙ্গদাই তাহার সম্মুখে; সে তাহাকে পাইয়াও পায় নাই। কেন? কেবল কি জানিত না বলিয়াই? না। সে কেবল চিত্রাঙ্গদার দেহটাকে পাইয়াছিল, দেহ ও দেহাতীত সত্তায় মিলিয়া যে সম্পূর্ণ মানুষ তাহাকে পায় নাই; প্রেমের উন্মাদনাকে পাইয়াছিল, উন্মাদনা ও শান্তি মিলিয়া যে প্রেমের পূর্ণতা তাহাকে সে পায় নাই; Irony-কে প্রকাশ করিবার জন্যই কবি অর্জুনকে দিয়া বলাইতেছেন—

বুঝতে পারি নে
আমি রহস্য তোমার। এতদিন আছি,

তবু যেন পাই নি সন্ধান। তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা ;
তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অন্তরালে থেকে আমারে করিছ দান
অমূল্য চুম্বন-রত্ন, আলিঙ্গন-সুধা ;
... ... অঙ্গহীন
ছন্দোহীন প্রেম প্রতিক্ষণে পরিতাপ
জাগায় অন্তরে। তেজস্বিনী, পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়।
... ...
সেই সত্য
কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে।
আমার যে-সত্য তাই লও।

এতক্ষণে অর্জুনের মোহ সম্পূর্ণ ভাঙিয়াছে। চিত্রাঙ্গদার মোহ ভাঙিবার ভয় ছিল—কিন্তু মোহ ছিল না। তাহার আশঙ্কা ছিল—

যামিনীর নর্মসহচরী
যদি হয় দিবসের কর্মসহচরী,
সতত প্রস্তুত থাকে বামহস্তসম
দক্ষিণহস্তের অনুচর, সে কি-ভালো
লাগিবে বীরের প্রাণে ?

কিন্তু অর্জুনের ব্যাকুলতা দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল অর্জুন সত্যই বীর অর্থাৎ সে মোহের চেয়ে সত্যকে বড় মনে করে ; বহিঃ অপেক্ষা অন্তরকে মূল্যবান মনে করে ; সুন্দর অবাস্তবের চেয়ে নিষ্করুণ বাস্তবকে বাঞ্ছনীয় মনে করে,—তাহার আত্মপ্রকাশে অর্জুন আর আঘাত পাইবে না—বরঞ্চ আত্মপ্রকাশ না করিলেই আহত হইবে। দেবদত্ত রূপের উল্লেখ করিয়া সে বলিতেছে—

যে-ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে-ফুলের মতো, প্রভু, এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর।
দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য
আছে, কত দৈন্য আছে ; আছে আজন্মের

কত অতৃপ্ত তিয়াষা। সংসার-পথের
পান্থ, ধূলিলিপ্ত বাস, বিক্ষত চরণ ;
কোথা পাব কুসুম-লাবণ্য, স্বদণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা। কিন্তু আছে
অক্ষয় অমর এক রমণীহৃদয়।

... ...

আছে এক সীমাহীন
অপূর্ণতা, অনন্ত মহৎ।

চিত্রাঙ্গদার এই আত্মপ্রকাশের উক্তির সঙ্গে 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের আত্মনিবেদনের কেমন মিল !

যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবারে পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।

চিত্রাঙ্গদার আর শেষের কবিতার মধ্যে কত বৎসরের দূরত্ব, কিন্তু কবির দৃষ্টির কোনো পরিবর্তন হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য অবাস্তবের মোহভঙ্গের কাব্য ; তাঁহার কাব্যে মোহভঙ্গের সূচনা আছে, কিন্তু কোথাও সম্পূর্ণতা নাই।

"অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে, তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেললাইনের ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে, আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে—তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফলসম্ভারে। সেইসঙ্গে কেন জানি না হঠাৎ আমার মনে হল, সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে, সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহবিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে।

যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগলজীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়; এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল; সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যার পাণ্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।"[১]

চিত্রাঙ্গদা কাব্যকে রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা বলিয়াছি—ইহা অতিরঞ্জনের অত্যুক্তি নহে, সূক্ষ্ম দর্শনের ফল। শকুন্তলা ও চিত্রাঙ্গদার প্রেমের বিকাশে অনুরূপত্ব আছে। আর শুধু শকুন্তলা কেন, কুমারসম্ভবের সঙ্গেও ইহার আন্তরিক ঐক্য। চিত্রাঙ্গদা মদনের সহায়তায় অর্জুনের চিত্ত জয় করিতে চাহিয়াছিল, সিদ্ধিলাভও করিয়াছিল, কিন্তু দেখিতে পাইল তাহাতে তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই। উমা ও শকুন্তলা উভয়েরই এই এক অভিজ্ঞতা হইয়াছিল।

"কুমারসম্ভব ও শকুন্তলাকে একত্র তুলনা না করিয়া থাকা যায় না। দুইটিরই কাব্যবিষয় নিগূঢ়ভাবে এক। দুই কাব্যেই মদন যে-মিলন সংসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে; সে মিলন অসম্পন্ন, অসম্পূর্ণ হইয়া, আপনার বিচিত্র কারুকার্যখচিত পরম-সুন্দর বাসরসজ্জার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে।......

স্পর্ধিত মদন যে-মিলনের কর্তৃত্বভার লইয়াছিল, তাহার আয়োজন প্রচুর। সমাজ-বেষ্টনের বাহিরে দুই তপোবনের মধ্যে অহেতুক আকস্মিক নবপ্রেমকে কবি যেমন কৌশলে, তেমনি সমারোহে, সুন্দর অবকাশ দান করিয়াছেন।"[২]

শকুন্তলাতে যাহা দৈবশাপ, চিত্রাঙ্গদাতে তাহা নায়িকার মনস্তাপ—এই মাত্র প্রভেদ। মদনের যে কি প্রতাপ তাহা কালিদাস জানিতেন, রবীন্দ্রনাথও

---

১ সূচনা, চিত্রাঙ্গদা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড।

২ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, পৃ ১৬, প্রাচীন সাহিত্য।

জানেন, কেহই তাহাকে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু কেহই সেই প্রতাপ মাত্রে থামিয়া থাকেন নাই; কাম হইতে প্রেমে, বাহিরের রূপ হইতে অন্তরের আশ্রয়ে, উন্মাদনা হইতে মঙ্গলে নিজেদের কাব্যপরিণামকে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন।

"দেশকালপাত্রকে মুহূর্তের মধ্যেই এমন কারয়া যে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়, সেই মীনকেতনের যে কি শক্তি, কালিদাস তাহা দেখাইয়াছেন। কিন্তু কবি সেইখানেই থামেন নাই। এই শক্তির কাছেই তিনি তাঁহার কাব্যের সমস্ত রাজকর নিঃশেষ করিয়া দেন নাই। তিনি যেমন হঠাৎ জয়সংবাদ আনিয়াছেন তেমনি অন্য দুর্জয় শক্তি দ্বারা পূর্ণতর চরম মিলন ঘটাইয়া তবে কাব্য বন্ধ করিয়াছেন।

... ...

যে প্রেমের কোনো বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযমদুর্গের ভগ্নপ্রাসাদের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। ... ...

যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয়, তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে, সেইজন্যই সে প্রেম অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না।" [১]

ইহা যেমন উমার পক্ষে সত্য, শকুন্তলার পক্ষে সত্য, তেমনি চিত্রাঙ্গদার পক্ষেও সত্য।

কালিদাসের মতে প্রেমের পরিণাম মাতৃত্বে; কুমারসম্ভবের জন্যই এত আয়োজন; স্বর্গকে দৈত্যকবল হইতে মুক্ত করিতে হইলে কুমারসম্ভবের আবশ্যক; আবার শকুন্তলাকাব্যও কুমারসম্ভব ছাড়া আর কিছু নয়—তাহাকে ভরতসম্ভব নাম দেওয়া যাইতে পারে। সত্য কথা বলিতে কি, কালিদাসের সমস্ত কাব্য, বিক্রমোর্বশী হইতে রঘুবংশ পর্যন্ত কুমারসম্ভাবনার কাব্য; তাঁহার একমাত্র বক্তব্য মানবের জন্মকথা।

চিত্রাঙ্গদা বলিতেছে—

গর্বে

আমি ধরেছি যে-সন্তান তোমার, যদি

১ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, পৃ ১৭-১৮, প্রাচীন সাহিত্য।

পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে
তখন জানিবে মোরে।

সেই পুত্রের মধ্যে চিত্রাঙ্গদার যথার্থ পরিচয়; অর্জুন সেইদিন তাহাকে যথার্থভাবে জানিতে পারিবে।

"জননীপদ আমাদের দেশে নারীর প্রধান পদ; সন্তানের জন্ম আমাদের দেশে একটি পবিত্র মঙ্গল ব্যাপার। সেইজন্য মনু রমণীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ',—তাঁহারা সন্তানকে জন্ম দেন বলিয়া মহাভাগা, পূজনীয়া ও গৃহের দীপ্তিস্বরূপা। সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্য কুমারজন্ম-রূপ মহৎ ব্যাপারের উপযুক্ত ভূমিকা। শকুন্তলাতে প্রথম অঙ্কে প্রেয়সীর সহিত দুষ্মন্তের ব্যর্থপ্রণয় ও শেষ অঙ্কে ভরতজননীর সঙ্গে তাঁহার সার্থক মিলন কবি অঙ্কিত করিয়াছেন।"[1]

"দেখা গেল, কুমার ও শকুন্তলার কাব্যে বিষয় একই। উভয় কাব্যেই কবি দেখাইয়াছেন, মোহে যাহার আরম্ভ, মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত; দেখাইয়াছেন ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধ্রুব, এবং প্রেমের শান্তসংযত কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠরূপ; বন্ধনে যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় সৌন্দর্যের আশু বিকৃতি।

তাঁহার [কালিদাসের] মতে নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্য হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে—কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকন্যা অতিথি প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।"[2]

উদ্ধৃত অংশ কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, চিত্রাঙ্গদার পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য। কাম ও প্রেমের দ্বন্দ্বের শান্তি সন্তান-জন্মে—যে সন্তান প্রণয়ী-প্রণয়িনীকে বিশ্ব-বিস্মৃত সংকীর্ণতা হইতে বাহির করিয়া মানুষের মধ্যে পুনরানয়ন করে। কুমারসম্ভবের ইঙ্গিতে চিত্রাঙ্গদা কাব্যখানিকে সেই বিরাট পটভূমিকার উপরে স্থাপিত করা হইয়াছে।

---

১ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, পৃ ২৩-২৪, প্রাচীন সাহিত্য।

২ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, পৃ ২৬-২৭, প্রাচীন সাহিত্য।

মদনের প্রতাপ যে শুধু চিত্রাঙ্গদা বুঝিয়াছে এমন নয়, অর্জুনও বুঝিয়াছে; ক্ষণকালের জন্য মোহগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু চরম মোহের অবস্থাতেও সে বীরের কর্তব্যকে বিস্মৃত হয় নাই; আর্ত মানুষের ক্রন্দন শুনিবামাত্র তাহার বীর্য জাগিয়া উঠিয়াছে, সে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছে; এদিক দিয়া দুষ্মন্তের সঙ্গে তাহার ঐক্য আছে। কি কণ্বের তপোবনে মোহের অবস্থায়, কি প্রাসাদের উপবনে বিরহের অবস্থায় সে রাজকর্তব্য ভুলিয়া যায় নাই; একবার সে মত্তহস্তীর আক্রমণ হইতে তপোবন রক্ষার জন্য, আর একবার দৈত্যহস্ত হইতে স্বর্গ উদ্ধারের জন্য দ্বিধামাত্র না করিয়া যাত্রা করিয়াছে; অর্জুন তাহার পূর্বপুরুষের রক্তসম্বন্ধ ভুলিতে পারে নাই।

গ্যেটের শকুন্তলা-সম্বন্ধীয় শ্লোকটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে—চিত্রাঙ্গদায় "আরম্ভের তরুণ সৌন্দর্য মঙ্গলময় পরম পরিণতিতে সফলতা লাভ করিয়া মর্ত্যকে স্বর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়াছে।"

প্রারম্ভে Lamia-র সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার তুলনা করিয়াছিলাম; বলিয়াছিলাম দুইটিই মোহভঙ্গের কাব্য; 'লামিয়া'তে কেবল মোহভঙ্গের কথাই আছে, চিত্রাঙ্গদাতে মোহভঙ্গ ছাড়া মোহভঙ্গের পরিণামও আছে। একটিমাত্র আইডিয়াকে অবলম্বন করিয়া বিকাশের ফলে কাব্য হিসাবে লামিয়া যে নিটোল অনবদ্যতা লাভ করিয়াছে, আইডিয়ার জটিলতার জন্য চিত্রাঙ্গদাতে তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ। চিত্রাঙ্গদা পড়িতে পড়িতে বারংবার এই কথা মনে হইয়াছে যে, মোহভঙ্গের আইডিয়াকে আপন নিয়ম অনুসারে বাড়িয়া উঠিতে দেওয়া হয় নাই; তাহার স্বাভাবিক গতিকে কবির সততব্যগ্র হাত নিজের ইচ্ছানুসারে মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছে; কবির ব্যস্তবাগীশ ফিলজফি সর্বদা একপোঁচ রং লাগাইয়া দিতে আগ্রহশীল; কাব্যখানি ফিলজফির গুরুত্বে যে পরিমাণ লাভবান্ হইয়াছে, কাব্যসৌন্দর্য সেই পরিমাণ হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই ক্ষীণ কাহিনীর উপরে যে পরিমাণ তত্ত্ব চাপানো হইয়াছে কাহিনীটি তাহা বহনক্ষম নয়। কালিদাস যে কাজ কুমারসম্ভবের সপ্তসর্গে ও শকুন্তলার সপ্তাঙ্কে করিয়াছেন, ররীন্দ্রনাথ তাহা বড় বড় অক্ষরে ছাপা সত্তরটি পৃষ্ঠায় করিতে উদ্যত। পত্রাঙ্ক গুনিয়া কাব্য-বিচারের রীতি নাই জানি—কিন্তু ইহাও জানি যে, একটা আইডিয়া ডালপালা মেলিয়া বিকশিত হইতে কিছু স্থান অধিকার করে—সেই স্থানের সঙ্কীর্ণতা হইলে তাহার বিকাশে বাধা ঘটে। চিত্রাঙ্গদা কাব্যের সঙ্কীর্ণ স্থান মোহভঙ্গের

আইডিয়ার পক্ষেই যথেষ্ট; তাহার পরিণামের বিকাশের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়; স্বল্প পরিসরে বহু আইডিয়াকে ভরিতে গিয়া একটা অন্ধকূপহত্যার ব্যাপার ঘটিয়াছে। কবির ঐশ্বর্যই এখানে তাঁহার শত্রু;—কবির যে পরিমাণ ভাবপ্রাচুর্য [কালিদাস তো আছেনই] সে পরিমাণ শিল্পজ্ঞান যেন নাই; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, কবির বয়সও তখন মাত্র ত্রিশের কোঠার প্রথম ধাপে।

আরও একটি কথা বারংবার মনে হইয়াছে, কাব্যখানিকে নাট্যরূপ না দিয়া কাহিনীরূপ দিলেই যেন সুবিচার হইত। ইহাতে নাটকীয় লক্ষণ বা গুণ বিশেষ নাই; পাত্রপাত্রীর মুখে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়া হইলেও সেগুলি কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়। পাত্রপাত্রীর নাম তুলিয়া দিয়া সামান্য একটু পরিবর্তন করিলেই ইহাকে কাহিনীতে পরিণত করা যাইতে পারে—কারণ, আকৃতির বিচারে নাটক হইলেও প্রকৃতির বিচারে ইহা কাহিনী। আর কাহিনীরূপ পাইলেই কথোপকথনের ফাঁকগুলি ভরিয়া উঠিয়া সমগ্র কাব্য সংহত হইয়া উঠিত, তাহাতে দীপ্তিও বাড়িত—নাট্যরূপের দ্বারা অযথা বাধাগ্রস্ত কবিও অনেকটা স্বাধীনতা পাইতেন।

মালিনী

মালিনী কাব্যনাট্যগুলির প্রায় সমসাময়িক রচনা। কাব্যনাট্যগুলি রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে ধর্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের যে প্রক্রিয়া চলিতেছিল মালিনীতেও তাহা কাজ করিতেছে।[১] বস্তুত বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মধ্যে ধর্মের স্বরূপ লইয়া যে মতভেদ ঘটিয়াছে—তাহা হইতেই ইহার নাটকীয় দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বলিতেছেন—

"আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশঙ্করের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নিশ্চল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে, মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসেনি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করেনি; সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার

১ সতী নাটকের মতো এখানেও কন্যাকেই আশ্রয় করিয়া ধর্মবিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে।

আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।”[১]

রাজকুমারী মালিনীর হৃদয়ে অকস্মাৎ সত্যধর্ম আবির্ভূত হইয়াছে; তাহার গুরু কাশ্যপের উপদেশ তাহাকে লালন করিয়াছে। তখনকার হিন্দুসমাজে, ধর্মের রক্ষক রাজপরিবারে, অভ্যস্তআচার পৌরজনের মধ্যে ইহার তীব্র প্রতিবাদ দেখা দিয়াছে। মালিনীর পিতা ও মাতা, রাজা ও মহিষী কন্যার এই নূতন ধর্ম বুঝিতে পারেন না; পৈতৃক ধর্মেই তাঁহারা অভ্যস্ত। পৌর ব্রাহ্মণগণ এই নবধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া মালিনীর নির্বাসন দাবি করিয়াছে; ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়, দুই বন্ধু ইহাদের নেতা।

ক্ষেমঙ্কর চিরাচরিত ধর্মের নেতা হইলেও অন্য ব্রাহ্মণদের মতো দুর্বলচরিত্র মূঢ়বুদ্ধি নয়। আবার সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করের প্রিয়তম বন্ধু হইয়াও বন্ধুর প্রতিধ্বনি মাত্র নয়। ক্ষেমঙ্করের ধর্ম-মতই তাহার ধর্ম-মত; অন্তত মালিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব পর্যন্ত তাহাই ছিল। মালিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে তাহার চরিত্রে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই ক্ষুদ্র ফাটল অচিরকালের মধ্যে বৃহত্তর হইয়া সর্বনাশের বন্যাকে নাটকের মধ্যে প্রবেশের পথ দিয়াছে। মালিনী, ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়—এই তিনজনই নাটকের প্রধান চরিত্র।

এখন, এই নাটকের অধিকাংশ পাত্রপাত্রী নিজ নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অনুসারে ধর্মের ব্যাখ্যা ও স্বরূপোদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তন্মধ্যে কতক কেবল গতানুগতিক মাত্র, আবার কতক অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত, কারণ আকস্মিক অভিজ্ঞতা তাহাদিগকে অভাবিতের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দিয়াছে।

মালিনীর নবধর্ম প্রচারে প্রজাগণের বিদ্রোহোন্মুখতায় ভীত রাজা কন্যাকে বলিতেছেন—

> হায়রে অবোধ মেয়ে, নবধর্ম যদি
> ঘরেতে আনিতে চাস্, সে কি বর্ষানদী
> একেবারে তট ভেঙে হইবে প্রকাশ
> দেশবিদেশের দৃষ্টিপথে? লজ্জা ত্রাস
> নাহি তার? আপনার ধর্ম আপনারি,

১ মালিনী, সূচনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থখণ্ড।

থাকে যেন সংগোপনে, সর্বনরনারী
দেখে যেন নাহি করে দ্বেষ, পরিহাস
না করে কঠোর। ধর্মেরে রাখিতে চাস্‌
রাখ্‌ মনে মনে।

স্পষ্টই বুঝা যায় রাজা ধর্মের আধ্যাত্মিকতার ধার ধারেন না; ইহার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াই তাঁহার একমাত্র দ্রষ্টব্য। মালিনী যদি বৌদ্ধ হইতে চায় তা হোক, কিন্তু তাহা যেন প্রকাশ হইয়া না পড়ে। বৌদ্ধ ও হিন্দু—উভয় ধর্মের প্রতিই তাঁহার অবিশ্বাসীর মনোভাব; তাঁহার কাছে ধর্ম বৃহত্তর রাজনীতির একটা প্রত্যঙ্গ মাত্র। অপ্রকাশিত নবধর্ম যেমন তিনি সহ্য করিতে প্রস্তুত, তেমনি বুঝিতে পারা যায় যে, রাজ্যরক্ষার জন্য কন্যাকে ত্যাগ করিতেও তাঁহার বাধিবে না।

কন্যা ও তাহার নবধর্মের প্রতি রাজা শ্রদ্ধা ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কখন? বিদ্রোহী প্রজাগণকে মালিনী যখন শান্ত করিয়া ফেলিল; বিদ্রোহীরা সোল্লাসে যখন তাহাকে রাজগৃহে ফিরাইয়া আনিল; মালিনীর কৃতিত্বে পতনোন্মুখ রাজসিংহাসন যখন আবার অটল হইল, মাত্র তখনই রাজা বলিতেছেন—

কি সৌন্দর্যময়
আজিকার ছবি। সমুদ্রমন্থনে যবে
লক্ষ্মী উঠিলেন—তাঁরে ঘেরি কলরবে
মাতিল উন্মাদনৃত্যে ঊর্মিগুলি সবে,
সেই মতো উচ্ছ্বসিত জনপারাবার
মাঝে তুমি লোকলক্ষ্মী মাতা।

ইহাতে কন্যাস্নেহ থাকিতে পারে, কিন্তু ধর্ম হিসাবে ধর্মের প্রশংসা নাই; ধর্ম যে ক্ষমতাশালী একটা রাজনৈতিক অস্ত্র—এই বোধই ইহাতে স্পষ্ট। একদা এই ধর্মের জন্যই রাজার সিংহাসন টলিয়া উঠিয়াছিল, আবার এখন ইহার জন্যই তাঁহার সিংহাসন দৃঢ় হইল, দুটাই বৃহত্তর রাজনীতির প্রতিক্রিয়া। মালিনীর প্রতি তাঁহার যে সপ্রশংস মনোভাব, তাহা আদৌ কন্যার ধর্মের জন্য নয়—কন্যার লোকচালনার ক্ষমতার জন্য।

মহিষীর ধর্মমতও গতানুগতিক, কিন্তু তাহার সঙ্গে কন্যাস্নেহ মিশ্রিত বলিয়া তাহাকে দুই বিপরীত কোটির মধ্যে দোদুল্যমান দেখি। তিনি অবশ্যই নবধর্ম পছন্দ করেন না।

এ ধর্ম কোথায় পেলি, এ শাস্ত্রবচন ?
আমার পিতার ধর্ম সে তো পুরাতন
অনাদি কালের। কিন্তু মাগো, এ যে তব
সৃষ্টিছাড়া, বেদছাড়া ধর্ম অভিনব
আজিকার গড়া। কোথা হ'তে ঘরে আসে
বিধর্মী সন্ন্যাসী ? দেখে আমি মরি ত্রাসে।

তেমনি আবার তিনি হিন্দুধর্মের জ্ঞানমার্গীয় অনুষ্ঠানকেও পছন্দ করেন না—

শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতেরা মরুক ভাবিয়া
সত্যাসত্য ধর্মাধর্ম কর্তাকর্মক্রিয়া
অনুস্বার-চন্দ্রবিন্দু লয়ে। পুরুষের
দেশভেদে কালভেদে প্রতিদিবসের
স্বতন্ত্র নূতন ধর্ম ; সদা হাহা করে
ফিরে তারা শান্তি লাগি সন্দেহ-সাগরে,
শাস্ত্র লয়ে করে কাটাকাটি।

তাঁহার ধর্ম মুখ্যত নারীর ধর্ম, কন্যার ধর্ম, মাতৃধর্ম, এবং সে হিসাবে চিরন্তন ধর্ম।

ধর্ম কি খুঁজিতে হয় ?
সূর্যের মতন ধর্ম চিরজ্যোতির্ময়,
চিরকাল আছে। ধর তুমি সেই ধর্ম
সরল সে-পথ। লহ ব্রতক্রিয়াকর্ম
ভক্তিভরে। শিবপূজা কর দিনযামী,
বর মাগি লহ বাছা তাঁরি মত স্বামী।
সেই পতি হবে তোর সমস্ত দেবতা,
শাস্ত্র হবে তারি বাক্য, সরল এ-কথা।

... ...

রমণীর
ধর্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির
পতিপুত্ররূপে।

রাজা যখন কন্যাকে নবধর্ম গ্রহণের জন্য তিরস্কার করিলেন তখন মহিষী তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—

কি শিক্ষা শিখাতে এলে আজ
পাপ রাষ্ট্রনীতি ? লুকায়ে করিবে কাজ,
ধর্ম দিবে চাপা ! সে মেয়ে আমার নয়।
সাধু সন্ন্যাসীর কাছে উপদেশ লয়,
শুনে পুণ্যকথা, করে সজ্জনের সেবা,
আমি তো বুঝি না তাহে দোষ দিবে কেবা
ভয় বা কাহারে ;

ইহা কেবল যে কন্যাকে রক্ষা করিবার জন্যই মহিষী বলিলেন এমন মনে করিবার কারণ নাই ; এই অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ করিয়া বৌদ্ধধর্মের নয়, হিন্দুধর্মেরও বটে, যে কোন ধর্মেরই হইতে পারে ; ভক্তি ইহার মূলে ; ইহা মানবধর্ম, বিশেষ করিয়া নারীর ধর্ম, কাজেই মনে করা যাইতে পারে কন্যার এই সব অনুষ্ঠানে মাতার অনুমোদন ছিল।

মহিষীর দোদুল্যমান মত সত্ত্বেও প্রধানত তাঁহার মন মাতৃ-মন, গৃহিণী-মন ; গৃহধর্মে, সংসারধর্মেই তাঁহার সবচেয়ে বেশি আস্থা। রাজা যখন মালিনীর লোকপরিচালন-ক্ষমতায় কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তখন মহিষী বলিতেছেন—

নবধর্ম নবধর্ম, কারে বল তুমি
কে আনিল নবধর্ম, কোথা তার ভূমি
আকাশকুসুম ? কোন্ মত্ততার স্রোতে
ভেসে এল—কন্যারে মায়ের কোল হতে
টানিয়া লইয়া যায়—ধর্ম বলে তায় ?
তুমিও দিয়ো না যোগ কন্যার খেলায়
মহারাজ। বলে দাও, গ্রহবিপ্রগণ
করুক সকলে মিলে শান্তিস্বস্ত্যয়ন
দেবার্চনা। স্বয়ংবর-সভা আনো ডেকে
মালিনীর তরে। মনোমত বর দেখে
খেলা ভেঙে যোগ্য কণ্ঠে দিক্ বরমালা—
দূর হবে নবধর্ম, জুড়াইবে জ্বালা।

সরলস্বভাবা মহিষী কি করিয়া জানিবেন রাজা আদৌ নবধর্মের জন্য ব্যস্ত নহেন ; নবধর্মের লোকশান্তিকর রাজনীতির স্বরূপ তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছে মাত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাইবে রাজার রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ মস্তিষ্কের চেয়ে মহিষীর মাতৃহৃদয়ের দৃষ্টিই সত্যতর।

পৌর ব্রাহ্মণগণের ধর্মমত একান্ত গতানুগতিক। রাজকন্যার নবধর্ম-গ্রহণের সংবাদে যেমন অকারণে উত্তেজিত ব্রাহ্মণগণ মালিনীর নির্বাসন দাবি করিল, বিদ্রোহের মুখে মালিনীর অতর্কিত দুঃসাহসিক আবির্ভাবে তেমনি অকারণে তাহারা মাথা নত করিয়া পড়িল। তাহারা সগৌরবে রাজকন্যাকে রাজগৃহে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া ভক্তের দলে ভিড়িল। যে ধাতুতে বিদ্রোহীর সৃষ্টি হয়, সে ধাতুতে তাহারা গঠিত নয়, ধর্মমতের জন্য ত্যাগ ও দুঃখস্বীকার করিতে তাহারা একেবারেই প্রস্তুত নয়।

কিন্তু তাহাদের দলের সকলেই এমন মাটির মানুষ নয়। ক্ষেমঙ্কর জন্ম-বিদ্রোহীর রক্তমাংসে গঠিত। ব্রাহ্মণগণের সহিত তাহার যেটুকু মিল তাহা ধর্মমতের মিল, আর সব দিক দিয়াই তাহারা ভিন্ন। সেইজন্যই স্বমতের প্রতিষ্ঠার জন্য সে দুঃখ, নির্বাসন, অপমান ও বন্ধুবিরহ সহ্য করিতে প্রস্তুত। নিষ্ঠাপিনদ্ধ দৃঢ় চারিত্র্যের উন্নত ভিত্তির উপরে সে স্বমতকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বলিয়াই তাহা সবচেয়ে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে; তাহার মতের স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতাকে তার ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয় না ; সমতল হইতে তাহা এত ঊর্ধ্বে উত্থিত যে, তাহাকে পার্থিব মনে না হইয়া চিরন্তন জ্যোতিষ্কলোকের সগোত্র বলিয়া মনে হয়। বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ক্ষেমঙ্করের বৈশিষ্ট্য নয় ; স্ফটিককঠিন চারিত্র্য-ই তাহার প্রধান সহায়। এই স্বচ্ছ স্ফটিকে নানা ভাব প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, কিন্তু স্ফটিকের পরিবর্তন হয় নাই ; প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহা সমান অনমনীয়, সমান দৃঢ়পিনদ্ধ।

ক্ষেমঙ্কর কর্তব্যনিষ্ঠ, কিন্তু হৃদয়হীন বা ভাবাবেগহীন নয়। শেষ মুহূর্তে সুপ্রিয়ের নবধর্ম-ব্যাখ্যা শুনিয়া সে বলিতেছে—

আমি কি দেখিনি ওরে ? [মালিনীকে]
আমিও কি ভাবি নাই মুহূর্তের ঘোরে
এসেছে অনাদি ধর্ম নারীমূর্তি ধ'রে
কঠিন পুরুষ মন কেড়ে নিয়ে যেতে
স্বর্গপানে ? ক্ষণতরে মুগ্ধ হৃদয়েতে

জন্মে নি কি স্বপ্নাবেশ ? অপূর্ব সঙ্গীতে
বক্ষের পঞ্জর মোর লাগিল কাঁদিতে
সহস্র বংশীর মতো,—সর্ব সফলতা
জীবনের যৌবনের আশাকল্পলতা
জড়ায়ে জড়ায়ে মোর অন্তরে অন্তরে
মুঞ্জরি উঠিল যেন পত্রপুষ্পভরে
এক নিমেষের মাঝে। তবু কি সবলে
ছিঁড়িয়া মায়ার বন্ধ, যাইনি কি চলে
দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষুকের মতো।

ক্ষেমঙ্করের চোখেও ঘোর লাগিয়াছিল, চিত্তে সৌন্দর্যাবেশ জন্মিয়াছিল, কিন্তু চারিত্র্যবেগ তাহাকে কর্তব্যের মুখে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার চরিত্র আলোচনার সময়ে তাহার হৃদয়ের এই ভাবাবেগ অনুভূতির ক্ষমতা মনে রাখিলে তাহার ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকারের গভীরতাকে কতক বুঝিতে পারা যাইবে।

গোড়াতে সুপ্রিয় ও ক্ষেমঙ্করের ধর্মমতে কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু তাহারা এক উপাদানে গঠিত নয়। বন্ধুপ্রণয় সুপ্রিয়ের হৃদয়ে অগাধ বলিয়াই বোধ করি বন্ধুত্বের খাতিরে সে ক্ষেমঙ্করের মতকে নিজের বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। অন্তত এ পর্যন্ত কোন কঠিন পরীক্ষা আসে নাই বলিয়া উভয়ের প্রভেদ বুঝিবার অবকাশ হয় নাই। কিন্তু অভাবিতভাবে যখন পরীক্ষা আসিল, বিশেষ চারিত্র্যসম্পদে সমৃদ্ধতর ক্ষেমঙ্কর যখন দূরে চলিয়া গেল—তখনই অত্যন্ত দ্রুত তাহার স্বকীয় ধর্মমতের বিবর্তন ঘটিল। শুধু তাই নয়—তাহার ধর্মমতে ও হৃদয়াবেগে এমন সূক্ষ্ম গ্রন্থি পাকাইয়া গেল যে, সে জটিল জাল ছেদন করিবার শক্তি আর তাহার রহিল না।

সুপ্রিয় শাস্ত্রগত ধর্ম সম্বন্ধে স্বভাবত সন্দিগ্ধ, তাহার হৃদয় কবিসুলভ-অনুভূতি-প্রবণ; প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রভাবের সে অধীন; ইতিপূর্বেই সে ক্ষেমঙ্করের প্রেমে ধরা দিয়াছে; তাহার বন্ধুত্বের জন্যই যেন সে তাহার ধর্ম-মত গ্রহণ করিয়াছে; বন্ধুত্ব পরিত্যাগের চেয়ে সুপ্রিয়ের কাছে ধর্মমত পরিত্যাগ অনেক সহজ।

মালিনীকে প্রত্যক্ষ করিবামাত্র সুপ্রিয়ের চিত্তে সুপ্ত সৌন্দর্যানুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছে। সে ক্ষেমঙ্করকে বলিতেছে—

মিথ্যা তব স্বর্গধাম,
মিথ্যা দেবদেবী ক্ষেমঙ্কর—ভ্রমিলাম
বৃথা এ-সংসারে এতকাল। পাই নাই
কোনো তৃপ্তি কোনো শাস্ত্রে, অন্তর সদাই
কেঁদেছে সংশয়ে। আজি আমি লভিয়াছি
ধর্ম মোর হৃদয়ের বড় কাছাকাছি।
সবার দেবতা তব, শাস্ত্রের দেবতা
আমার দেবতা নহে। প্রাণ তার কোথা,
আমার অন্তরমাঝে কই কহে কথা,
কি প্রশ্নের দেয় সে উত্তর—কি ব্যথার
দেয় সে সান্ত্বনা! আজি তুমি কে আমার
জীবনতরণী 'পরে রাখিলে চরণ,
সমস্ত জড়তা তার করিয়া হরণ
এ কী গতি দিলে তারে। এতদিন পরে
এ মর্ত্যধরণীমাঝে মানবের ঘরে
পেয়েছি দেবতা মোর।

সুপ্রিয় স্বভাবত হৃদয়াবেগপ্রবণ, কাজেই ধর্মকে সে হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে চায়; শাস্ত্র তাহার হৃদয়কে নাড়া দেয় না; হৃদয়কে নাড়া দিল কিনা ইহাই সুপ্রিয়ের কাছে ধর্মের সত্যতার পরীক্ষা।

ইহাতে আপত্তিকর কিছু নাই। কিন্তু মালিনীর সঙ্গে পরিচিত হইবামাত্র—অত্যন্ত প্রত্যাশিত পথে তাহার ধর্মমতের বিষম বিবর্তন ঘটিয়াছে। মালিনীর ধর্মমত ও ব্যক্তি মালিনীর মধ্যে সুপ্রিয়ের হৃদয়ে ভেদ ঘুচিয়া গিয়াছে। মালিনীর ধর্মমতকে ভালোবাসিতে গিয়া, সে মালিনীকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতেও আপত্তির কারণ নাই—কারণ ইহা অধর্ম নহে। কিন্তু সত্যকার অধর্ম এই যে, সে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে—ক্ষেমঙ্করের বিদ্রোহের রহস্য রাজার কাছে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। বন্ধুর পরিণামের জন্য সে শঙ্কিত—কিন্তু এই ষড়্‌যন্ত্রভেদকে সে অধর্ম বলিয়া মনে করে নাই। ক্ষেমঙ্কর বন্ধুর দুর্বলতা জানিত—সে এইরূপ আশঙ্কা লইয়াই বিদেশযাত্রা করিয়াছিল।

তার পরে সুপ্রিয়ের ধর্মমতের পরিবর্তন অত্যন্ত দ্রুত।

ওগো দেবী জ্যোতির্ময়ী—তাই আমি চাই
একটি আলোর রেখা উজ্জ্বল সুন্দর
তোমার অন্তর হ'তে

আবার—

প্রস্তুত রাখিব নিত্য
এ ক্ষুদ্র জীবন। আমার সকল চিত্ত
সরল নির্মল করি, বুদ্ধি করি শান্ত
সমর্পণ করি দিব নিয়ত একান্ত
তব কাজে।

আবার—

একাকিনী
দাঁড়াইয়া পূর্ণ মহিমায়, কি রাগিণী
বাজাইলে! বংশীরবে যেন মন্ত্রাহত
বিদ্রোহ করিল আসি ফণা অবনত
তব পদতলে।
... ...
লভিলাম যেন আমি নব জন্মভূমি
যেদিন এ শুষ্ক চিত্তে বরষিলে তুমি
সুধাবৃষ্টি।

সুপ্রিয় নিতান্ত আবেগমূঢ় না হইলে বুঝিতে পারিত—ইহা ধর্মাগ্রহ নহে, ইহা প্রেম, মালিনীর প্রতি নিতান্ত অন্ধ ব্যক্তিগত প্রেম মাত্র।

মৃত্যুর উপকণ্ঠে দাঁড়াইয়া সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করের কাছে স্বীকার করিয়াছে যে,

মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্ত্যলোকে
ওই নারীমূর্তি ধরি।

শৃঙ্খলাহত হইয়া পড়িবার সময়েও শেষবাক্য সে বলিয়াছে—"দেবী, তব জয়।"

শাস্ত্রগত ধর্মে সংশয়, হৃদয়গত ধর্মে আগ্রহ, মত ও মানুষে অভেদ, মতের চেয়ে মানুষের প্রতি অধিকতর আগ্রহ—অবশেষে ব্যক্তিগত প্রেমে জীবনের চরিতার্থতা লাভ, ইহাই সংক্ষেপে সুপ্রিয়ের ধর্মমতের বিবর্তন।

মালিনীর ধর্মমত আলোচনার সময়ে মনে রাখিতে হইবে নবধর্ম তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছে। আবির্ভাব সংজ্ঞাটির উপরে বিশেষ জোর দিতে হইবে। এই আবির্ভাব তাহার কাছেও অত্যন্ত বিস্ময়ের; ইহার মূলে দীর্ঘকালব্যাপী ধর্মজীবনের সাধনা তাহাকে করিতে হয় নাই। সেইজন্য যতদিন আবির্ভাবের দীপ্তি উজ্জ্বল ছিল ততদিন মালিনী যেন পথ দেখিতে পাইতেছিল। কিন্তু সাধনাহীন আবির্ভাব মিলাইতেই তাহার চোখে সব অন্ধকার হইয়া গেল, মালিনী সাধারণ রাজকন্যায় পর্যবসিত হইল আর ঘটনাপ্রবাহ অনিবার্য বেগে সর্বনাশের মুখে ছুটিয়া চলিল।

নবধর্মের আবির্ভাব মালিনীর কাছে এমনই অপ্রত্যাশিত যে, ইহাকে স্পষ্টভাষায় বুঝাইবার ক্ষমতা তাহার নাই; আভাসে ইঙ্গিতে, চিত্রে ইহাকে সে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে মাত্র।

মহাক্ষণ আসিয়াছে! অন্তর চঞ্চল
যেন বারিবিন্দুসম করে টলমল
পদ্মদলে। নেত্র মুদি শুনিতেছি কানে
আকাশের কোলাহল; কাহারা কে জানে
কি করিছে আয়োজন আমারে ঘিরিয়া,
আসিতেছে যাইতেছে ফিরিয়া ফিরিয়া
অদৃশ্য মূরতি। কভু বিদ্যুতের মতো
চমকিছে আলো, বায়ুর তরঙ্গ যত
শব্দ করি করিছে আঘাত। ব্যথাসম
কি যেন বাজিছে আজি অন্তরেতে মম
বারম্বার—কিছু আমি নারি বুঝিবারে
জগতে কাহারা যেন ডাকিছে আমারে।

আবার আছে—

আমি স্বপ্ন দেখি জেগে,
শুনি নিদ্রাঘোরে, যেন বায়ু বহে বেগে,
নদীতে উঠিছে ঢেউ, রাত্রি অন্ধকার,
নৌকাখানি তীরে বাঁধা—কে করিবে পার
কর্ণধার নাই—গৃহহীন যাত্রী সবে
বসে আছে নিরাশ্বাস—মনে হয় তবে

আমি যেন যেতে পারি—আমি যেন জানি
তীরের সন্ধান—মোর স্পর্শে নৌকাখানি
পাবে যেন প্রাণ—যাবে যেন আপনার
পূর্ণ বলে ; কোথা হ'তে বিশ্বাস আমার
এলো মনে ? রাজকন্যা আমি, দেখি নাই
বাহির সংসার—বসে আছি একঠাঁই
জন্মাবধি, চতুর্দিকে সুখের প্রাচীর,
আমারে কে করে দেয় ঘরের বাহির
কে জানে গো। বন্ধ কেটে দাও মহারাজ,
ওগো ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নহি আজ,
নহি রাজসুতা, যে মোর অন্তরযামী
অগ্নিময়ী মহাবাণী, সেই শুধু আমি।

জনতাকে সে বলিতেছে—

আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়,—
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা
যত দুঃখ যেথা আছে সকলের 'পরে
অনন্ত প্রবাহে। দেখ দেখ নীলাম্বরে
মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ পেয়েছে প্রকাশ।
কি বৃহৎ লোকালয় কি শান্ত আকাশ—
এক জ্যোৎস্না বিস্তারিয়া সমস্ত জগৎ
কে নিল কুড়ায়ে বক্ষে—ওই রাজপথ,
ওই গৃহশ্রেণী, ওই উদার মন্দির,
স্তব্ধচ্ছায়া তরুরাজি, দূরে নদীতীর,
বাজিছে পূজার ঘণ্টা, আশ্চর্য পুলকে
পূরিছে আমার অঙ্গ, জল আসে চোখে,
কোথা হ'তে এনু আমি আজি জ্যোৎস্নালোকে
তোমাদের এ বিস্তীর্ণ সর্বজনলোকে।

মালিনীর এই তিনটি বক্তৃতা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য, ইহা শাস্ত্রের ধর্ম নয়—

আবির্ভূত ধর্ম। ইহাকে সম্পূর্ণ প্রকাশের ভাষা নাই, কারণ এরূপ অভিজ্ঞতা কদাচিৎ হয়; ইহাকে চিরকাল ধারণের শক্তি তাহার নাই—কারণ সাধনালব্ধ ধর্মজীবনসম্পদে সে গরীয়সী নহে।

এই অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতাকে কেহ বোঝে, কেহ বোঝে না। কিন্তু এই আবির্ভাবের ফলে মালিনী এমন একটা শক্তি কিছুকালের জন্য লাভ করিয়াছিল যাহাতে জনতাকে সে বিচলিত করিতে, মুগ্ধ করিতে পারিয়াছে। জোয়ান অব্ আর্ক-এর চরিত্র ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে মালিনীর অভিজ্ঞতার যেন একটা ঐক্য আছে। জোয়ানকেও দৈব আবির্ভাব শেষজীবনে পরিত্যাগ করিয়াছিল। যে সব দৈববাণীর সে উল্লেখ করিত তাহার সঙ্গে নাটকের পূর্বোদ্ধৃত অংশ তিনটির মিল আছে। জনসঙ্ঘ সঞ্চালনেও জোয়ানের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। মালিনী-চরিত্র অঙ্কনের সময়ে কবির মনে যে জোয়ানের স্মৃতি আভাসে ছিল না—এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

চতুর্থ দৃশ্যে মালিনী আর দৈবী নারী নয়—সে সাধারণ রাজকন্যা। তখনো সে নবধর্মের কথা মুখে বলিতেছে বটে, কিন্তু সুপ্রিয়ের কাছে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। মহৎ কথার অন্তরালে বিশ্বপ্রেম কখনো ব্যক্তিগত প্রেমে, মানবপ্রেম কখনো নরনারীর সম্পর্কে, নবধর্ম কখনো অতি পুরাতন প্রেমধর্মে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। সাধনালব্ধ ধর্মজীবনের ভিত্তি না থাকিলে অকস্মাৎ আবির্ভূত ধর্ম দাঁড়াইবে কোথায়? এমন না হইলেই বিস্ময়ের ব্যাপার হইত বটে।

মালিনীর গুরু কাশ্যপ স্বীয় ধর্মমত প্রকাশ করিয়াছে। ইহাকে ধর্মমত না বলিয়া ধর্মের অনুশাসন বলা উচিত। কিন্তু তাহার উক্তি হইতে ধর্ম সম্বন্ধে তাহার ধারণা বোঝা একেবারে অসম্ভব নহে।

> ত্যাগ কর, বৎসে, ত্যাগ কর সুখ-আশা,
> দুঃখ-ভয়; দূর কর বিষয়পিপাসা;
> ছিন্ন কর সংসারবন্ধন; পরিহর
> প্রমোদপ্রলাপ চঞ্চলতা; চিত্তে ধর
> ধ্রুবশান্ত সুনির্মল প্রজ্ঞার আলোক
> রাত্রিদিন; মোহশোক পরাভূত হোক্।

পুনরায়—

> জ্ঞানসূর্য-উদয়-উৎসবে

জাগ্রত এ জগতের জয়জয়রবে
শুভলগ্নে সুপ্রভাতে হবে উদ্ঘাটন
পুষ্পকারাগার তব।

ইহাকেও শাস্ত্র বলা যাইতে পারে—কিন্তু এই শাস্ত্রবচনের সঙ্গে এখনো মানব-অভিজ্ঞতার ছেদ ঘটে নাই। ইহাতেও জ্ঞানমার্গের কথা আছে বটে, কিন্তু সে জ্ঞানের আলোতে ধর্মের সরল রাজপথটাই দেখিতে সাহায্য করে। পৌরব্রাহ্মণগণের শাস্ত্র হইতে ইহা কত ভিন্ন! আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, কাশ্যপের ধর্মমতের পশ্চাতে তাহার ধর্মজীবন আছে, মালিনীতে যাহার একান্ত অভাব। কাশ্যপ তীর্থভ্রমণে না গেলে মালিনীকে হয়তো সে এমন দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী হইতে দিত না। শিষ্যাকে ধর্মসাধনার নিমিত্ত গুরু, রাখিয়া গেল—আর শিষ্যা সাধনা শেষ হইবার পূর্বেই ধর্মপ্রচারে অবতীর্ণ হইয়া পড়িল।

প্রধান প্রধান চরিত্রের বিচিত্র ধর্মমতের আলোচনা করা গেল। এখন এই সব বিচিত্র ধর্মমতের সংঘর্ষেই মালিনী নাটকের ঘটনাস্রোত পরিণামের মুখে বিতাড়িত; আর দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সাধনাহীন ব্যক্তির অপরিণত ধর্মানুসরণের ফলেই মালিনী নাটকের ট্র্যাজেডি সংঘটিত হইয়াছে।

ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়ের মতো বিরুদ্ধপ্রকৃতি, বিপরীতমত, একজন চারিত্র্য-প্রবল, আর একজন তীব্র অনুভূতিপ্রবণ যুগল চরিত্রসৃষ্টি রবীন্দ্রসাহিত্যে অবিরল। গোরা ও বিনয় ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহারা বিরুদ্ধ-স্বভাব বলিয়াই পরস্পরকে বন্ধুত্ববন্ধনে আকর্ষণ করে; সমস্বভাব লোকের মধ্যে বন্ধুত্ব গভীর হয় না। গোরা দুর্বলতর প্রকৃতির, অথচ তীব্রতর অনুভূতিপ্রবণ এবং বুদ্ধিমত্তর বিনয়কে লইয়া স্বীয় চিহ্নিত পথে চলিতেছিল; বিনয় গোরার বন্ধুত্বের খাতিরেই তাহার সঙ্গী হইয়াছিল—নিজের স্বাভাবিক প্রবণতা সেদিকে তেমন ছিল না। গোরা যখন জেলে গেল—সেই অবকাশে সে সম্পূর্ণরূপে ললিতার কাছে ধরা দিল। ক্ষেমঙ্করের বিদেশে প্রস্থানে সুপ্রিয় যেমন ট্র্যাজেডির অবতারণ করিয়া বসিয়াছিল বিনয়ও তেমনি গোরার অনুপস্থিতিতে গোরার অপ্রিয় কাজ করিয়া বসিল,—যদিচ সুপ্রিয়ের কাজের গুরুত্বের সঙ্গে বিনয়ের কাজের তুলনা করা সঙ্গত হইবে না।

ক্ষেমঙ্কর বন্ধুর স্বাভাবিক দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিল, তাই সে বিদেশে যাইবার আগে বারংবার তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া গিয়াছিল। যখন বিদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ মালিনীর অনুবর্তী হইয়া পড়িল তখন ক্ষেমঙ্কর বলিতেছে—

হে সুপ্রিয়, তুলে চাও আঁখি।
কথা কও। বল তুমি, আমারে একাকী
ফেলিয়া কি চলে যাবে মায়ার পশ্চাতে
বিশ্বব্যাপী এ দুর্যোগে, প্রলয়ের রাতে?

সুপ্রিয়

কভু নহে, কভু নহে। নিদ্রাহীন চোখে
দাঁড়াইব পার্শ্বে তব।

ক্ষেমঙ্কর বলিতেছে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া আবাব ফিরিয়া আসিবে, সুপ্রিয়ের প্রতি তাহার প্রেম অটল থাকিবে।

শুধু মনে ভয় হয়
আজি বিপ্লবের দিন বড় দুঃসময়,
ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ধ্রুববন্ধুচয়,
ভ্রাতারে আঘাত করে ভ্রাতা, বন্ধু হয়
বন্ধুর বিরোধী! বাহিরিনু অন্ধকারে,
অন্ধকারে ফিরিয়া আসিব গৃহদ্বারে;
দেখিব কি দীপ জ্বালি বসি আছ ঘরে
বন্ধু মোর! সেই আশা রহিল অন্তরে।

ক্ষেমঙ্করের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করের মৃত্যুজাল পাতিবার কারণ হইল। কিন্তু মতের ও পথের ভেদ সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি প্রেম অক্ষুণ্ণ ছিল।

সুপ্রিয় মালিনীর প্রতি প্রণয়ের মোহের বশবর্তী হইয়া ষড়্‌যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু মনে তার শান্তি নাই।

রাজারে দেখানু পত্র! মৃগয়ার ছলে
গোপনে গেছেন রাজা সৈন্যদলবলে
আক্রমিতে তারে। আমি হেথা লুটাতেছি
পৃথ্বীতলে—আপনার মর্মে ফুটাতেছি
দন্ত আপনার।

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে যখন উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে তখনো দু'জনের জীবন-দৃষ্টির প্রভেদ চমৎকার ফুটিয়াছে।

স্থপ্রিয়

ওগো বন্ধু, এ ভুবন
নহে কি বৃহৎ? নাহি কি অসংখ্য জন,
বিচিত্রস্বভাব? কাহার কি প্রয়োজন
তুমি কি তা জানো? গগনে অগণ্য তারা
নিশি নিশি বিবাদ কি করিছে তাহারা
ক্ষেমঙ্কর? তেমনি জ্বালায়ে নিজ জ্যোতি
কত ধর্ম জাগিতেছে, তাহে কোন্ ক্ষতি?

স্থপ্রিয়ের যুক্তি হয়তো সত্য, কিন্তু এই যুক্তির বলে তাহার বিশ্বাস-ঘাতকতা সমর্থন করা যায় না। ক্ষেমঙ্কর বলিতেছে—

মিছে আর কেন বন্ধু! ফুরালো সময়,
বাক্য লয়ে মিথ্যা খেলা, তর্ক আর নয়।
সত্য মিথ্যা পাশাপাশি নির্বিরোধে রবে
এত স্থান নাহি নাহি অনন্ত এ ভবে। …
হে স্থপ্রিয়, প্রেম এত সর্বপ্রেমী নয়।
ছিল চিরদিবসের বিশ্রব্ধ প্রণয়,
আনিবে বিশ্বাসঘাত বক্ষোমাঝে তার
বন্ধু মোর, উদারতা এত কি উদার!
কেহ বা ধর্মের লাগি সহি নির্যাতন
অকালে অস্থানে মরে চোরের মতন,
কেহ বা ধর্মের ব্রত করিয়া নিষ্ফল
বাঁচিবে সম্মানে স্থখে, এ ধরণীতল
হেন বিপরীত ধর্ম এক বক্ষে বহে—
এত বড় এত দৃঢ় নহে কভু নহে।

স্থপ্রিয়

ক্ষেমঙ্কর, তুমি দিবে প্রাণ।
আমার ধর্মের লাগি করিয়াছি দান
প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার প্রণয়,
তোমার বিশ্বাস! তার কাছে প্রাণভয়
তুচ্ছ শতবার!

ক্ষেমঙ্কর স্বহস্তে বন্ধুকে যে মৃত্যু-আঘাত হানিল তার মূলে আছে তাহার প্রণয়, বন্ধুকে ভালোবাসে বলিয়াই বন্ধুর প্রায়শ্চিত্তে ক্ষেমঙ্করের সাহায্য করিবার ইচ্ছা। সে বলিতেছে, বাল্যকালে তাহারা যেমন সারারাত্রি তর্ক করিয়া প্রভাতে গুরুর কাছে সত্যনির্ণয় করিবার আশায় যাইত—আজও তেমনি দুইজনে জীবনতর্কের মীমাংসার জন্য ধর্মরাজ মৃত্যুর কাছে যাইবে। কারণ

> সেথায় প্রত্যক্ষ সত্য উজ্জ্বল উন্নত ;
> মুহূর্তে পর্বতপ্রায় বিচারবিরোধ
> বাষ্পসম কোথা যাবে! দুইটি অবোধ
> আনন্দে হাসিব চাহি দোঁহে দোঁহাকারে।

সুপ্রিয়ের কাছে ধর্ম ও জীবনে বিরোধ ছিল—তাহাদের অভিন্ন করিয়া সে দেখিতে পারে নাই। চারিত্র্যপ্রবল ক্ষেমঙ্করের কাছে জীবন ও ধর্ম অভিন্ন। বন্ধুর প্রণয় ও নিজের ধর্মমত তাহার কাছে তুল্যমূল্য। ক্ষেমঙ্করের ধর্মমত হয়তো সঙ্কীর্ণ, দুর্বল লোকের হাতে এই ধর্মমত শুষ্ক আচার মাত্র হইয়া ওঠে, কিন্তু ক্ষেমঙ্করের চরিত্রমাহাত্ম্য তাহাকে ক্ষুদ্রতা হইতে সবলে উন্নীত করিয়া তুলিয়াছে। এ যেমন একদিকে, আবার তেমনি সুপ্রিয়ের ধর্মমত ক্ষেমঙ্করের চেয়ে উদারতর হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল চরিত্রের জীর্ণ মঞ্চ ভাঙিয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে।

ক্ষেমঙ্কর ও রঘুপতির চরিত্র নানা কারণে তুলনীয়। দু'জনেই চারিত্র্য-প্রধান ; দু'জনেরই ধর্মমত সঙ্কীর্ণ ; দু'জনেই ধর্মের জন্য রাজদ্রোহী ; নিজের ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য দু'জনেই বিদেশে সৈন্যসংগ্রহে গিয়াছে [রাজর্ষির রঘুপতি, বিসর্জনের নহে] এবং তাহাদের চারিত্র্যবেগের স্রোতে বিতাড়িত হইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্বলপ্রকৃতি, বিশ্বাসপ্রবণ সুপ্রিয় ও জয়সিংহ প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। রঘুপতির চরিত্রের ক্ষেত্র প্রশস্ততর, ক্ষেমঙ্করের সঙ্কীর্ণ ; কিন্তু সঙ্কীর্ণতার চাপেই সংহত হইয়া, ঘনীভূত হইয়া, স্ফটিকের দীপ্তি ও সংহতি লাভ করিয়া ক্ষেমঙ্কর-চরিত্র রঘুপতি-চরিত্রের চেয়ে অধিকতর সজীব ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

মালিনী-চরিত্র আলোচনার সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, তাহার ধর্মের প্রেরণা সাধনাজাত নহে, তাহা আবির্ভাবজাত, তাহা মূলহীন অর্থে অমূলক। যতক্ষণ তাহার চিত্তে এই আবির্ভাবের দীপ্তি উজ্জ্বল ছিল ততক্ষণ সে অসাধারণ, আবির্ভাবের দীপ্তি ম্লান হইতেই সে সাধারণ রাজকন্যা মাত্র।

প্রথম তিন দৃশ্যে সে অসাধারণ; চতুর্থ বা শেষ দৃশ্যে সে আর পূর্বের ধর্ম-রাগোজ্জ্বল দেবী নয়, পূর্বরাগোজ্জ্বল প্রণয়িনী মাত্র। কেন এমন হয় পূর্বেই তাহার আলোচনা করিয়াছি; অপ্রত্যাশিত দৈব আবির্ভাবের তলাতে সাধনা না থাকিলে সে দীপ্তি দীর্ঘকাল থাকে না। যদি এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবকে সে সাধনায় নিয়োগ করিয়া ধর্মজীবন গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিত তাহা হইলে এমন ঘটিত না, কিন্তু সদ্যোজাত আবির্ভাবের অভিজ্ঞতাকে সে জীবনে লালন করিয়া না তুলিয়াই সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, অভ্যাসের মধ্যে তাহার শিকড় গজাইবার অবসর দেয় নাই; সেই জন্য ব্যক্তিগত প্রেমের প্রবল অভিজ্ঞতা যখন কুমারীচিত্তকে স্পর্শ করিল তখন তাহা দিব্যপ্রেরণার চেয়ে প্রবলতর হইয়া দেখা দিল; হঠাৎ দেবীর চিত্ত বিদীর্ণ করিয়া প্রণয়াতুর সুপ্ত মানবকন্যা বাহির হইয়া আসিল। নাটকের ট্র্যাজেডির ইহাই প্রকৃত স্বরূপ।

ইতিপূর্বে প্রথম তিন দৃশ্যের দেবী মালিনীর চরিত্রালোচনা করিয়াছি। এক্ষণে শেষ দৃশ্যের মানবী মালিনীর চরিত্রালোচনা করা যাইতে পারে।

রাজ-উপবনে মালিনী ও সুপ্রিয় কথাবার্তা বলিতেছে। প্রথমেই লক্ষণীয় যে, ইতিপূর্বে নবধর্ম সম্বন্ধে, লোকচালনা সম্বন্ধে মালিনীর মনে যে অসংশয় ভাব ছিল এখানে তাহা চলিয়া গিয়াছে।

যে-মালিনী এক সময়ে বলিয়াছিল—

> নৌকাখানি তীরে বাঁধা, কে করিবে পার,
> কর্ণধার নাই; গৃহহীন যাত্রী সবে
> বসে আছে নিরাশ্বাস, মনে হয় তবে
> আমি যেন যেতে পারি, আমি যেন জানি
> তীরের সন্ধান, মোর স্পর্শে নৌকাখানি
> পাবে যেন প্রাণ, যাবে যেন আপনার
> পূর্ণ বলে; কোথা হ'তে বিশ্বাস আমার
> এলো মনে?

সে এখন সুপ্রিয়কে বলিতেছে—

> মহাধর্ম-তরণীর বালিকা কাণ্ডারী
> নাহি জানি কোথা যেতে হবে। মনে হয়
> বড় একাকিনী আমি, সহস্র সংশয়,
> বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ,

নানা প্রাণী, দিব্যজ্ঞান ক্ষণপ্রভাবৎ
ক্ষণিকের তরে আসে।

মালিনী ঠিকই বুঝিরাছে 'দিব্যজ্ঞান ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিকের তরে আসে।' দিব্যজ্ঞানের অভাবে নিজের উপর হইতে তাহার বিশ্বাস যে পরিমাণে চলিয়া গিয়াছে সেই পরিমাণে বিশ্বাস স্থাপিত হইয়াছে সুপ্রিয়ের প্রতি।

তুমি মহাজ্ঞানী
হবে কি সহায় মোর ?···
অকস্মাৎ
আপনার 'পরে যেন পড়ে দৃষ্টিপাত
সহস্র লোকের মাঝে; সেই দুঃসময়ে
তুমি মোর বন্ধু হবে ? মন্ত্রগুরু হয়ে
দিবে নবপ্রাণ ?

মালিনীর মনে আত্মবিশ্বাস এতদূর কমিয়া গিয়াছে যে, নিজ ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে উদ্যত।

অনেক সময়েই প্রশংসা প্রেমের অগ্রদূত। এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। মালিনী নিজের অগোচরে সুপ্রিয়কে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে—তবু এখনো এই 'নূতনধর্ম' তাহার নিজের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই,—কিন্তু অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতেও হইল না। এই দৃশ্যের শেষের দিকেই মালিনী মনের পরিবর্তন বুঝিতে পারিয়াছে।

প্রতিহারী যখন আসিয়া বলিল—'প্রজাগণ দরশন যাচে' তখন মালিনী যে লোকমাতা বলিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সে বলিয়া পাঠাইল— আজ নয়, আজ সে একাকী বিশ্রাম করিতে চায়। লোকমাতা এক্ষণে ব্যক্তিগত প্রণয়িনী হইবার মুখে।

তারপরে মালিনীর প্রশ্নের উত্তরে সুপ্রিয় তাহাদের বন্ধুত্বের কাহিনী, ষড়্‌যন্ত্রের সংবাদ, ষড়্‌যন্ত্রভেদের তথ্য প্রকাশ করিয়াছে। মালিনী ক্ষেমঙ্করের প্রতি বিরূপ না হইয়া কৃপাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত ইহা ক্ষেমঙ্করকে কৃপা নয় প্রণয়ীর বন্ধু বলিয়াই তাহার প্রতি একরূপ পরোক্ষ প্রীতি অনুভব।

এমন সময়ে রাজা প্রবেশ করিলেন, তিনি সুপ্রিয়ের সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া মৃগয়াচ্ছলে গিয়া সসৈন্যে আগতপ্রায় ক্ষেমঙ্করকে পরাজিত করিয়া আসিয়াছেন। রাজা সুপ্রিয়কে পুরস্কৃত করিতে চান। সুপ্রিয় কী পুরস্কার কামনা করে ? রাজ্যখণ্ড ? না। তবে কি সে রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী ?

বেশিদিন নহে, বিপ্র, সে কি মনে পড়ে
এই কন্যা মালিনীর নির্বাসন তরে
অগ্রবর্তী ছিলে তুমি। আজি আরবার
করিবে কি সে প্রার্থনা? রাজদুহিতার
নির্বাসন পিতৃগৃহ হ'তে? সাধনার
অসাধ্য কিছুই নাই—বাঞ্ছা সিদ্ধ হবে,
ভরসা বাঁধহ বক্ষোমাঝে। শুন তবে
জীবনপ্রতিমে বৎসে, যে তোমার প্রাণ
রক্ষা করিয়াছে, সেই বিপ্র গুণবান্
সুপ্রিয় সবার প্রিয়। প্রিয়দরশন,
তারে—

এই স্পষ্টভাষণে সুপ্রিয় আপত্তি করিয়াছে, বন্ধুর সর্বনাশ করিয়া সে নিজে সার্থকতা লাভ করিতে চায় না। কিন্তু মালিনী আভাস-মাত্রেও আপত্তি করে নাই। এ কোন্ মালিনী? কোন সাধারণ মানবকন্যা হইলেও সে বোধ করি এমন বিবাহে অন্তত একবারের জন্যও মৌখিক আপত্তি প্রকাশ করিত। আর বন্ধুঘাতী, বিশ্বাসঘাতী, তাহার নবধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী এই লোকটাকে বিবাহ করিতে মালিনী একবারও দ্বিধা করিল না! আশ্চর্য! ক্ষেমঙ্করের প্রাণদণ্ড হইবে জানিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবার জন্য সে রাজাকে অনুরোধ করিয়াছে বটে। কিন্তু তাহা নবধর্মের অহিংসার আদর্শের অনুরোধে, না ক্ষেমঙ্করের প্রাণদানের আশা করিয়া নিজের প্রণয়ী সুপ্রিয়কে দুঃখ ও চরম আত্মগ্লানি হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছাতেই, কে বলিবে? ইহাকে নিষ্কাম বলিতে পারি না।

মালিনীর ব্যবহারে রাজা পরম নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার কন্যা আর দেবী নহে, নিতান্তই মানবী।

কন্যা, কোথা ছিল এ সরম
এতদিন। বালিকার লজ্জা ভয় শোক
দূর করি দীপ্তি পেতো অম্লান আলোক
দুঃসহ উজ্জ্বল। কোথা হ'তে এলো আজ
অশ্রুবাষ্পে ছলছল কম্পমান লাজ—
... ...
বহু দিন পরে মোর মালিনীর ভাল
লজ্জার আভায় রাঙা। কপোল উষার

যখন রাঙিয়া উঠে, বুঝা যায়, তার
তপন উদয় হ'তে দেরি নাই আর।
এ রাঙা আভাস দেখে আনন্দে আমার
হৃদয় উঠিছে ভরি—বুঝিলাম মনে
আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতক্ষণে
বিকশি উঠিল ; দেবী না রে, দয়া না রে,
ঘরের সে মেয়ে।

ঘরের মেয়ের মধ্যে দেবী মালিনীর এইখানে বিসর্জন। যাঁহারা গৃহিণীপনার মধ্যে দেবী চৌধুরাণীর আত্মবিলোপকে অসম্ভব মনে করেন—তাঁহারা এ সম্বন্ধে কি বলিবেন ?

সুপ্রিয়ের মৃত্যুর পরে মালিনী ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমা করিতে কেন অনুরোধ করিল ?

ইহা কি ক্ষেমঙ্করের প্রতি দূরবর্তী প্রেমের প্রথম ইঙ্গিত ? ক্ষেমঙ্করের আদর্শনিষ্ঠার কথা সে শুনিয়াছিল ; শৃঙ্খলিত ক্ষেমঙ্করকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিয়াছিল—

লোহার শৃঙ্খল
ধিক্কার মানিছে যেন লজ্জায় বিকল
ওই অঙ্গ 'পরে। মহত্ত্বের অপমান
মরে অপমানে। ধন্য মানি এ পরান
ইন্দ্রতুল্য হেন মূর্তি হেরি।

ইহা প্রেম নয়, প্রশংসা। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে প্রশংসা প্রেমে পরিণত হইতে কতক্ষণ ? সুপ্রিয়ের বেলাতেও ইহা দেখা গিয়াছে। তবে তর্ক উঠিতে পারে সুপ্রিয়ের হত্যাকারীকে সে কি ভালোবাসিতে পারে ? যে নিজের সাধের নবধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভালোবাসিতে পারে, বন্ধুঘাতী, বিশ্বাসঘাতীকে ভালোবাসিতে পারে, কালক্রমে সে যে প্রণয়ী-ঘাতীকে ভালোবাসিতে না পারিবে তাহা কে বলিল ? দুর্বল প্রকৃতি অনেক সময়েই প্রবলকে, নিষ্ঠুরকে, নরঘাতী অপরাধীকে ভালোবাসিতে উদ্‌গ্রীব। আর মালিনী কত যে দুর্বল তাহা তো দেখা গেল !

কিংবা এমনও হইতে পারে যে, ক্ষেমঙ্করকে দণ্ডদানের আশাতেই মালিনী তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছে। ষড়্‌যন্ত্রভেদের ফলে ক্ষেমঙ্করের জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন তাহার একমাত্র

সান্ত্বনা ছিল মৃত্যু। কিন্তু বন্ধুকে ছাড়িয়া মরিয়াও সান্ত্বনা নাই। তাই সে বন্ধুকে নিহত করিল। এখন ক্ষেমঙ্করের একমাত্র কাম্য, একমাত্র সার্থকতা, একমাত্র সান্ত্বনা মৃত্যু। মালিনী খুব সম্ভবত তাহাকে সেই শেষসান্ত্বনা হইতেও বঞ্চিত করিবার জন্যই জীবনদান করিতে রাজাকে অনুরোধ করিয়াছে। তাহার প্রণয়ীর মৃত্যুর কারণ-স্বরূপ এই লোকটিকে দণ্ডিত করিবার এই একটিই শেষ উপায় তাহার হাতে মাত্র ছিল।

কোন্ মতটি সত্য নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না—পাঠক নিজের অভিরুচি অনুসারে যে কোনোটি গ্রহণ করিতে পারেন।

পরবর্তী কালে মালিনীর ভূমিকা লিখিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা সেইটেতেই এর কাব্যরস। এই ভাবের অঙ্কুর আপনা-আপনি দেখা দিয়েছিল প্রকৃতির প্রতিশোধে সেকথা ভেবে দেখবার যোগ্য। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে হয়তো তারও আগে এর আভাস পাওয়া যায়।"[১]

রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে ইহাকে প্রকৃতির প্রতিশোধের অঙ্গীভূত দেখিয়াছেন তাহা সত্য কি না বলিতে পারি না—তবে অন্য একভাবে মালিনীর ট্র্যাজেডি যে প্রকৃতির প্রতিশোধ তাহাতে সন্দেহ নাই।

মানবপ্রকৃতিকে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে ক্ষুধিত রাখিয়া, সেই শূন্যতার উপরে মহত্তর জীবনের বেদী-রচনা করিতে গেলে অকস্মাৎ তাহা ধ্বসিয়া পড়ে, মালিনী নাটক হইতে এই ইঙ্গিতটি পাওয়া যায়।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর চিত্ত ক্ষুধিত ছিল বলিয়াই সে তপস্যায় শান্তি পায় নাই—তাহাকে রঘুর কন্যার স্নেহে আবদ্ধ হইয়া সংসারে ফিরিতে হইয়াছিল।

মালিনীরও কি সেই একই ট্র্যাজেডি নয়? প্রথম অংশের মালিনী মানব-প্রকৃতির দাবী এড়াইয়া নবধর্মের দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াছিল, নাটকের শেষ অংশে প্রকৃতি তাহার বলি সংগ্রহ করিয়াছে। সেই অপরাধে দেবী মালিনী কলঙ্কের গ্লানি মাথায় তুলিয়া মানবত্বের মধ্যে, এবং তাহা আদৌ গৌরবময় মানবত্ব নহে, আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইহাই মানবপ্রকৃতির প্রতিশোধ। ইহাই স্বাভাবিক, ইহা না হইলেই মানবধর্ম ও কাব্যধর্ম দুই-ই ক্ষুণ্ণ হইত। কবি মালিনীর এই পরিবর্তনটি লক্ষ্য করিয়াছেন কি না জানি না, যদি

১ মালিনীর ভূমিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড।

না করিয়া থাকেন তবু বিস্ময়ের কিছু নাই—কবিপ্রকৃতি অগোচরে কবির কলমকে কবিধর্মের চিহ্নিতপথে চালনা করিয়া সার্থকতায় লইয়া গিয়াছে।

২

মালিনী চারিটি দৃশ্যে বিভক্ত একাঙ্ক নাটক। কিন্তু ইহাকে দুই অঙ্কে ভাগ করিলেই নাটকীয় টেকনিকের মর্যাদা রক্ষা করা হইত।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় দৃশ্য—প্রথম অঙ্ক, এবং চতুর্থ দৃশ্যটিকে দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তর্গত করা উচিত ছিল।

তৃতীয় দৃশ্য ও চতুর্থ দৃশ্যের মধ্যে অনেকটা সময়ের ব্যবধান আছে; তাহা ছাড়া চতুর্থ দৃশ্যে প্রধান দুইটি ব্যক্তির, মালিনীর ও সুপ্রিয়ের চরিত্রের অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে; অন্তত ইহা স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্যও অঙ্কপাতের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নাটকের এই জাতীয় আবশ্যিক অঙ্গ-বিন্যাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের চিরকালই মনোযোগের অভাব। ইহার দৃষ্টান্ত আরো মিলিবে। ইহাতে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, জটিল নাট্যশিল্প তাঁহার বাধা-অসহিষ্ণু লিরিকপ্রতিভার অনুকূল নহে।

সৌভাগ্যবশত মালিনীর টেকনিক সম্বন্ধে কবি স্বয়ং কিছু আলোচনা করিয়াছেন।

"বোধ করি এই নাটিকায় আমার রচনার একটা কিছু বিশেষত্ব ছিল, সেটা অনুভব করেছিলুম যখন দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে বাসকালে এর ইংরেজি অনুবাদ কোনো ইংরেজ বন্ধুর চোখে পড়ল। প্রথম দেখা গেল এটা আর্টিস্ট রোটেনস্টাইনের মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। কখনো কখনো, এটাকে তাঁর ঘরে অভিনয় করবার ইচ্ছেও তাঁর হয়েছিল। আমার মনে হল এই নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি তাঁর শিল্পীমনে মূর্তিরূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারপরে একদিন ট্রেভেলিয়ানের মুখে এর সম্বন্ধে মন্তব্য শুনলুম। তিনি কবি এবং গ্রীকসাহিত্যের রসজ্ঞ। তিনি আমাকে বললেন—এই নাটকে তিনি গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ দেখেছেন। তার অর্থ কী আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি, কারণ যদিও কিছু কিছু তর্জমা পড়েছি তবু গ্রীকনাট্য আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক বরাবর আমাদের কাছে নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে। মালিনীর নাট্যরূপ সংযত, সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।"[১]

১ মালিনী, সূচনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড।

গ্রীক নাট্যশিল্প সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা বর্তমান লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যকলার সঙ্গে তাহার প্রভেদটা উগ্র। শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাটকে যে চঞ্চলতা লক্ষিত হয় গ্রীকনাট্যে তাহার একান্ত অভাব। গ্রীক নাটকের অভিনেতাদের সঙ্গে সজীব মানুষের চেয়ে ভাস্কর্যের যেন মিল অধিক। অভিনেতারা যেন খোদাই-করা বিরাট মূর্তি। এমনটি কেন হইল বলা সহজ নয়; গ্রীক ট্র্যাজেডি ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল, স্বভাবতই বাচালতা ও চঞ্চলতার স্থান তাহাতে সঙ্কীর্ণ ছিল। ট্র্যাজেডির হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি উগ্র ঘটনা নেপথ্যে ঘটিত, কাজেই রঙ্গমঞ্চে কায়িক ঔদ্ধত্যের অবসর ছিল না; বিশেষ, যে ভারী পাদুকা ও মুখোশ পরিয়া অভিনেতারা অবতীর্ণ হইত তাহা লইয়া শেক্‌স্‌পীয়রীয় অভিনেতার মতো ছুটাছুটি করিবার ক্ষমতাও হয়তো সব সময়ে থাকিত না। ফলত এই মূর্তিবৎ স্থাণুতা যদি গ্রীক নাট্যকলার একটি গুণ হয় তবে তাহা মালিনীতে আছে।

দ্বিতীয়ত, গ্রীক নাটকে অভিনয়ের চেয়ে আবৃত্তির ভাবটাই যেন কিছু অধিক। পাত্রপাত্রীর মধ্যে কথোপকথন গৌণ; কোরাসের ও পাত্রপাত্রীর দীর্ঘ ভূমিকা নিছক আবৃত্তি। মালিনীর সুদীর্ঘ ভূমিকাগুলি এইরূপ আবৃত্তিরস-প্রধান।

তৃতীয়ত, স্থান, কাল, ঘটনার অদ্বিতীয়ত্ব গ্রীক নাটকের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য না হইলেও একটি প্রধান লক্ষণ বটে। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন বা রাজা ও রাণীতে যেমন তিনি এ বিষয়ে নিরঙ্কুশ মালিনীতে তেমন নহেন। তাঁহার ভাষায় "মালিনীর নাট্যরূপ সংযত, সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।"

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উপরি-উক্ত এই তিনটি গুণ কেবল মালিনীতে নয়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যগুলিতে, যেখানে নাট্যকারের চেয়ে কবির কলম প্রবলতর, সুপ্রচুর। "বহুশাখান্বিত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাত-প্রতিঘাতে"র মধ্য দিয়া নাটককে নিশ্চিত পরিণামের দিকে লইয়া যাইতে ঠিক যে ক্ষমতার দরকার—তাঁহার প্রতিভায় তাহার যেন কিঞ্চিৎ অভাব আছে। বরঞ্চ সংযত, সংহত একটিমাত্র ঘটনাকে স্থাণুপ্রায় দু'চারটি চরিত্রের আবৃত্তির অনুরূপ কথোপকথনের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিতে যে, ক্ষমতার প্রয়োজন—তাহা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশেষ অনুকূল।

এইরূপ দু'চারটি টেকনিক্যাল সাদৃশ্য ছাড়া গভীরতর কোনো সাদৃশ্য মালিনী ও গ্রীক নাট্যের মধ্যে আছে বলিয়া মনে হয় না।

নৃত্যনাট্য

যেসব নাটককে আমরা নৃত্যনাট্য বলিতেছি সেগুলি কবির শেষজীবনে লিখিত। আবার ঋতুনাট্যগুলিও শেষজীবনের রচনা। স্থূল বিচারে দুই শ্রেণীর নাটককে একজাতীয় মনে হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ধরা পড়ে। এই দুই শ্রেণীর নাটকই সঙ্গীত ও নৃত্য-প্রধান হইলেও, নৃত্যনাট্যে নৃত্যই ভাবের একমাত্র বাহন, অর্থাৎ যে কথাটি কবি যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন নৃত্যের সাহায্য ছাড়া তাহা কখনোই সেভাবে প্রকাশিত হইতে পারিত না।

দ্বিতীয়ত, ঋতুনাট্যের নৃত্যকে সম্বহুলের আনন্দ বলা যাইতে পারে। এই নৃত্য বহুলের আনন্দকে প্রকাশ করিতেছে। রাজপুরীতে উৎসব, সেই সাধারণ উৎসবের আনন্দকে পুরবাসীরা নাচের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেছে। রাজসভায় উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, সেই উৎসবের সমষ্টির উল্লাসকে নর্তকীর দল রূপ দিতেছে।

কিন্তু নৃত্যনাট্যগুলির নৃত্যের সঙ্গে বহুলের মনোভাবের কোনো যোগ নাই; তাহা এককের সুখদুঃখকে, এককের আশা-আনন্দকে প্রকাশ করিয়া চলিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে সঙ্গীত যেমন তাঁহার প্রতিভার প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহার নাট্যপ্রবাহের আলোচনা করিলেও তেমনি দেখা যাইবে যে, শেষজীবনের নাটকের মধ্যেও গানের অবিসংবাদিত প্রাধান্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য দ্বারা কবি তাঁহার নাট্যজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন—ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গানের দ্বারাই সে জীবনের শেষ হইয়াছে। কিন্তু প্রথম গীতিনাট্যে ও শেষজীবনের এই শ্রেণীর নাটকে কত প্রভেদ!

ঋতুনাট্যে ও নৃত্যনাট্যে চারিটি বস্তুর সম্মেলন ঘটিয়াছে—কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্র। ইহাকে কবির নাটকীয় টেক্‌নিকের চতুরঙ্গ রীতি বলা যাইতে পারে। এই চারিটির মধ্যে কাব্যের স্বাদ যে-কোনো পাঠক গ্রন্থ পড়িলেই পাইতে পারেন। সুরের স্বাদ পাওয়াও দুরূহ নয়; স্বরলিপি আছে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছেন; কিন্তু অপর দুটির স্বাদ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। যাঁহাদের এই সব অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা সেই নৃত্যের ছন্দঃ-সৌন্দর্য জানেন; রঙ্গমঞ্চ-সজ্জায়, আলোক ও বেশভূষায়, অভিনেত্রীদের

অঙ্গাভরণে যে বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিত তাহা দর্শকের স্মৃতিতে থাকিলেও লুপ্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে পরিণত হইয়াছে। সে সব হয়তো আর পুনরুদ্ধার করা যাইবে না, কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই হয়তো তাহারা প্রস্থান করিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে তাঁহার শেষজীবনের এই শ্রেণীর নাটকের প্রকৃত মহিমা নির্ভর করিতেছে কাব্য, সুর, নৃত্য ও চিত্রের চতুরঙ্গ রীতির সম্মিলিত সমাবেশের উপরে। কেবল গ্রন্থের দ্বারা বিচার করিলে ইহার কাব্যাংশই প্রকট হইবে অথচ প্রচ্ছন্ন অন্য তিনটি অঙ্গ অন্তত কল্পনাতেও না দেখিতে পারিলে ইহাদের প্রাত অবিচার করিবার আশঙ্কাই সমধিক।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের কালানুক্রমিক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে উত্তরোত্তর তাঁহার নাটকে গানের সংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিংবা একখানা নাটককে যখন পরবর্তী কালে রূপান্তরিত করিয়াছেন তাহাতে গানের সংখ্যা বাড়িয়াছে; সংস্করণভেদেও এই একই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার নাটক নিরবচ্ছিন্ন গানের মালায় পরিণত হইয়াছে, কেবল মাঝে মাঝে এক গানের সঙ্গে অন্য গানের জোড়া দিবার জায়গায় একটু করিয়া গদ্য বা পাত্রপাত্রীর উক্তি। গ্রীক নাটক মূলে যেমন গীতি-সর্বস্ব ছিল, কালক্রমে তাহাতে সঙ্গীতের প্রাধান্য কমিয়া নাটকীয় অংশ বাড়িয়াছে, রবীন্দ্রনাথের নাটকে তাহার বিপরীত প্রক্রিয়া দেখা যায়। গদ্য বা পদ্য নাটকীয় উক্তি ক্রমে সঙ্কীর্ণতর হইতে হইতে শেষবয়সে একেবারে সঙ্গীতকে আসর ছাড়িয়া দিয়া নেপথ্যে প্রস্থান করিয়াছে।

এমন যে হইয়াছে তাহার অবশ্য কারণ আছে। জীবন-পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি ভাব রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করিতে হইতেছিল সঙ্গীত ছাড়া যাহা প্রকাশযোগ্য নয়। সেইজন্য শেষজীবনে সঙ্গীত তাঁহার ভাবের প্রধান বাহন। নাটকের মধ্য দিয়াও কবি ক্রমে কতকগুলি সূক্ষ্মশরীরী, ছায়ারূপী বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করিতেছিলেন। ভাব যতই সূক্ষ্ম হইতে লাগিল তাহার সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য ততই সুরের সারথ্য অধিকতর আবশ্যক হইতে লাগিল। ভাব সূক্ষ্মতর হইয়া পড়িল, সুরও যেন আর তাহাকে সম্যক্ প্রকাশ করিতে অসমর্থ। তখন সুরের সঙ্গে নৃত্যের যোগের প্রয়োজন হইল। যে-ভাবের সংজ্ঞা নাই, যে-আকুলতার ভাষা নাই, ছন্দ যাহার আভাস মাত্র দিতে পারে, সুর যাহার ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু জানে না, শিক্ষিত অঙ্গের ছন্দোময় ব্যঞ্জনা সেই অনঙ্গ আকৃতিকে আভাসিত

করিয়া তুলিতে প্রাণপণ করে—ইহাই নৃত্য। ভাবের পরিবর্তন ও পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নূতন নূতন বাহনের সন্ধান করিতে হইয়াছে। এইরূপ সন্ধানের ফলে তিনি ক্রমে কথা হইতে সুরে, সুর হইতে নৃত্যে, এবং শেষে নৃত্য হইতে চিত্রের চতুরঙ্গ রীতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে শাপমোচন, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ও শ্যামা যথার্থ নৃত্যনাট্য। নটীর পূজা নৃত্যনাট্য পর্যায়ের নয় কিন্তু নটীর পূজাতেই যেন নৃত্যনাট্যের সূচনা। এই নাটকখানিতে নৃত্য যে কেবল প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নয়—নটীর চরম নৃত্যই ইহার প্রাণবস্তু। ওই নৃত্যটি ছাড়া নাটকের বক্তব্য কিছুতেই প্রকাশ করা যাইত না; নৃত্যটিকে বাদ দিলে নাটক অন্য রূপ ধারণ করিবে। নৃত্যই এই পর্যায়ের নাটকের বাহন আগে বলিয়াছি—এবারে তাহার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যাইবে। নাটকের সমস্ত গতি গোড়া হইতে এই চরম পরিণামের দিকে ধাবিত এবং শেষ মুহূর্তে কেবল শ্রীমতী নয় সমগ্র নাটকখানি আত্মোৎসর্গের নৃত্যের মধ্য দিয়া শান্তি ও সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নাটক হিসাবে নটীর পূজার আলোচনার ক্ষেত্র ইহা না হইলেও এখানে এই তথ্যটি উল্লেখ করা আবশ্যক।

জীবনপরিণামের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিল্প গীত ও নৃত্যরসের দিকে অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে মোড় ঘুরিতেছিল একথা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু কেবলমাত্র এই ভিতরের তাগিদেই নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে এমন মনে করিবার কারণ নাই। ভিতরের তাগিদ যতই প্রবল হোক ভারতীয় সাহিত্যে নৃত্যনাট্যের কোনো সজীব আদর্শ নাই; যে-নৃত্য আছে তাহা রবীন্দ্রনাথের রুচিকর নয়, আর কতক তো তাঁহার নিজেরই সৃষ্টি। কিন্তু ইহা তো কেবল নৃত্য মাত্র নয়, ইহা নৃত্যনাট্য; অর্থাৎ একটা জটিল কাহিনীর আদ্যন্ত দেহের ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রকাশ। চোখের সম্মুখে এই সজীব আদর্শের অভাবই তাঁহার প্রতিভাকে যেন নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এমন সময়ে ১৯২৭-এ তিনি জাভা ও বালি দ্বীপ ভ্রমণে যান। সেখানে নৃত্যনাট্য এখনো সজীব। সেই সজীব আদর্শই তাঁহার প্রতিভার শেষ বাধাকে দূর করিয়া দিল। নৃত্যনাট্যের একটা আদর্শ লইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন, এবং স্বকীয় প্রতিভার দ্বারা পরির্তন পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করিয়া নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি করিলেন। এই পর্যায়ের চারিখানি নাটকই ১৯২৭-এর অনেক পরে লিখিত।

নটীর পূজা অবশ্য ১৯২৬-এ লিখিত, কিন্তু তাহাতে এইমাত্র প্রমাণ হয় যে, নৃত্যনাট্য রচনার আকৃতি তাঁহার মনে কাজ করিতেছিল, কিন্তু আদর্শের অভাবেই আকৃতি রূপ লাভ করিতে পারিতেছিল না।

এখানে যে-সব পত্র উদ্ধৃত করিতেছি তাহার সমস্তই 'জাভা-যাত্রীর পত্র' হইতে। এই গ্রন্থের অধিকাংশ পত্রেই ওদেশের নৃত্যনাট্যের উল্লেখ আছে। তাহাতে বুঝিতে পারা যায় জাভার এই প্রাণ-বস্তুটিই কবিকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার অগোচরে মনের মধ্যে যেন একটা সজীব নৃত্যনাট্যের আদর্শ গড়িয়া তুলিতেছিল।

"এদেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার নারকেল বন যেমন সমুদ্র-হাওয়ায় দুলছে তেমনি সমস্ত দেশের মেয়ে-পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত। এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তন গানে যে আপন আবেগ-সঞ্চারের পথ পেয়েছে, এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায়, তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায় ফেরায়, যুদ্ধে বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে, এমন কি ভাঁড়ামিতে সমস্তটাই নাচ। সেই নাচের ভাষা যারা ঠিকমতো জানে তারা বোধ হয় গল্পের ধারাটা ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারে। সেদিন এখানকার এক রাজবাড়িতে আমরা নাচ দেখছিলুম। খানিক বাদে শোনা গেল এই নাচ-অভিনয়ের বিষয়টা হচ্ছে শাল্ব-সত্যবতীর আখ্যান। এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে।"[১]

জাভার নৃত্যাভিনয় হইতে কবি যে তাঁহার নৃত্যনাট্যের আদর্শ পাইয়া থাকিবেন—ইহার পরে আর সন্দেহ করা উচিত নয়। কিন্তু জাভার নৃত্যনাট্যকে গ্রহণ করিবার সময়ে তিনি তাহাতে একটি বড় রকমের পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। জাভার বাণীহীন নৃত্যের সঙ্গে তিনি বাণীর যোগ করিয়া দিয়াছেন; জাভায় যাহা ছিল কেবলমাত্র নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথের হাতে তাহা সঙ্গীতসনাথ নৃত্যনাটিকায় পরিণত হইয়াছে।

কবি বলিয়াছেন, "এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে।" জাভায় "নারকেল বন যেমন সমুদ্রহাওয়ায় দুলছে, তেমনি

১ যাত্রী; জাভাযাত্রীর পত্র।

সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত।" আর "বাংলা দেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তন গানে সে আপন আবেগসঞ্চারের পথ পেয়েছে, এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি।" জাভার নৃত্যাদর্শের সঙ্গে বাংলার আত্মপ্রকাশের পন্থা সঙ্গীতের যোগসাধনেই তাঁহার কৃতিত্ব—এবং সেই জন্যই হয়তো তাঁহার নৃত্যনাট্য জাভার নৃত্যাভিনয়ের চেয়ে পূর্ণতর।

দ্বিতীয়ত, কবি বলিতেছেন, "এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে।"

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে দুই ধারাই লক্ষিত হয়। 'শাপমোচনে' ঘটনা নাই বলিলেই হয়, কেবল বিশুদ্ধ ভাবের আবেগের প্রকাশ—নৃত্যে এবং সঙ্গীতে। কিন্তু চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামাতে ঘটনার ধারা স্তিমিত হইলেও তাহা বর্তমান—এবং ঘটনা ও ভাবনা যুগপৎ প্রকাশিত হইয়াছে—নৃত্যে ও সঙ্গীতে।

"আজ সকালে দশটার সময়ে আমাদের এখানেই গৃহকর্তা আর একটি নাচের ব্যবস্থা করেছিলেন, মেয়ে দু'জন পুরুষের ভূমিকা নিয়েছিল। অর্জুন আর সুবলের যুদ্ধ।...খানিকটা কথাবার্তার পরে দু'জনের লড়াই।... নটীরা যে মেয়ে সেটা বুঝ্‌তে কিছুই বাধে না, অতিরিক্ত যত্নে সেটা লুকোবার চেষ্টাও করে নি। তার কারণ যারা নাচছে তারা মেয়ে কি পুরুষ সেটা গৌণ, নাচটা কি সেইটেই দেখবার বিষয়। দেহটা মেয়ের কিন্তু লড়াইটা পুরুষের, এর মধ্যে একটা বিরুদ্ধতা আছে বলেই এই অদ্ভুত সমাবেশে বিষয়টা আরো যেন তীব্র হয়ে ওঠে। কমনীয়তার আধারে বীররসের উচ্ছলতা।"[১]

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যেও কবি মেয়েকেই পুরুষের ভূমিকা দিতেন। বাঙালী বালিকার অর্জুনের ও বজ্রসেনের ভূমিকা গ্রহণে ওই একই রসের উদ্ভব হইত—"কমনীয়তার আধারে বীররসের উচ্ছলতা।"

"কাল রাত্রে আমাদের এখানেও একটা নাচ হয়ে গেল। পূর্ব রাত্রে যে-দুজন বালিকা নেচেছিল, তাদের মধ্যে একজন আজ পুরুষ-সঙের মুখোষ প'রে সঙের নাচ নাচলে। আশ্চর্য ব্যাপারটা হচ্ছে এর মধ্যে নাচের শ্রী সম্পূর্ণ রক্ষা করেও ভাবে ভঙ্গীতে গলার আওয়াজে পূরো মাত্রায় বিদূষকতা করে গেল। পুরুষের মুখোষের সঙ্গে তার অভিনয়ের কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য

১ যাত্রী ; জাভাযাত্রীর পত্র।

হোলো না। বেশভূষার সৌন্দর্যেও একটুমাত্র ব্যত্যয় হয়নি। নাচের শোভনতাকে বিকৃত না করেও যে তার মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের রস এমন করে আনা যেতে পারে এ আমার কাছে আশ্চর্য ঠেক্‌লো। এরা প্রধানত নাচের ভিতর দিয়েই সমস্ত হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করতে চায়, সুতরাং বিদ্রূপের মধ্যেও এরা ছন্দ রাখতে বাধ্য। এরা বিদ্রূপকে বিরূপ করতে পারে না—এদের রাক্ষসেরাও নাচে।"[১]

এই বিদ্রূপনৃত্যের কিছু আভাস যেন 'তাসের দেশ' নাটকে আছে। সে দেশের তাসের জনতার চলাফেরা, কথাবার্তা ও সঙ্গীতে এই বিদ্রূপ-নৃত্যের ভঙ্গী।

"সেই সন্ধ্যাবেলাতেই রাজবাড়িতে আর একটি ব্যাপার দেখলুম, মুখোষপরা নটেদের অভিনয়। আমরা জাপান থেকে যে-সব মুখোষ এনেছিলুম, তার থেকে বেশ বোঝা যায়—মুখোষতৈরি একপ্রকারের বিশেষ কলাবিদ্যা। এতে যথেষ্ট গুণপনা চাই। আমাদের সকলেরই মুখে যেমন ব্যক্তিগত তেমনি শ্রেণীগত বিশেষত্ব আছে। বিশেষ ছাঁদ ও ভাব-প্রকাশ অনুসারে আমাদের মুখের ছাঁদ এক এক রকম শ্রেণীনির্দেশ করে। মুখোষ-তৈরি যে গুণী করে সে সেই শ্রেণী-প্রকৃতিকে মুখোষে বেঁধে দেয়। সেই বিশেষ শ্রেণীর মুখের ভাববৈচিত্র্যকে একটি বিশেষ ছাঁদে সে সংহত করে। নট সেই মুখোষ পরে এলে আমরা তখনি দেখতে পাই একটা বিশেষ মানুষকে কেবল নয়, বিশেষ ভাবের এক শ্রেণীর মানুষকে। সাধারণত অভিনেতা ভাব-অনুসারে অঙ্গভঙ্গী করে। কিন্তু মুখোষে মুখের ভঙ্গী স্থির করে বেঁধে দিয়েছে। এইজন্যে অভিনেতার কাজ হচ্ছে মুখোষেরই সামঞ্জস্য রেখে অঙ্গভঙ্গী করা। মূল ধুয়োটা তার বাঁধা, এমন করে তাল দিতে হবে যাতে প্রত্যেক সুরে সেই ধুয়োটার ব্যাখ্যা হয়, কিছু অসঙ্গত না হয়। এই অভিনয়ই দেখলুম।"[২]

মুখোশ-নৃত্য রবীন্দ্রনাথের মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই জাতীয় নাটক রচনায় তিনি মনোযোগ দেন নাই। মুখোশ-নৃত্য রচনা করিয়া গেলে বাংলা সাহিত্য আর একটা দিকে যে কেবল সমৃদ্ধতর হইত তাহা নয়, রবীন্দ্রনাট্যপ্রতিভারও একটা নূতনতর পরিচয় পাওয়া যাইত। আমার তো মনে হয় মুখোশ-নাট্য তাঁহার প্রতিভার

১ যাত্রী ; জাভাযাত্রীর পত্র।
২ যাত্রী ; জাভাযাত্রীর পত্র।

বিশেষ অনুকূল ছিল, কারণ রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির চেয়ে শ্রেণীর বিকাশেই অধিকতর দক্ষ ছিলেন। নাটকে ব্যক্তির মনে যে দ্রুত লয়ে ঘন ঘন ভাববিবর্তন ও পট-পরিবর্তন ঘটে, শ্রেণীর মনে সে রকমটি ঠিক ঘটে না; শ্রেণী-মনের ভাব ও পট-পরিবর্তন ঢিমে তালে ঘটিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের নাটকের একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, ঘটনার তাল ও ব্যক্তির ভাবনার তাল একসঙ্গে চলিতে পারে না; অর্থাৎ নাটকে যে রকম আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত মুহুর্মুহু ভাববিপর্যয় দর্শক আশা করে, তাহাতে ঠিক তেমনটি নাই। অভিনেতার মুখে অবিরাম ভাব-বলাকার সঞ্চরণ না ঘটাতে মুখটা অনেক পরিমাণে অবিচলিত মুখোশের সগোত্র হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাট্যে অভিনেতা যে পরিমাণে ব্যক্তি তাহার চেয়ে বেশি করিয়া যেন সে একটা বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি। অভিনেতার মুখের উপরে একটা মুখোশ তুলিয়া দিলে মুখের এই মৌলিক ত্রুটি ঢাকা পড়িয়া গিয়া যেন একটা গুণে পরিণত হইতে পারিত।

বিশেষ করিয়া তাঁহার 'তাসের দেশ' একান্তভাবে মুখোশ-নৃত্যের উপযোগী। এই নাটকে তাসের জনতায় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের চেয়ে শ্রেণী-ব্যক্তিত্ব অধিকতর। রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্র ব্যক্তি, কিন্তু তাস ও তাসানীগণ শ্রেণীস্বরূপ। এক্ষেত্রে তাহাদের মুখে মুখোশের ব্যবস্থা হইলে অভিনয়ের অঙ্গহানি না হইয়া, শ্রেণীরূপটি স্পষ্ট হইয়া উঠাতে রস-বর্ধন হইত বলিয়াই মনে হয়।

এই যে নৃত্যনাট্যের কথা বলিলাম—ইহার মূলের তত্ত্বটি কি? আগেই বলিয়াছি যে, জীবনদর্শনের পরিণতির সঙ্গে তাল রাখিয়া তাঁহার আর্টে একটা পরিবর্তন ঘটিতেছিল—এবং এই পরিবর্তনের তাগিদেই তিনি প্রথম বয়সের গীতিনাট্য হইতে গতানুগতিক কমেডি, ট্র্যাজেডি ও তত্ত্বনাট্যের ভিতর দিয়া শেষবয়সের ঋতুনাট্যে ও নৃত্যনাট্যে আসিয়া পৌছিয়াছেন। প্রথম বয়সের গীতিনাট্যে নিছক ঘটনার ও আবেগের মাত্র প্রকাশ; তাহার মূলে কোনো সচেতন তত্ত্বরূপ নাই। শেষবয়সের ঋতুনাট্যের মূলে একটি সচেতন তত্ত্ব নিহিত আছে। কবির দীর্ঘ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ধীর অথচ অনিবার্য গতিতে এই তত্ত্বের দিকে তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। অতি সংক্ষেপে এই তত্ত্বকে বলা যাইতে পারে নটরাজ শিবের আইডিয়া। যে শিল্পী নটরাজমূর্তি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি দেখিয়াছিলেন বিশ্বের কারণস্বরূপ মূল আবর্তচ্ছন্দে লীলায়িত হইয়া জীবনে ও জগতে এক রহস্যময়

বিচিত্র দিব্যশক্তির লীলা চলিতেছে; তাহারই নৃত্যচ্ছন্দের পদপাতে ভাঙিতেছে, গড়িতেছে; বীভৎসতা ও সৌন্দর্য, ভীষণতা ও মাধুর্য, নিঃস্বতা ও পরিপূর্ণতা তাহার নৃত্যচঞ্চল দুই চরণের যেন দুই বিরুদ্ধ গুণ। যে-হতভাগ্য খণ্ডিত দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখিতেছে তাহার চোখে ইহা রিক্ত, ভীষণ, বীভৎস, ভাঙন-মুখী ও অসম্পূর্ণ; সে কেবল তাণ্ডবের চন্দ্র-সূর্য-তারা-খসিয়া-পড়া ভগ্ন বিশ্ব-অট্টালিকাটাই দেখিতে পাইল; কিন্তু যে-সৌভাগ্যবানের দৃষ্টি পরিপূর্ণ, সে নটরাজের দুই চরণের লীলাই প্রত্যক্ষ করিতেছে বলিয়া জীবন ও জগৎ তাহার কাছে সুন্দর, মধুর এবং চির-পরিপূর্ণ; সে দেখিতে পায় চন্দ্র-সূর্য-তারা খসাইয়া লইয়া নূতনতর বিশ্বহর্ম্য গড়িয়া উঠিতেছে; সে দেখিতে পায় সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যুর উপাদান ছানিয়া মহত্তর জীবন-গঠনের লীলা হইতেছে, তাহার চোখে জীবন ও জগৎ পরিপূর্ণ এবং সুন্দর। খণ্ড-দৃষ্টি ব্যক্তি নটরাজের রঙ্গমঞ্চের বাহিরের পর্দাখানা মাত্র দেখিয়া বলে—ইহাই বাস্তব, আর বাস্তব বীভৎস এবং নিষ্ঠুর। পরিপূর্ণদৃষ্টিবান্ রঙ্গমঞ্চের পর্দাখানা উঠাইয়া নটরাজের নৃত্যলীলা দেখিয়া বলে—সব সুদ্ধ মিলিয়া কি সুন্দর, আর পরিপূর্ণ!

এখন জীবনের সাধনায় এই পরিপূর্ণতার দৃষ্টির অধিকারী কবি হইয়াছেন বলিয়াই তিনি আর পর্দাখানা মাত্র দেখিয়া হতাশ হন নাই; একেবারে নৃত্যের আসরে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং নটরাজের নৃত্য দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন ভাঙন নূতন গড়নের ভূমিকা মাত্র; মৃত্যু জীবনেরই অঙ্গ; বিরহ নিবিড়তর মিলনেরই সূচনা—আর সবসুদ্ধ মিলিয়া জগৎ ও জীবন স্বকীয় মহিমায় পরিপূর্ণ, স্বয়ংবিধৃত।

জগৎ ও জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রের নিকষে কবি এই তত্ত্বটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইহাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ পাইয়াছেন। প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায়, বিশ্বের অণুপরমাণুর বিবর্তনে (নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা); মানুষের জীবনের বিরহমিলনের লীলায় (শাপমোচন); রূপ ও রূপাতীত সত্তার দ্বন্দ্বে (নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা); প্রেম ও দেহের বিপরীত দাবির সংগ্রামে (নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ও শ্যামা); অর্থাৎ এই তত্ত্ব আর রবীন্দ্র-নাথের কাছে তত্ত্ব মাত্র থাকে নাই, জগৎ ও জীবনের সঙ্গে একার্থক হইয়া উঠিয়া ইহা নূতন মহিমা লাভ করিয়াছে; ইহা তাঁহার কাছে বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তব বলিতে রবীন্দ্রনাথ এই পূর্ণতাকেই বোঝেন।

এক্ষণে তাঁহার রচনা হইতেই এই তত্ত্বরূপটি প্রকাশের চেষ্টা করা যাক্।

"নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, আর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইয়া থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস-উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালাগানের ইহাই মর্ম।"

আমরা যাহাকে জগৎ বলিয়াছি, কবির ভাষায় তাহা 'বহিরাকাশে রূপলোক', আর আমরা যাহাকে জীবন বলিয়াছি কবির ভাষায় তাহা 'অন্তরাকাশে রসলোক।' যে-সৌভাগ্যবান্ নটরাজের লীলায় যোগ দিয়া তাঁহার নটসঙ্গী হইতে পারিয়াছে, তাহার মন 'বন্ধন-মুক্ত' হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে ইহারাই সন্ন্যাসী, ইহাই সন্ন্যাস। সংসারত্যাগী গতানুগতিক সন্ন্যাসীরা কেবল নটরাজের ভাঙন-মুখী চরণখানাই দেখিতে পাইয়াছে, তাই কবির কাছে তাহাদের কোনো গুরুত্ব নাই।

নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা নৃত্যনাট্যের অন্তর্গত না হইলেও এক্ষেত্রে তাহার আলোচনা অসঙ্গত নয়, কারণ কবির নৃত্যতত্ত্বটি অত্যন্ত সচেতনভাবে ইহাতে প্রকট।

জগৎ ও জীবন মিলিয়া যে বিশ্বব্যাপার তাহার মধ্যে কবি নটরাজের লীলাকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

"নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্তিসুরের ছন্দ হে।"

নটরাজের নৃত্যের তালেই কবির রসলোক হইতে সুপ্ত নির্ঝরিণী স্বপ্ন ভাঙিয়া জগতের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়ে।

"নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁদে নৃত্যের ছায়া।"

... ...

"নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল
বিদ্রোহী পরমাণু,

১ নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা।

পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্র-ভানু।”

নটরাজের এক পদক্ষেপ কবির রসলোকে আর এক পদক্ষেপ বহির্লোকে; বহির্লোকের পদপাতে অণুপরমাণু যে কেবল উন্মথিত হইতেছে, তাহা নয়, বিদ্রোহী বস্তুপুঞ্জের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহাকে সুন্দর করিয়া তুলিতেছে।

“তব নৃত্যের প্রাণবেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে।
জীবন-মরণ নাচের ডমরু
বাজাও জলদমন্দ্র হে।”

সুখদুঃখ সেই নৃত্যচ্ছন্দের তরঙ্গের ওঠাপড়া এবং জীবন-মৃত্যুর আক্ষেপ ও উল্লাসে সেই নৃত্যের ডমরুধ্বনি। এ-হেন নটরাজের কবিশিষ্য তিনি।

“নটরাজ, আমি তব
কবিশিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লব।”
... ...
“প্রভু, এই আমার বন্দনা
নৃত্যগানে অর্পিব চরণ-তলে, তুমি মোর গুরু;”
... ...
“অবসাদে যেন অন্যমনে
তালভঙ্গ নাহি করি,”

নটরাজের কবিশিষ্যের ইহাই সন্ন্যাস, কারণ গুরুর সঙ্গে বিশ্বনৃত্যে যোগ দেওয়াতে তাঁহার মন বন্ধন-মুক্ত। এই বিশ্বনৃত্যে তালভঙ্গ হইলেই নটরাজের অভিসম্পাত বর্ষিত হয়, তখন আবার দীর্ঘ সাধনার দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় (শাপমোচন)।

“এই পর্যন্ত কাল লিখেছি এমন সময় ডাক পড়ল। মেয়েরা ঋতুরঙ্গ অভিনয় করবে আজ সন্ধ্যেবেলায়। তাদের অভ্যাস করাতে হবে। ওরা অঙ্গভঙ্গিমার লতানে রেখা দিয়ে গানের সুরের উপর নকশা কাট্‌তে থাকে। মনে মনে ভাবি এর অর্থটা কী। আমাদের প্রতিদিনটা দাগ ধরা, ছেঁড়াখোঁড়া,

কাটাকুটিতে ভরা। তার মধ্যে এর সঙ্গতি কোথায়। যারা লোকহিত-ব্রতপরায়ণ সন্ন্যাসী তারা বলে বাস্তব-সংসারে দুঃখদৈন্য শ্রীহীনতার অন্ত নেই, তার মধ্যে এই বিলাসের অবতারণা কেন। তারা জানে 'দরিদ্রনারায়ণ তো নাচ শেখেননি, তিনি নানা দায় নিয়ে কেবলি ছট্‌ফট্‌ করে বেড়ান, তাতে ছন্দ নেই।' এরা এই কথাটা ভুলে যায় যে, দরিদ্র শিবের আনন্দ নাচে। প্রতিদিনের দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হতো তাহলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগতো না, এটাকে পাগলামি বল্‌তুম।

"দরিদ্রনারায়ণকে বৈকুণ্ঠের সিংহাসনেই বসাতে হবে, তাঁকে লক্ষ্মীছাড়া করে রাখবো না। আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্রবেশ আর অন্নপূর্ণায় তাঁর ঐশ্বর্য, বিশ্বে এই দুয়ের মিলনেই সত্য। সাধুরা এই মিলনকে যখন স্বীকার করতে চান না, তখন কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তখন শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দোহাই পেড়ে সেই যুগলকেই আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নান্দীতে আহ্বান করবো যাঁরা 'বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ'। যাঁদের মধ্যে অভাব ও অভাবের পূর্ণতার লীলা।"[১]

কবি যাঁহাদের লোকহিতব্রতপরায়ণ সন্ন্যাসী বলিয়াছেন তাঁহারা নটরাজের ভাঙন-ধরানো চরণখানার লীলাই দেখিতে পান, কাজেই তাঁহারা দেখেন 'বাস্তব সংসারে দুঃখদৈন্যশ্রীহীনতার অন্ত নেই।' কিন্তু কবির দৃষ্টি পূর্ণতর, তিনি নটরাজের নৃত্যের সবটা দেখিতে পান, কাজেই তাঁহার কাছে সবসুদ্ধ মিলিয়া বিশ্বব্যাপার সুন্দর—'বাস্তবের ময়লা ছেঁড়া পর্দাখানাই' একান্ত নয়। আর এই বাস্তবের অপরিচ্ছন্ন জীর্ণ পর্দাখানা অপসারিত করিয়া দিবার উপায় নৃত্য, শিল্প। নৃত্যের আনন্দের অভিঘাতে পর্দাখানা সরিয়া গেলে দেখিতে পাওয়া যায় বাস্তবের লক্ষ্মীছাড়া দরিদ্রনারায়ণই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীসনাথ নারায়ণ।

এই পত্রখণ্ডে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। কবি 'দরিদ্রনারায়ণে'র রূপক লইয়া আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া শিবের রূপে বারংবার ফিরিয়া আসিয়াছেন—নটরাজ যে শিবের অন্যতম রূপ!

উপরিউদ্ধৃত অংশগুলির সাহায্যে কবির নৃত্যতত্ত্ব হয়তো কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে; এবারে তাঁহার নৃত্যনাট্য চারিখানি লইয়া আলোচনা করা যাক্‌।

১ পথে ও পথের প্রান্তে; পত্র ৪৭।

শাপমোচন

শাপমোচনকেই যথার্থভাবে নৃত্যনাট্য বলা চলে—কারণ শাপমোচনের শাপের হেতু গন্ধর্ব সৌরসেনের সঙ্গীতকলায় তালভঙ্গ। নটরাজ জন্মমৃত্যু, ভাঙাগড়ার মধ্যে তাল রক্ষা করিয়া বিশ্বনৃত্য করিতেছেন, যে-হতভাগ্য তাঁহার তালের সঙ্গে তালরক্ষা করিয়া না চলিতে পারিতেছে জীবনে তাহাকে দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। এইরকম এক তালভঙ্গের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইতে 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের উদ্ভব।

কিন্তু আর এক হিসাবে 'শাপমোচনে'র চেয়ে পরবর্তী তিনখানি নাটক সম্পূর্ণতর ; প্রথমখানিতে কেবল ভাবাবেগের প্রকাশ ; শেষের তিনখানিতে ভাবাবেগের সঙ্গে ঘটনার বেগও আছে।

"গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সঙ্গীতসভায় কলানায়কদের অগ্রণী। সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরুশিখরে সূর্য প্রদক্ষিণে। সৌরসেনের মন ছিল উদাসী। তাই অনবধানে তার মৃদঙ্গে তাল গেল কেটে, উর্বশীর নাচে শমে পড়ল বাধা, ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে। স্খলিতচ্ছন্দ সুরসভার অভিশাপে গন্ধর্বের দেহশ্রী বিকৃত হয়ে গেল, অরুণেশ্বর নাম নিয়ে তার জন্ম হল গান্ধার রাজগৃহে।"

এইরূপে সৌরসেনের প্রায়শ্চিত্ত-জীবনের সূত্রপাত।

আবার এদিকে—

"মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে রইল, বললে, 'বিচ্ছেদ ঘটিয়ো না দেবী, একই লোকে আমাদের গতি হোক্, একই দুঃখভোগে, একই অবমাননায়।' শচী সকরুণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের পানে তাকালেন। ইন্দ্র বললেন—'তথাস্তু, যাও মর্ত্যে, সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে। সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন অপরাধের ক্ষয়।' মধুশ্রী জন্ম নিল মদ্ররাজকুলে—নাম নিল কমলিকা।"

সৌরসেন তালভঙ্গের অপরাধে বিকৃতসৌন্দর্য অরুণেশ্বর হইল। তাহার কারণ নটরাজের দুই চরণের লীলা-সামঞ্জস্য যে দেখিতে না পায় জগৎ তাহার কাছে অসুন্দর।

মদ্ররাজ-কন্যা কমলিকার সঙ্গে অরুণেশ্বরের বিবাহ স্থির হইল।

"রাজহস্তীর পৃষ্ঠে রত্নাসনে মদ্ররাজসভায় এসেছে মহারাজ অরুণেশ্বরের অঙ্ক-বিহারিণী বীণা। স্তব্ধ সঙ্গীতে সেই রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কন্যার বিবাহ।

যথাকালে রাজবধূ এলো পতিগৃহে।"

এবারে কমলিকার প্রায়শ্চিত্ত-পরীক্ষা আরম্ভ হইল—কারণ ভগ্নতাল স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী বলিয়া দুঃখের অর্ধভাগও যে তাহার।

"নির্বাণদীপ অন্ধকার ঘরেই প্রতিরাত্রে স্বামীর কাছে বধূ-সমাগম। কমলিকা বলে—প্রভু, তোমাকে দেখবার জন্যে আমার দিন আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও।"...

"রাজা বললেন—প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড় মিলনকে নষ্ট কোরো না এই মিনতি।"

মহিষীকে দুঃখিত দেখিয়া রাজা বলিলেন, কাল চৈত্রসংক্রান্তির দিনে নাগকেশরের বনে সখাদের সঙ্গে তাঁহার নৃত্যের দিন। রাণী তখন যেন তাঁহাকে দেখিয়া লন।

চৈত্রসংক্রান্তির রাত্রে আবার মিলন। রাণী বলিলেন—নাচ তো দেখিলাম কিন্তু সেই দলের মধ্যে একজন কুশ্রী কেন?

"রাজা স্তব্ধ হয়ে রইল। কিছু পরে বললে, ঐ কুশ্রীর পরম বেদনাতেই তো সুন্দরের আহ্বান; কালো মেঘের লজ্জাকে সান্ত্বনা দিতেই সূর্যরশ্মি তার ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু; মরুনীরস কালো মর্ত্যের অভিশাপের উপর স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনই তো শ্যামল সুন্দরের আবির্ভাব। প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করেনি।"

"রস-বিকৃতির পীড়া সইতে পারিনে—এই বলে মহিষী আসন থেকে উঠে পড়ল। রাজা তার হাত ধরে বললে, 'একদিন সইতে পারবে আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে। কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা'।"

রাণী সূর্যোদয়ের মুহূর্তে রাজাকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

"রাজা বললে—'তাই হোক, ভীরুতা যাক্ কেটে।' দেখা হল। টলে উঠল যুগলের সংসার। কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা—বলতে বলতে কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।"

কমলিকা রাজগৃহ হইতে দূরে আত্মনির্বাসন করিল। রাণীর দুঃখের কারণ—সুন্দর ও কুশ্রী, আনন্দ ও দুঃখ মিলাইয়াই যে জগতের পরিপূর্ণ রূপ—এ তত্ত্ব সে বোঝে নাই। অসুন্দর-ছাঁটা জগৎকে, দুঃখ-ছাঁটা জীবনকেই সে একান্ত ভাবিয়াছিল, কাজেই প্রিয়তমও তাহার চোখে কুশ্রী। বিরহের তপস্যায় এই পূর্ণতার বোধ তাহার মনে উদিত হইল—তখন চোখের দৃষ্টির উপরে আর তাহার ভরসা রহিল না, তখনই সে প্রিয়তমকে অপূর্ব সৌন্দর্যে ভূষিত দেখিল।

রাণীর নির্বাসনের বনের প্রান্তে রাত্রির পরে রাত্রি রাজার বীণাধ্বনি ও নৃত্য চলিতে থাকে। এমনি করিয়া কিছুদিন যায়।

"রাজমহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আজ আমি যাবো। আমার চোখকে আমি আর ভয় করিনে।

"বীণা থামলো। মহিষী থমকে দাঁড়ালো। রাজা বললে—ভয় কোরো না প্রিয়ে, ভয় কোরো না।···

"আমার কিছু ভয় নেই, তোমারই জয় হল।—এই বলে মহিষী আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে। ধীরে ধীরে তুললে রাজার মুখের কাছে। কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরুতে চায় না, পলক পড়ে না চোখে। বলে উঠল—প্রভু আমার, প্রিয় আমার, একী সুন্দর রূপ তোমার। কখন্ দুইজনেরই অগোচরে বিরহবেদনার তাপে ইন্দ্রের শাপ স্খলিত হয়ে পড়ে গেছে।"

রাণীকে যে দৃষ্টিতে রাজার কুশ্রী মনে হইয়াছিল তাহা অসম্পূর্ণ, এখন যে-দৃষ্টিতে রাজাকে সুন্দর মনে হইল তাহা পূর্ণ। এই পূর্ণতা লাভের জন্য তপস্যার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিরহের দুঃখই সেই তপস্যার তাপ। রাজাও বিরহের দ্বারা, দুঃখের গ্লানির দ্বারা ছন্দঃস্খলনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া স্বর্গের সৌন্দর্যকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

চিত্রাঙ্গদা ও অন্যান্য

শাপমোচন ও নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার তত্ত্ব অনুরূপ। প্রেমের মোহ ও প্রেমের মুক্তি মিলিয়াই প্রেমের পূর্ণতা। প্রেমে দুই-ই আছে, কিন্তু কোনো-টাই একান্ত নহে। যে-কোনো একটাকে একান্ত করিয়া দেখিলেই ছন্দঃপতন ঘটে—এবং দুঃখের দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুন দু'জনেই প্রেমের মোহটাকেই একান্ত বলিয়া মানিয়াছিল, কিন্তু পরে ভিতর হইতে আঘাত পাইয়া প্রেমের মুক্তিকে মানিতে বাধ্য হইয়াছে এবং তাহার ফলে প্রেমের সত্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার রঙ্গমঞ্চের পুস্তিকায় ছায়াভিনয়ের উল্লেখ আছে। এই ছায়াভিনয়ের প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে খুব সম্ভবত এই ধারণাটিও কবি জাভা হইতে পাইয়াছেন। জাভাযাত্রীর পত্রে একাধিকবার ছায়াভিনয়ের উল্লেখ আছে।

"সেখানে মহাভারতের বিরাট পর্ব থেকে ছায়াভিনয়ের পালা চলছিল। ছায়াভিনয় এ দেশ ছাড়া আর কোথাও দেখিনি, অতএব বুঝিয়ে বলা দরকার। একটা সাদা কাপড়ের পট টাঙানো, তার সামনে একটা মস্ত প্রদীপ উজ্জ্বল শিখা নিয়ে জ্বলছে, তার দুই ধারে পাতলা চামড়ায় আঁকা মহাভারতের নানা চরিত্রের ছবি সাজানো, তাদের হাত পা গুলো দড়ির টানে নড়ানো যায় এমনভাবে গাঁথা। এই ছবিগুলি এক একটা লম্বা কাঠিতে বাঁধা। একজন সুর করে গল্পটা আউড়ে যায়, আর সেই গল্প অনুসারে ছবিগুলোকে পটের উপরে নানা ভঙ্গীতে নাড়াতে দোলাতে চালাতে থাকে। ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গামেলান বাজে।"[১]

চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা সুপরিচিত গ্রন্থ; কাজেই তাহাদের কাহিনীর বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক।

কমলিকা ও চিত্রাঙ্গদা দু'জনেই একই ভুল করিয়াছিল। খণ্ডদৃষ্টিবশত প্রকৃত সৌন্দর্য কাহাকে বলে তাহারা বুঝিতে পারে নাই। কমলিকার চোখে রাজা কুশ্রী, আবার অর্জুনের প্রত্যাখ্যানে চিত্রাঙ্গদা বুঝিতে পারিল নারীর ললিত সৌন্দর্য তাহাতে নাই। বিরহের তপস্যাতেই দুইজনের পূর্ণ দৃষ্টিলাভ ঘটিল। স্বামী-বিরহিতা তাপিতা কমলিকা পূর্ণদৃষ্টি লাভ করিয়া স্বামীকে দিব্য সৌন্দর্যে ভূষিত দেখিতে পাইল। আর চিত্রাঙ্গদার বিরহ আত্মদ্বৈতে। দেবদত্ত-সৌন্দর্যময়ী নারী প্রকৃত চিত্রাঙ্গদাকে আড়ালে রাখিয়া সব সুখ যেন ভোগ করিতেছে—এই দুঃখই চিত্রাঙ্গদার চিত্তে বলদান করিল; তখনই সে অনায়াসে দেবদত্ত রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় স্বল্প-সৌন্দর্য অস্তিত্বের দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াইতে সাহস সঞ্চয় করিল।

চিত্রাঙ্গদা ও প্রকৃতি চণ্ডালিকা দুইজনেই প্রেমাস্পদকে পাইবার জন্য অলৌকিক উপায় অবলম্বন করিয়াছিল; মদনের বর ও মাতার নাগপাশ মন্ত্র। অলৌকিক উপায়েই দুইজনে সিদ্ধকাম হইল। ইহাতে প্রেমের মোহের পরিচয়।

কিন্তু আবার দু'জনেই মোহভঙ্গের সাহস অর্জন করিয়া অলৌকিকতার পাশ মুক্ত করিয়া প্রেমাস্পদকে ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রেমের পূর্ণতার প্রাচুর্যেই চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে কীর্তির পথে ছাড়িয়া দিল; প্রকৃতি আনন্দকে ছাড়িয়া দিল তাহার ধর্মসাধনার পথে। একজনের বীর্যসাধনা, অপরের ধর্মসাধনা নষ্ট করিয়া তাহাদের প্রেমাস্পদকে খর্ব না করিবার ইচ্ছা। এমন যে করিতে

৩ যাত্রী, জাভাযাত্রীর পত্র।

পারিল তাহার কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে মিলন ও বিরহ মিলাইয়াই প্রেমের পরিপূর্ণ রূপ।

নাগপাশমন্ত্রাবদ্ধ যে আনন্দকে প্রকৃতি পাইবার মুখে ছিল, সে তো তৃষ্ণার জলপ্রার্থী সাধন-সমুজ্জ্বল দিব্যমূর্তি নয়; প্রকৃতি দেখিল, মন্ত্রাহত এই পরিম্লান পুরুষ আগেকার মূর্তির ভগ্নাংশ মাত্র। হস্তগত প্রণয়াস্পদের ভগ্নাংশের চেয়ে ছাড়া-পাওয়া পূর্ণ মূর্তিকে প্রকৃতি কাম্যতর মনে করিল, তাই সে অনায়াসে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিল। চিত্রাঙ্গদাও যে অনায়াসে অর্জুনকে ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছে, তাহার ভয় ছিল পাছে তাহার মুগ্ধ সৌন্দর্যের লীলাতরঙ্গিণীতে বীরকীর্তি বিসর্জন দিয়া বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন পূর্বতন অস্তিত্বের খণ্ডাংশে পরিণত হয়।

শ্যামার সমস্যা নিদারুণ, এবং তাহার পরিণামের মধ্যে সান্ত্বনার লেশ-মাত্র নাই। কমলিকা, চিত্রাঙ্গদা শেষ পর্যন্ত প্রেমের সার্থকতা লাভ করিয়াছে; প্রকৃতির ত্যাগের মধ্যেই তাহার তৃপ্তি আছে। কিন্তু শ্যামার ভাগ্যে নিদারুণ অভিলাঞ্ছনা ছাড়া আর কি জুটিল? উত্তীয়ের মৃত্যুর পাপের জন্য বোধ করি এইরূপ পরিণামের প্রয়োজন ছিল। পাপের দ্বারা লব্ধ প্রেম ভোগ কারবার সৌভাগ্য তাহার হইল না।

অরুণেশ্বর, অর্জুন ও আনন্দ শেষ পর্যন্ত সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু বজ্রসেনের ট্র্যাজেডি এই যে, শ্যামাকে যে সত্যই ভালবাসে, কিন্তু পাপবোধের চেতনা তাহাকে গ্রহণ করিবার পথের অন্তরায়। তাহার অর্ধেক শ্যামাকে চাহে, অপরার্ধ সেই তৃষ্ণার ভৃঙ্গার হাত হইতে ছিনাইয়া লইতেছে। সে জানে বিধাতা পাপীকে ক্ষমা করেন, কিন্তু তাহার ক্ষমাহীনতার জন্য তাঁহার ক্ষমা নাই।

"জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা,
ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা।"

নৃত্যনাট্য কয়খানির বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ইহাদের ভাবের সঙ্গে ভাব-প্রকাশের বাহনের কি নিগূঢ় যোগ! যে-কোন ঘটনাকে নৃত্যের দ্বারা প্রকাশ করিলে চলিবে না, অন্তত রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই।

জাভার নৃত্যনাট্যগুলিতে ভাব ও ভাব-প্রকাশের বাহনের মধ্যে এমন দেহাত্মযোগ আছে—এরূপ মনে করা চলে না। ভাব ও তাহার বাহনের মধ্যে অনিবার্য যোগসাধনে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব; এই নৃত্যনাট্যগুলিতে যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যের অতি পুরাতন সত্য; তাঁহার যৌবনের রচনাতেই তাহা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই ভাবকে নূতন বাহনের হাতে সমর্পণ করিবার দৃষ্টান্ত নৃত্যনাট্যগুলি। জাভাতে নৃত্যনাট্যের সজীব আদর্শ দেখিয়াছিলেন বলিয়া তিনি আংশিক ঋণী; তাহার পূর্ণাদর্শ আমরা রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে দেখিতে পাইলাম বলিয়া কবির কাছে আমাদের ঋণ পূর্ণতর।

ঋতুনাট্য

রবীন্দ্রনাথের কোন্ পর্যায়ের নাটকগুলিকে ঋতুনাট্য বলিতেছি, সে সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণে ধারণা স্পষ্ট করিয়া লওয়া আবশ্যক, নতুবা ভ্রমে পড়িবার আশঙ্কা আছে। ঋতু-উৎসব নামে কবির যে নাট্যসমষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে শেষবর্ষণ, বসন্ত, সুন্দর-এর সঙ্গে শারদোৎসব ও ফাল্গুনী স্থান পাইয়াছে। ইহা হইতে মনে করা চলে যে, শারদোৎসব ও ফাল্গুনীকেও কবি ঋতুনাট্য মনে করিতেন। এইখানে তাঁহার সঙ্গে আমাদের মতভেদ।

আগে একবার বলিয়াছি, আবার মনে করাইয়া দিতে চাই যে, রবীন্দ্র-নাট্যের তিনটি ধাপ আছে। এক শ্রেণীর নাটকে মানব অভিনেতাই দৃষ্ট হয়, প্রকৃতির কোনো স্থান নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীতে মানুষ প্রধান অভিনেতা, প্রকৃতি সজীব ও সঙ্কেতময় পটভূমিকা। তৃতীয় শ্রেণীর নাটকে প্রকৃতি প্রধান অভিনেতা, মানুষ পটভূমিতে মাত্র আছে, কখনো ব্যাখ্যাতা-রূপে, কখনো কেবল দর্শক রূপে মাত্র।

আমরা এই তৃতীয় শ্রেণীর নাটককেই প্রকৃত ঋতুনাট্য বলিতে চাই। ফাল্গুনী ও শারদোৎসব-এ মানব অভিনেতা প্রধান, প্রকৃতি সজীব ও গভীর অর্থপূর্ণ পটভূমিকা ; প্রকতি প্রধান অভিনেতা হইয়া ওঠে নাই।

শ্রেণীবিচারের যে সঙ্কেত দিলাম তদনুসারে আমাদের মতে নিম্নলিখিত পাঁচখানি নাটককে প্রকৃত ঋতুনাট্য বলা চলে। শেষবর্ষণ, বসন্ত, নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা, নবীন ও শ্রাবণগাথা।

গীতোৎসব, সুন্দর ও বর্ষামঙ্গল প্রায় এই শ্রেণীর রচনা, কিন্তু কোনো ক্রমেই এগুলিকে নাটক বলা চলে না—এগুলিকে বিশেষ বিশেষ ঋতু-অভিনন্দন উপলক্ষ্যে রচিত বা সঙ্কলিত গানের মালা মাত্র ; নাটকীয় লক্ষণ-দানের কোনো প্রচেষ্টা এগুলিতে নাই।

কিন্তু যে পাঁচখানিকে ঋতুনাট্য বলিয়া উল্লেখ করিলাম তাহাও ঋতু-অভিনন্দন উপলক্ষ্যে রচিত ; কিন্তু পাত্রপাত্রীর সমাবেশ, প্রবেশ ও প্রস্থান প্রভৃতি ইঙ্গিতের দ্বারা এগুলিকে নাটকীয় করিয়া তুলিবার সচেতন চেষ্টা আছে।

এই সব নাটকে দুই শ্রেণীর অভিনেতা দৃষ্ট হয়, মানব ও প্রকৃতি। হয়তো কোনো রাজসভাতে ঋতু-উৎসব লাগিয়াছে। রাজসভার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রাজা আছেন, সভাকবি আছেন, পারিষদগণ আছে, নাট্যাচার্য আছেন,

নটরাজ আছেন, আবার আভাসে সামাজিক শ্রোতাগণও আছেন। আবার আর এক দিকে প্রকৃতির প্রতিনিধিস্বরূপ বিভিন্ন ঋতু আছে; নদী আছে; দক্ষিণহাওয়া আছে; শালবীথিকা, বেণুবন, আম্রকুঞ্জ, করবী, বকুল, মাধবী, মালতী ইত্যাদি আছে। শেষোক্ত দলই প্রধান অভিনেতা; পূর্বোক্ত মানুষেরা দর্শক এবং ব্যাখ্যাতা মাত্র।

শ্রাবণগাথা ও শেষবর্ষণের নটরাজ, এবং বসন্তের কবি নাট্য-ব্যাপারের ব্যাখ্যাকারী। যেমন কোনো কোনো চলচ্চিত্রে একটি অশরীরী বাণীকে ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে শোনা যায়—অনেকটা সেই রকম আর কি। আবার ওই তিনখানিতে রাজা উপস্থিত আছেন, তাঁহাকে আদর্শশ্রোতা বলা যাইতে পারে। গ্রীক্ নাটকের কোরাস্‌কে 'Ideal Spectator' বলা হইয়াছে; তাহারা কেবল আদর্শশ্রোতা মাত্র নয়, প্রশ্নোত্তরের দ্বারা ঘটনার গ্রন্থি-উন্মোচনে সাহায্য করিয়া অনেক পরিমাণে ব্যাখ্যাতার কাজও করিয়া থাকে। কোরাসের সেই দায়িত্ব এখানে রাজা এবং নটরাজ বা কবির মধ্যে যেন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে।

এই সব নাটকে মানব অভিনেতারা গদ্যে কথা বলিতেছেন। গদ্য ব্যাখ্যার জন্যও বটে, আবার এই গদ্যের সাদা পটের উপরে গানের সুর ও পাত্রপাত্রীর নৃত্য উজ্জ্বলতর ভাবে ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে বলিয়াও বটে। নৃত্য ও গীত ইহার প্রধান অঙ্গ; গদ্যাংশ গানের সঙ্গে গানকে, ঘটনার সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাকে জোড়া দিতে সাহায্য করিয়াছে মাত্র।

নবীন নাটকখানিতেও গদ্য আছে বটে, এবং তাহার উদ্দেশ্যও পূর্ববর্ণিত-মতো রসব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তাহা যে কে বলিতেছে তাহার উল্লেখ নাই; অভিনয়ের সময় স্বয়ং কবি বলিতেন। যিনিই বলুন তিনি একাধারে আদর্শ দর্শক ও ভাষ্যকার ছাড়া আর কিছু নহেন।

নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালায় গদ্য আদৌ নাই। তৎপরিবর্তে গানে ও কবিতায় এটি মিশ্রিত। কবিতাংশ ইহার পটভূমিকা। এই কবিতাগুলিও অভিনয়-কালে স্বয়ং কবি আবৃত্তি করিতেন; তাঁহার কাজ ছিল দর্শকের চিত্তে রসোদ্‌বোধনে সাহায্য করা—এখানেও তিনি ভাষ্যকার ও আদর্শ দর্শকের কাজ একাধারে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এবারে ঋতুনাট্যের বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন, কৈশোর হইতেই, এই ঋতুরস-উপলব্ধির দিকেই যেন চলিয়াছে। পূর্বে তাঁহার নাটকের যে তিনটি পর্যায়ের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে তাহা স্মরণ

করা যাইতে পারে। প্রথম পর্যায়ের নাটক মানবরস-প্রধান, তাহাতে প্রকৃতির সচেতন উল্লেখ নাই বলিলেও চলে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকৃতি সজীব ও সঙ্কেতময় হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু তবু তাহার গুরুত্ব গৌণ, মানুষই প্রধান। তৃতীয় পর্যায়ে মানব অভিনেতা গৌণ হইয়া পড়িয়া প্রকৃতিকে রঙ্গমঞ্চের পুরোভূমিকা ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, কেমন ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে প্রকৃতির রূপ-উপলব্ধির গুরুত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে। ঋতুনাট্যগুলি কবিজীবনের এই প্রকৃতিমুখী বিবর্তনের চরম-ধাপ। জীবনের শেষ দিকে তাঁহার কাছে প্রকৃতি মানুষের বিকল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাঁহার কাছে মানুষকে বুঝিবার দোসর প্রকৃতি; মানবজীবনকে যতক্ষণ না প্রকৃতির মধ্যে আরোপ করিতে পারিতেছেন ততক্ষণ যেন তিনি তাহাকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। মানবজীবনের তীব্র সূর্যালোকের দিকে তাকানো যায় না বটে, কিন্তু সেই আলো যখন প্রকৃতির চন্দ্রালোক হইতে স্নিগ্ধতর হইয়া বিচ্ছুরিত হয় তখন সেদিক হইতে চোখ ফিরাইতে আর ইচ্ছা করে না। এই যে প্রকৃতিকে মানুষের বিকল্প করিয়া বুঝিবার প্রয়াস—ইহার সূচনা নাটকে। বর্তমান ঋতুনাট্যগুলির মতোই ফাল্গুনীতেও দু'টি ভাগ আছে—প্রকৃতির গীতিভূমিকা ও মানুষের অভিনয়। মানুষের জীবনের রহস্যের চাবিকাঠি যেন প্রকৃতির হাতেই রহিয়াছে—

'গানের চাবি দিয়েই এর এক একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।'

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয়টা কি আলাদা নাকি?'

'না, মহারাজ—বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা।'

অর্থাৎ মানুষের প্রাণের লীলাকে বিশ্বপ্রকৃতির লীলা দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা। কবির কাছে প্রকৃতি যেন মানবজীবনের ব্যাখ্যাতা, ভাষ্যকার। মানবজীবনের দুরূহ কালিদাসকে প্রকৃতির মল্লিনাথ সঞ্জীবনী টীকা দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া যেন সরস করিয়া তুলিয়াছে।

বর্তমান ঋতুনাট্যগুলি ফাল্গুনীর গীতিভূমিকারই পরিবর্ধিত সংস্কার মাত্র। কিংবা ফাল্গুনীর মানব-অংশকে বাদ দিয়া গীতিভূমিকার ঋতু-অংশগুলিকে বাড়াইয়া গদ্য জুড়িয়া দিয়া, প্রবেশ প্রস্থান সংযোজিত করিয়া দিলে যাহা দাঁড়ায় ঋতুনাট্যগুলি তাহা ছাড়া আর কিছু নয়।

রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে বনবাণী নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন।

পাঠকসমাজে বোধ করি ইহার বহুপ্রচলন ঘটে নাই। কিন্তু, ইহা কবির বিশিষ্ট স্বকীয়তাপূর্ণ একখানি কাব্য। প্রকৃতি যে মানুষের বিকল্প হইয়াছে—বনবাণীর পত্রে পত্রে তাহা মর্মরিত হইতেছে। বনবাণীর মধ্যেই যেন তিনি মানববাণীর সার্থক প্রতিধ্বনি পাইয়াছেন। এই কাব্যের ভূমিকায় প্রকৃতির সহিত তাঁহার, প্রকৃতির সহিত মানুষের, একাত্মতার স্পষ্ট উল্লেখ কবি করিয়াছেন।—

'আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌছলো। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে, হাজার হাজার বৎসরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়—তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুন্‌গুনিয়ে ওঠে।

'ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে, তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

'বোষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়। তার মানে, গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর; সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহলে আমাদের মিলনসঙ্গীতে বদ্‌সুর লাগে না। বুদ্ধদেব যে বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন—দুইএ মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী: 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।' শুনেছিলেন: 'যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।' তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন: 'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ'—প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে? সেই প্রৈতি, সেই বেগ থামতে চায় না;

রূপের ঝরনা অহরহ ঝরতে লাগলো, তার কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা। সেই প্রথম প্রাণ-প্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চির-প্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে?'

এই ভূমিকাটিতে দেখা যায়, বনবাণী কবির কাছে জীবজগতের আদিবাণী, মানুষের বাণী তাহার তুলনায় অর্বাচীন; বিশ্বের প্রাণের বিশুদ্ধ রহস্য যেন ওই গাছপালার প্রাণের মধ্যে নিহিত। আরণ্যক ঋষিদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, বুদ্ধদেবের বোধিদ্রুমলীন সাধনার ভিতর দিয়া, লৌকিক সাধিকা বোষ্টমী পর্যন্ত যেন এই সত্যটিকে প্রকাশ করিতেছে। বিশ্বসৃষ্টির প্রাণবেগ গাছপালার প্রাণ-প্রৈতির মধ্যে স্পন্দিত; পৃথিবীর অরাজকতার কোলাহলে বনবাণীর একতারা বিশ্বসঙ্গীতের ধুয়াটি ধ্বনিত করিতেছে—এই সঙ্গীতের স্নানে কবিচিত্ত নির্মল হইয়া মুক্তির আনন্দ অনুভব করে।

প্রকৃতিকে কবি কী দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, তাঁহার কাছে প্রকৃতির গুরুত্ব কতখানি, তাহার প্রকাশ ও ব্যাখ্যা এই ভূমিকাটিতে যেমন আছে, অন্য কোথাও তেমনি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

এই কাব্যে জগদীশচন্দ্র বসুর নামে একটি কবিতা আছে। আচার্য বসুর উদ্দেশে ইহার আগেও কবি একাধিক কবিতা লিখিয়াছেন। আচার্য বসুর বৈজ্ঞানিক জীবনের সম্বন্ধে কবির গভীর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা ছিল। ইহার কারণও কবির প্রকৃতির প্রতি সমবেদনার মধ্যে নিহিত। জগদীশচন্দ্র যদি নিছক পদার্থবিদ্ বৈজ্ঞানিক হইতেন তবে বিজ্ঞানসাধনায় কবির এমন সকৌতূহল সমবেদনা লাভ করিতেন কি না সন্দেহ। জগদীশচন্দ্রের সাধনার চরম লক্ষ্য ছিল বনবাণীর স্বরূপ উদ্ঘাটন। পৃথিবীর আদিম অধিবাসী তরুলতার রহস্য-উদ্ভেদের চেষ্টায় তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও স্বকীয় কবিপন্থায় কৈশোর হইতেই এই সাধনায় নিযুক্ত আছেন; প্রভেদের মধ্যে এই যে, একজনের পন্থা বিজ্ঞানসম্মত, আর-একজনের পন্থা ধ্যানগম্য; লক্ষ্য কিন্তু একই। এখন, সাধনার এই সমলক্ষ্যতাই রবীন্দ্রনাথকে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার প্রতি অনুরক্ত ও কৌতূহলী করিয়া তুলিয়াছে। জগদীশ-চন্দ্রের উদ্দেশে লিখিত সবগুলি কবিতাতেই বিজ্ঞান-সাধনার এই বিশেষ-লক্ষ্যটির সবিশেষ উল্লেখ আছে এবং বিজ্ঞানের অন্য কোনো লক্ষ্যের উল্লেখ নাই বলিলেও চলে। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র দুইজনে দুইদিক হইতে একই রহস্য-উদ্ঘাটনের পথে যাত্রা করিয়াছেন।

শেষবর্ষণ

এই পালাগানের উপজীব্য বর্ষার বিদায় ও শরতের আগমন। রবীন্দ্রনাথের কোনো পালাই নিছক যাওয়াতে পরিসমাপ্ত নয়; যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসার সূচনা দিয়া তবে তিনি ক্ষান্ত হন।

এখানে যে কেবল বর্ষার বিদায় ও শরতের আগমন তাহা নয়—পালাসমাপ্তির মুখে দেখা গেল, বাদললক্ষ্মীই মেঘের অবগুণ্ঠন ঘুচাইয়া শরৎশ্রী-রূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িলেন; বাদললক্ষ্মীই অবস্থাভেদে শরৎশ্রী, ইহাই এই পালার মর্মকথা।

কোনো রাজসভায় শেষবর্ষণ পালার উৎসব শুরু হইয়াছে। মানব পাত্রপাত্রীদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রাজা, নটরাজ, নাট্যাচার্য ও গানের দল। আর আছেন রাজকবি ও পারিষদগণ। পালার রচয়িতা কবি পলাতক।

নটরাজ ও নাট্যাচার্যকে পালাগানের প্রযোজক বলা যাইতে পারে, তাঁহারা নাটকের ঘটনা ও মর্মকে ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছেন। রাজা আদর্শদর্শক, অর্থাৎ যে-ভাবে পালাটিকে গ্রহণ করা উচিত সেইভাবে তিনি করিতেছেন। রাজকবি ও পারিষদগণ সাধারণ দর্শকের প্রতিনিধি, অর্থাৎ যে-ভাবে পালাটি গৃহীত হইবার আশঙ্কা সেই মনোভাবটি তাঁহাদের কথাবার্তায় দেখানো হইয়াছে।

প্রকৃতির পাত্রপাত্রীর মধ্যে আছে বাদললক্ষ্মী, শরৎশ্রী (দুই-ই এক সত্তা) আর সুন্দর।

আরো একটি কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মানব পাত্রপাত্রীদের মধ্যে সংলাপ চলিতেছে গদ্যে, কিন্তু পালার আসল ব্যাপার অর্থাৎ প্রকৃতির রসোদবোধন চলিতেছে গানে; সঙ্গীতগুলি যেন এখানে কাব্যাংশ, আর গদ্য হইতেছে তাহার ভাষ্য ও টীকা। আলোচনাকালে এই টীকাই গুরুতর হইয়া উঠিবার আশঙ্কা আছে, কারণ বর্তমান সমালোচক এখানে টীকাকারের টীকা করিতে বসিয়াছেন।

বর্ষার রূপ বাহিরে জমিয়া উঠিয়াছে, তাহার অনুরূপ একটা লীলা মানুষের অন্তরে চলিতেছে—তাহা যদি না হইত তবে মানুষের পক্ষে বর্ষার কোনো মূল্য থাকিত না।

'নটরাজ। সে [বর্ষা] তো আসে বাইরের আকাশে। অন্তরের আকাশে তাকে গান গেয়ে ডেকে আনতে হয়।

মহারাজ, এখন একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, : রজনী শাঙন-ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিম্ ঝিম্ শবদে বরিষে।

রাজা। ভিতরের দিকে ? সেই দিকের পথই তো সব চেয়ে দুর্গম।

নটরাজ। গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন, সুগম হবে। অনুভব করছেন কি, প্রাণের আকাশে পূব হাওয়া মুখর হয়ে উঠল। বিরহের অন্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো সব গীতরসিক, আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো।'

অন্তর ও বাহিরের মিলনের ঘটক হইতেছে গান ও সুর। সুরের সারথ্যে দর্শকের চোখের সম্মুখে শ্রাবণের কোন্ রূপটি প্রকাশিত হইয়া পড়িল ?

'শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলুথালু তার জটা, চোখে তার বিদ্যুৎ। অশ্রান্ত ধারার একতারায় একই সুর সে বাজিয়ে বাজিয়ে সারা হল। পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না।'

শ্রাবণ আপনার পূর্ণতার আনন্দে রিক্ত হইয়াছে, সেই পূর্ণতাজাত রিক্ততাই তাকে ঘরের বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া উদাসীন সন্ন্যাসী করিয়া পথে বাহির করিয়াছে। এই আইডিয়া রবীন্দ্রকাব্যে অত্যন্ত অবিরল ; বসন্ত ঋতুর তাৎপর্য-ব্যাখ্যার বেলাতেও পুনরায় ইহা চোখে পড়িবে।

এমন সময়ে পূর্বদিক আলোকিত হইয়া শ্রাবণের পূর্ণচন্দ্র আভাসে দেখা দিল—

'রাজা। নটরাজ, শ্রাবণের পূর্ণিমার পূর্ণতা কোথায় ? ও তো বসন্তের পূর্ণিমা নয়।

নটরাজ। মহারাজ, বসন্তপূর্ণিমাই তো অপূর্ণ। তাতে চোখের জল নেই, কেবলমাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্ল রাতে হাসি বলছে, 'আমার জিত,' কান্না বলছে 'আমার'। ফুল ফোটার সঙ্গে ফুল ঝরার মালাবদল।'

শ্রাবণের পূর্ণিমা জীবনের সগোত্র, তাহাতে একাধারে হাসি ও কান্না আছে, আর সেইজন্যই হাসিমাত্র-সম্বল বসন্তপূর্ণিমার চেয়ে পূর্ণতর সে। কিন্তু, বর্ষায় তো কেবল মাধুর্য নাই ; কঠোরতাও আছে, নহিলে পূর্ণতা কিসের ? মধুরে কঠোরে মিলিয়া বর্ষার হরপার্বতীর রূপ।

'বজ্র-মানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ়, তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা।...
সবুজ সুধার ধারায় ধারায় প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ঙ্করী বন্যা মরণ-ঢালা।'

বর্ষার রূপের মধ্যে বজ্রমানিক আছে, শ্যামল শোভার সঙ্গে বিদ্যুৎ-বহ্নি আছে; একদিকে তাহার কোমল সবুজসুধা প্রাণদায়িনী, আর-একদিকে তাহার মরণ-ঢালা ভয়ঙ্করী বন্যা—এই সব বিরুদ্ধের সমাবেশই তাহাকে জীবনের জটিল পূর্ণতা দান করিয়াছে।

কিন্তু, ইহাই বর্ষার রূপের সবটা নয়। তাহার মধ্যে বিরহ অন্যতম প্রধান।

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা।

বিরহ আছে বলিয়াই মিলনও আছে। 'খুব বড় মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের।'

এবারে রাজা বলিতেছেন, 'কান্না হাসি, বিরহ মিলন সবরকমই তো খণ্ড খণ্ড করে হল, এইবার বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্তি দেখাও দেখি।'

গানের আবহাওয়া বেশ জমিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া রাজার ইচ্ছা, বাদলের পালাটাই চলুক। কিন্তু, পালা তো বাদলের নয়, বাদলবিদায়ের। বিদায়ের সুর বাঁশিতে ধ্বনিত না হইলে শরতের আগমনী হইবে কিরকমে? কারণ, ইহা যে একাধারে বাদলবিদায় ও শরৎ-আগমনের পালা। 'শরতের আলো আসবে ওর সঙ্গে খেলতে। আকাশে হবে আলোয় কালোয় যুগলমিলন।'

শরতের আগমনী বহন করিয়া শুকতারা ও শেফালি দেখা দিল।

'রাজা। নটরাজ, অমন শুকতারাতে শেফালিতে ভাগ করে শরৎকে দেখাবে কেমন করে।

নটরাজ। শুভ্র শান্তির মূর্তি ধরে এইবার আসুন শরৎশ্রী। সজল হাওয়ার দোল থেমে যাক, আকাশে আলোকশতদলের উপর তিনি চরণ রাখুন, দিকে দিগন্তে সে বিকশিত হয়ে উঠুক।

বাদললক্ষ্মীর প্রবেশ

রাজা। ও কী হল নটরাজ, সেই বাদললক্ষ্মীই তো ফিরে এলেন; মাথায় সেই অবগুণ্ঠন।

নটরাজ। চিনতে সময় লাগে, মহারাজ। ভোররাত্রিকেও নিশীথরাত্রি বলে ভুল হয়।...বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরৎকে চিনেছে।... প্রিয়দর্শিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদললক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিনতে

পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎপ্রতিমা। বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদ্‌গদ্‌, শিউলিবনে তাঁরই গান, মালতীবিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি।…

অবগুণ্ঠন মোচন

নটরাজ। অবগুণ্ঠন তো খুলল। কিন্তু, এ কী দেখলুম। এ কি রূপ, না বাণী? এ কি আমার মনেরই মধ্যে, না আমার চোখেরই সামনে।'

শরৎপ্রতিমা একাধারে বাহিরেও বটে, অন্তরেও বটে।—

'রাজা। শরৎশ্রী কাকে ইশারা করে ডাকছে। বলো তো এবার কে আসবে।

নটরাজ। উনি ডাকছেন সুন্দরকে। যা ছিল ছায়ার কুঁড়ি তা ফুটল আলোর ফুলে। গানের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।…

শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে,
হৃদয়কুঞ্জবনে মঞ্জরিল
মধুর শেফালিকা।

রাজা। নটরাজ, শরৎলক্ষ্মীর সহচরটি [সুন্দর] এরই মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন।

নটরাজ। শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আশ্বিনের সাদামেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়া-আসায় স্বর্গমর্ত্যের মিলনপথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।'

সুন্দরের স্বভাবই এই। ক্ষণিকতা সৌন্দর্যের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। বাস্তবে সৌন্দর্য অত্যন্ত ক্ষণস্থ। বিদায়ের আকস্মিকতায় হতাশ হইয়া রাজা শুধাইলেন—

'রাজা। এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকণ্ঠা, তার পরে?

নটরাজ। তারপরে প্রশ্নের উত্তর নেই, সব চুপ। এই তো সৃষ্টির লীলা। এ তো কৃপণের পুঁজি নয়। এ যে আনন্দের অমিত ব্যয়। মুকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি। বাঁশিতে যদি গান বেজে থাকে সেই তো চরম।'

ইহাই সংক্ষেপে শেষবর্ষণ পালার মর্ম। মানবজীবনের সত্যকে প্রকৃতিতে অরোপ করিয়া ছায়াচিত্রের মতো দেখানো হইয়াছে। প্রকৃতি অভিনয় করিয়া চলিয়াছে; মানব দর্শক সাজিয়া, বিবিক্ত হইয়া বসিয়া, নিজের স্বরূপকে সত্যতর ভাবে উপলব্ধি করিয়া লইতেছে।

বসন্ত

বসন্ত পালাগানের কাঠামোটাও শেষবর্ষণের অনুরূপ। পাত্রপাত্রী দুই শ্রেণীর, মানব ও প্রকৃতি। মানব অভিনেতা পটভূমিকাশ্রয়ী, প্রকৃতি পুরোভাগে। কবি ব্যাখ্যাতা, রাজা আদর্শ দর্শক—একে অপরের পরিপূরক।

রাজা রাজকোষের দীনতা দেখিয়া অমাত্যদের সঙ্গ পরিহার করিয়া পালাগানের আসরে আসিয়া উপস্থিত। কবি তাঁহাকে ভরসা দিলেন, এখানে তিনি রাজসঙ্গী পাইবেন ঋতুরাজ বসন্তকে—ইনিও পলাতক।

'রাজা। ঋতুরাজ? বসন্ত?

কবি। হাঁ, মহারাজ। তিনি চিরপলাতক। আমারই মতো। পৃথ্বী তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে পৃথ্বীপতি করতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি—

রাজা। বুঝেছি, বোধ করি রাজকোষের অবস্থা দেখে পালাতে ইচ্ছে করছেন।

কবি। পৃথিবীর রাজকোষ পূর্ণ করে দিয়ে তিনি পালান।

রাজা। কী দুঃখে।

কবি। দুঃখে নয়, আনন্দে।'

ঋতুরাজ বসন্ত পরম ঐশ্বর্যে পূর্ণ; সেই পূর্ণতার আনন্দে তিনি সর্বস্ব নিঃশেষে দান করিয়া দিয়া রিক্ত হন। যিনি ছিলেন রাজা, তিনি সন্ন্যাসী-বেশে দেখা দেন। বসন্ত একাধারে রাজা ও সন্ন্যাসী, তিনি এক সত্তায় রাজসন্ন্যাসী।—

'রাজা। ওহে কবি, তোমার এ পালাটা কি রকম করে তুলেছ? বরযাত্রীরই ভিড়, বর কোথায়। তোমার ঋতুরাজ কই।

কবি। ঐ যে এই খানিক আগে দেখলেন।

রাজা। ঐ জীর্ণ বসন প'রে শুকনো পাতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে? ওতে তো নবীনের রূপ দেখলুম না ও তো মূর্তিমান পুরাতন।

কবি। তবে তো চিনতে পারেন নি; ঠকেছেন। আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে তার এক পিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল; আবার যখন পালটে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী; তখন ফাগুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতন-পুরাতনের মধ্যে দিয়ে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। তাহলে নবীন মূর্তিটা একবার দেখিয়ে দাও। আর দেরি কেন।

কবি। ঐ যে এসেছেন। পথিকবেশে, নূতন-পুরাতনের মাঝখানকার নিত্যযাতায়াতের পথে।

রাজা। তোমার পলাতকা বুঝি পথে পথেই থাকেন ?

কবি। হাঁ, উনি বাস্তুছাড়ার দলপতি, আমি ওঁরই গানের তলপি বয়ে বেড়াই।'

বসন্তের রাজসন্ন্যাসী, পথিক, বাস্তুছাড়া আখ্যাগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ও পুরাতন আইডিয়া। ইহা মনে না রাখিলে তাঁহার ঋতুরাজকে ও ঋতুনাট্যকে বুঝিতে অসুবিধা হইবে।

এই রাজসন্ন্যাসীর কর আদায় করিবার উদ্দেশ্যে বসন্তের পরিচারকগণ উপস্থিত হইয়া প্রকৃতির কাছে দাবি জানাইতেছে—

সব দিবি কে, সব দিবি পায়! আয় আয় আয়!
ডাক পড়েছে ঐ শোনা যায়, আয়, আয়, আয়!
আসবে সে যে স্বর্ণরথে, জাগবি কারা রিক্ত রথে
পৌষরজনী তাহার আশায়!

ঋতুরাজ আসেন স্বর্ণরথে বটে, কিন্তু তিনি সানন্দে ভিক্ষুকের মতো দানযাত্রা করিয়া ফেরেন; রবীন্দ্রনাথের ভগবানেরও এই একই লীলা।[১]

ঋতুরাজ সর্বস্ব দান করেন বলিয়াই তিনি সর্বস্ব আকাঙ্ক্ষা করেন। আর, যাহারা দান করে তাহারা রিক্ত না হইয়া পূর্ণতর হইয়া ওঠে।

'কবি। বসন্ত-উৎসবে দানের দ্বারাই ধরণী ধনী হয়ে ওঠেন।...

রাজা। দাবি তো কম নয়।

কবি। দাবি বড় হলেই দান সহজ হয়; ছোটো হলেই কৃপণতা জাগায়।

রাজা। তা এরা সব [প্রকৃতি] রাজি আছে?

কবি। এদের মুখেই শুনে নিন।'

বসন্তের আহ্বানে নিখিল প্রকৃতি সাড়া দিয়াছে। বনভূমি বলিতেছে—

'বাকি আমি রাখব না কিছুই,
তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভুঁই।'

আম্রকুঞ্জ বলিতেছে—

'ফল ফলাবার আশা আমি মনেই রাখি নি রে,
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণসমীরে।'

---

১ দৃষ্টান্তস্বরূপ খেয়া কাব্যের 'কৃপণ' কবিতা উল্লেখযোগ্য।

রাজা বুঝিলেন, 'ফল ফলাবো বলে কোমর বেঁধে বসলে ফল ফলে না। মনের আনন্দে ফল চাইনে বলতে পারলে ফল আপনি ফলে ওঠে।'

একদিকে ইহারা যেমন সর্বস্বদানের জন্য উদ্‌গ্রীব, তেমনি আর-একদিকে একদল নিঃশেষে আত্মসমর্পণের জন্য উৎকণ্ঠিত। করবী বলিতেছে, আমি যদি তাহাকে না-ই চিনিতে পারি সে তো আমাকে চিনিয়া লইবে। কুঁড়ির কানে কথা বলিয়া আমার ফুল ফোটানোকে সার্থক করিবে। বেণুবন বলিতেছে, দখিনহাওয়া তাহার শাখায় শাখায় সুপ্ত গানকে জাগাইয়া তুলুক—

নৃত্য তোমার চিত্তে আমার
মুক্তিদোলা করে যে দান।

দীপশিখা মিনতি করিতেছে—

ভয়ে ভয়ে একা জাগি,
মনের কথা কানে কানে মৃদু মৃদু কও।

এমন সময় ঋতুরাজের আগমন আসন্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি চাঁপা-করবীর চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন নাই। মাধবী, শালবীথিকা, বকুল, নদী অভ্যর্থনার ঐকতানে তাঁহার আগমনী জগতে প্রচার করিয়া দিল। দখিন-হাওয়া বলিতেছে—

শুক্‌নো পাতা কে যে ছড়ায় ঐ দূরে
উদাস-করা কোন্‌ সুরে।
ঘর-ছাড়া এ কে বৈরাগী
জানি না সে কাহার লাগি
ক্ষণে ক্ষণে শূন্যবনে যায় ঘুরে।...
ছদ্মবেশে কেন খেলো,
জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো—
প্রকাশ করো চিরনূতন বন্ধুরে।

মাধবী-মালতীর 'তুমি কার' এই প্রশ্নের উত্তরে ঋতুরাজ বলিতেছেন—

আমি তারি যে আমারে
যেমনি দেখে চিনতে পারে,
ও মাধবী, ও মালতী।

বনপথের প্রশ্নের উত্তরে ঋতুরাজ বনফুলের সঙ্গে, কৃষ্ণচূড়া বকুল শিরীষ প্রভৃতির সঙ্গে, তাঁহার কি সম্বন্ধ প্রকাশ করিতেছেন। এমনি করিয়া মিলনের হাওয়াটি যখন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে তখন কবি বলিতেছেন—

'কবি। এবার সময় হয়েছে।

রাজা। কিসের সময়?

কবি। ঋতুরাজের যাবার সময়।…বলেইছি তো পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর আনাগোনা। বাঁধন পরা, বাঁধন খোলা, এও যেমন এক খেলা, ও-ও তেমনি এক খেলা।

রাজা। আমি কিন্তু ঐ পূর্ণ হওয়ার খেলাটাই পছন্দ করি।

কবি। যথার্থ পূর্ণ হয়ে উঠলে রিক্ত হওয়ার খেলায় ভয় থাকে না।'

পূর্ণতার মুহূর্তটির চরম লগ্নে ঋতুরাজ বিদায়ের সুর ধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। মিলন হইতে বিরহ একধাপ মাত্র, পূর্ণতা হইতে রিক্ততা এক-ধাপ মাত্র, রাজত্ব হইতে সন্ন্যাস একধাপ মাত্র। ঋতুরাজের গায়ের কাপড়খানার কথা স্মরণীয়। 'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই!' তাঁহার কাছে বিরহ-মিলন খণ্ড নয়, জীবনসত্তার এ পিঠ ও পিঠ মাত্র।

সেখানে মিলনদিনের ভোলাহাসি
লুকিয়ে বাজায় করুণ বাঁশি,
সেখানে যে কথাটি হয় না বলা
সে কথা রয় কানে গো, রয় কানে।

কবি যত সহজে, যত আনন্দময় বৈরাগ্যে বিদায়কে দেখিতেছেন সবাই তেমন দেখিতেছে না। ঝুমকো লতা বলিতেছে—

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।
মিলনপিয়াসি মোরা,
কথা রাখো, কথা রাখো।

একদিকে যেমন মিলনপিয়াসি বিদায়ব্যথাতুর ঝুমকোলতা, মল্লিকা প্রভৃতি আছে, অন্যদিকে আকন্দ ধুতুরা ও জবা আছে। ইহারা অপেক্ষাকৃত সাহসী।

আকন্দ। এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো।
তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো…
ধুতুরা। আজ খেলা ভাঙার খেলা খেলবি আয়।
সুরের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়।…

জবা। ভয় করব না রে
বিদায়বেদনার।’

কবি এখানে প্রকৃতির মধ্যে বক্তিত্বের প্রভেদ দেখাইয়াছেন। আকন্দ ধুতুরা জবা বিদায়ের দুঃখ সত্ত্বেও তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত। আকন্দ ধুতুরা মহাদেবের প্রিয় পুষ্প। ধ্বংসের দেবতার সাহচর্যে বিদায় ও দুঃখে তাহারা অনভ্যস্ত নয়। জবা কালীর প্রিয় পুষ্প, ধ্বংসের দেবীর সান্নিধ্যে মৃত্যুতে অশ্রুতে সে অভ্যস্ত। তখন সকলে বিদায়মুহূর্তের সার্থকতা বুঝিতে পারিয়া গাহিতেছে—

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ডমিলন পূর্ণ হবে।

মিলনের পূর্ণতার পক্ষে বিচ্ছেদ অত্যাবশ্যক, নতুবা মিলন খণ্ডসত্তা মাত্র। এই আইডিয়াও রবীন্দ্রকাব্যের একটি অতি পুরাতন ও বনিয়াদী আইডিয়া। ‘তাই তো ঋতুরাজ আজ রাজবেশ খসিয়ে দিয়ে বৈরাগি হয়ে বেরিয়ে চলেছে।’ এ যেন মহারাজ হর্ষবর্ধনের সর্বস্বদানের অন্তে চীরবাস মাত্র আশ্রয়ের মতো। পূর্ণের কাছে ঐশ্বর্যে বৈরাগ্যে, মুক্তিতে বন্ধনে, রাজবেশে কৌপীনে, মিলনে বিরহে, গৃহে ও পথে তিলমাত্র বিরোধ নাই; বসন্ত সেই যথার্থ সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতার প্রতীক।

নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা

পূর্বোক্ত দুটি পালাগানের কাঠামো হইতে নটরাজের কাঠামো ভিন্ন; ইহাতে গদ্য নাই, সংলাপ নাই, মানব পাত্রপাত্রী নাই। পুরোভূমিকা ও পটভূমিকায় ভেদ করিবার চেষ্টা নাই। পূর্বোক্ত দুটিতে গদ্য ও গান আছে, এখানে তৎপরিবর্তে কবিতা ও গান। কবিতাগুলি আবৃত্তি করিবার জন্য— অভিনয়কালে স্বয়ং কবি এগুলি আবৃত্তি করিতেন। এই কবিতাগুলিকে ইহার পটভূমিকা বলিলেও বলা যাইতে পারে: এগুলি যেন একাধারে প্রযোজক, ব্যাখ্যাতা ও আদর্শ দর্শকের বক্তব্য।

পূর্বোক্ত পালাগানগুলির সঙ্গে ইহার আরো প্রভেদ আছে। আগের দুটি ছিল একটিমাত্র ঋতুর পালা; শেষবর্ষণে বর্ষা, বসন্তে বসন্ত। নটরাজ অখণ্ড ঋতুচক্রের পালা। পূর্বোক্ত পালাতে ঋতুই প্রধান অভিনন্দনীয় ছিল, এখানে

প্রধান অভিনন্দনীয় ঋতুবিশেষ নয়—স্বয়ং নটরাজ, যিনি ঋতুচক্রের ভিতর দিয়া বিশ্বনৃত্য করিয়া চলিয়াছেন।

এই ঋতুচক্রের ভিতরে নটরাজের বিশ্বনৃত্য দর্শন করিবার আশায় বসন্তের আসরে কবি উদ্‌গ্রীব। বিশ্বনৃত্যে নটরাজের সঙ্গী হইয়া যোগ দিতে পারিলে বন্ধন স্খলিত হইয়া মুক্তিলাভ করা যায়; নটরাজ সেই আদর্শ মুক্ত পুরুষ, আর তাঁহার কবি-সঙ্গীরা তাঁহার আদর্শ পরিচয়।—

'নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, আর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস-উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালাগানের ইহাই মর্ম।'

নটরাজের এক পদক্ষেপ ঋতুচক্রের মধ্যে, অন্য পদক্ষেপ রসিকের চিত্তে; এই দুই পদক্ষেপের ছন্দের সমীকরণ কবিজীবনের উদ্দেশ্য, নটরাজের উদ্দেশ্যও ইহাই।

নটরাজ, তুমি আজ করো গো উদ্ধার
দুঃসাহসী যৌবনেরে, পদে পদে পড়ুক তোমার
চঞ্চল চরণভঙ্গী, রঙ্গেশ্বর, সকল বন্ধনে
উত্তাল নৃত্যের বেগে—যে-নৃত্যের অশান্ত স্পন্দনে
ধূলিবন্দিশালা হতে মুক্তি পায় নবশষ্পদল;
পুলকে কম্পিত হয় প্রাণের দুরন্ত কৌতূহল,
আপনারে সন্ধানিতে ছুটে যায় দূর কাল-পানে,
দুর্গম দেশের পথে, জন্মমরণের তালে তানে,
সৃষ্টির রহস্যদ্বারে নৃত্যের আঘাত নিত্য হানে···
তোমার তাণ্ডবতালে কর্মের বন্ধনগ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি।

এখানে লক্ষ্য করিবার মতো দুটি বিষয় আছে। যে কবির কথা বলা হইয়াছে তাঁহার সঙ্গে যোগী ও সাধকের প্রভেদ নাই; উভয়েরই লক্ষ্য এক, মুক্তি; তবে সাধনমার্গের তফাত আছে, এই মাত্র।

কবি এই মুক্তির রূপটি দেখিতে চান ঋতুলীলার মধ্যে; মুক্তি মানুষের জন্যই, কিন্তু তাহার শিক্ষাস্থান ঋতুরঙ্গশালা যেখানে নটরাজের নৃত্য ঋতুর

প্রহরে প্রহরে চলিতেছে। কেহ বা এই মুক্তির রূপ মানুষের মধ্যে দেখিতে পায়, কেহ প্রকৃতির মধ্যে; রবীন্দ্রনাথ প্রধানত প্রকৃতির মধ্যেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; কারণ, রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের সত্যকে প্রকৃতির জীবনে আরোপ করিয়া উপলব্ধি করিতে অভ্যস্ত, ইহাই যেন তাঁহার পক্ষে প্রকৃতিসিদ্ধ।

ঋতুনৃত্যের প্রারম্ভে বৈশাখ। বৈশাখ তপস্বী, তাহার তপের তাপে জগৎ তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এ তপস্যা নীরস নয়, আষাঢ়ের সরসতার ভূমিকা মাত্র। রসোদ্‌বর্তনের পক্ষে, রসোপভোগের পক্ষে তপঃসংযমের প্রয়োজনেই বৈশাখের এই তপঃক্লিষ্ট মূর্তি। এবং

রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার মৌনস্তব্ধ অলক্ষ্য আড়ালে
স্বপ্নে-রচা অর্চনার থালে
অর্ঘ্যমাল্য সাঙ্গ হয় সংগোপনে সুন্দরের লাগি।

বৈশাখের রৌদ্রতপস্যার মধ্যেই আষাঢ়ের প্রত্যাশা রহিয়া গিয়াছে।—

তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে,
হৃদয় আমার, শ্যামল বঁধুর করুণ স্পর্শ নে।

আষাঢ় সন্ন্যাসী। কিন্তু সন্ন্যাসের রূপটিই আষাঢ়ের সমস্ত রূপ নয়। বর্ষা বিরহের ঋতু, আষাঢ়ের একটি বিরহী মূর্তি আছে। ঘরছাড়া এই সন্ন্যাসীর জন্য কোন্ উমা কোথায় যেন বিরহের তপঃশয্যায় দিবসের নিশীথায়িত দীর্ঘ প্রহরগুলি যাপন করিতেছে।

আজি এ বিরহদীপনদীপিকা
পাঠালো তোমারে এ কোন্ লিপিকা,
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া,
চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া।

শ্রাবণ যাইবার সময়ে 'অভিষেকস্নানে' আলোককে সুপ্রসন্ন করিয়া ধরণীর 'নিগূঢ় বক্ষতলে তৃষ্ণার সম্বল' রাখিয়া, মেঘম্লান আকাশকে আলো দিয়া নিকাইয়া নির্মল শুভ্র করিয়া দিয়া, শরতের আসর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।—

আজ শুধু রহিল তাহার
রিক্তবৃষ্টি জ্যোতিঃশুভ্র মেঘে মেঘে মুক্তির লিখন,
আপন পূর্ণতাখানি নিখিলে করিল সমর্পণ।

শরৎ দৈত্যদমন চিরকালের বালক বীর।

মেঘবিমুক্ত শরতের নীলাকাশ
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ আশ্বাস,
হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ,
জয়ী হবে রবি, মরিবে মরিবে তমো রে।

উমার পুত্র কুমারের দৈত্যজয়ের উদ্দেশ্যে জন্ম; শারদার পুত্র শরৎও তেমনি কুয়াসা ও অন্ধকারকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ।

হেমন্ত লক্ষ্মী। 'হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতা' তাঁহার। কবি বন্দনা করিয়া বলিতেছেন—

স্বর্গলোক ম্লান করি প্রকাশিলে ধরার বৈভব
কোন্ মায়ামন্ত্রগুণে…
অমরার স্বর্গ নামে ধরণীর সোনার অঘ্রানে।
তোমার অমৃতনৃত্য, তোমার অমৃতস্নিগ্ধ হাসি
কখন্ ধূলির ঘরে সঞ্চিত করিলে রাশি রাশি—
আপনার দৈন্যচ্ছলে পূর্ণ হলে আপনার দানে।

এই গেল হেমন্তের এক রূপ, আর-এক রূপ হইতেছে—

হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।
ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো;
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো, সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে।

এক দিকে হেমন্তলক্ষ্মী স্বর্গের স্বর্ণকে পক্বশস্যের আশীর্বাদের ভিতর দিয়া পৃথিবীর করগত করিয়াছেন; আবার আর-এক দিকে তিনি তারার দীপ-গুলিকে আবৃত করিয়া নিজের দীপে দীপান্বিত হইবার সুযোগ মানুষকে দিয়া থাকেন, মানুষ যাহাতে নিজের আলোয় তামসীকে জয় করিবার গৌরব লাভ করিতে পারে। হৈমন্তী বিশেষ ভাবে মানুষেরই লক্ষ্মী, স্বর্গের নহেন।

শীত রুদ্র সন্ন্যাসী। তাঁহার নির্দেশ কী?

জীর্ণতার
মোহবন্ধ ছিন্ন করো, এ বাক্য তোমার
ফিরিছে প্রচার করি জয়ডঙ্কা তব
দিকে দিকে। কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব

করিছে বিকীর্ণ শীর্ণ পর্ণ রাশি রাশি
শূন্য নগ্ন করি শাখা, নিঃশেষে বিনাশি
অকাল পুষ্পের দুঃসাহস।

কিন্তু বিনাশের রূপ সন্ন্যাসীর সবটা নয়, ইহা নবতর জীবনের ভূমিকা মাত্র—

হে নির্মল,
সংশয়-উদ্‌বিগ্ন চিত্তে পূর্ণ করো বল ;
মৃত্যু-অঞ্জলিতে ভরো অমৃতের ধারা।
…বসন্তের কবি
শূন্যতার শুভ্র পত্রে পূর্ণতার ছবি
লেখে আসি, সে শূন্য তোমারি আয়োজন।

বসন্তের সূচনা শীত ; তপস্যা যৌবনরসেরই ভূমিকা মাত্র। তপস্বী সন্ন্যাসীকে

কুন্দ মালতী করিছে মিনতি, হও প্রসন্ন।
ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথি
প্রলয়বেদনা নিল বুকে পাতি,
রুদ্র, এবারে বরবেশে তারে করো গো ধন্য।

কারণ, শীতের ধরণী তপস্বিনী, সে উমা ; শীতের সন্ন্যাসীই বসন্তের বরবেশে তপোবনপ্রান্তে উপস্থিত, সে নবযৌবনকান্ত, সে মহাদেব।[১]

হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন, বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্ত্যে মূর্তি ধরো ভুবনমোহন নব বরবেশে।
তারি লাগি তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ—
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ তোমার উদ্দেশে।

বসন্তের এই মিলন ক্ষণস্থায়ী, কারণ মিলন ও বিরহ মিলিয়াই প্রেমচক্রের সম্পূর্ণতা। বিরহ দুঃখের বটে, কিন্তু তাহা ব্যর্থ নয়।

ফুরায় ফুল ফোটা, পাখিও গান ভোলে,
দখিনবায়ু সেও উদাসি যায় চলে।

১। শরতের রূপে কুমারের রূপক ; বসন্তের রূপে উমা-মহাদেবের রূপক ; কুমারসম্ভবের আইডিয়াটি বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার মতো আর কোনো কাব্য বোধ করি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে প্রভাবিত করে নাই।

তবু কি ভরি তারে
অমৃত ছিল না রে।
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি।

এই ক্ষণস্থায়ী মিলন স্মৃতিতে চিরস্থায়ী হইয়া থাকে—দোলের স্মৃতি। যে-দোলায় বসন্ত ধরণীকে লইয়া দুলিতেছেন, সেই দোলরজ্জুর এক প্রান্ত আবদ্ধ স্বর্গে, এক প্রান্ত মর্ত্যে; এক প্রান্ত মানুষের ঘরে, আর-এক প্রান্ত প্রকৃতিতে—

সে বন্ধন দোলরজ্জু, স্বর্গে মর্ত্যে দোলে ছন্দভরে।

স্বর্গ মর্ত্য, প্রকৃতি মানুষ, সকলকে দোলের প্রেমপাশে আবদ্ধ করিয়া বরবধূর মধুর মিলনদোল চলিয়াছে।

লাগিল দোল জলে স্থলে, জাগিল দোল বনে,
সোহাগিনীর হৃদয়তলে, বিরহিণীর মনে।

এই দোলের আনন্দে তাল রাখিয়া নিখিল যোগ দিয়াছে। 'মাধবী তাই আসিল সেজে', মানুষও আসুক।

এসো গো পীত বসনে সাজি,
কোলেতে বীণা উঠুক বাজি,
ধ্যানেতে আর গানেতে আজি যামিনী যাক্ বয়ে।

মানুষে প্রকৃতিতে, সংসারে সংসারাতীতে, কবিতে যোগীতে দোলের প্লাবনে সব ভেদ ঘুচিয়া একেবারে একাকার হইয়া গেল। এই নিখিলপ্লাবী দোললীলার উৎসবতরঙ্গে কবি নিজের চিত্তকে ভাসাইয়া দিতে উদ্‌গ্রীব।

অনেক দিন বুকের কাছে
রসের স্রোত থমকি আছে,
নাচিবে আজি তোমার নাচে সময় তারি হল।

কেন এই নিখিলব্যাপী বিশ্বনৃত্যের আয়োজন, ইহার সঙ্গে কবিরই বা কেন যোগ দিবার উৎকণ্ঠা? 'অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস-উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।'

এইরূপে ঋতুচক্রের আবর্তনের ভিতর দিয়া নটরাজের নৃত্যলীলা সম্পূর্ণ হইল, কিন্তু শেষ হইল না। এ লীলা অফুরন্ত, নূতন বৎসরের আভাস দিয়া পালাগানখানির পরিসমাপ্তি।

নবীন

নবীন বসন্ত-আগমনীর পালাগান। ইহাতেও পটভূমিকা ও পুরোভূমিকার পর্যায় আছে। গদ্য আছে, তবে তাহা মানব পাত্রপাত্রীর মধ্যে সংলাপরূপে নহে, একজন মাত্র বলিতেছেন, অভিনয়কালে কবিই বলিতেন; নটরাজে কবিতার যে দায়িত্ব এখানে তাহা গদ্যাংশের।

ইহার ভাব-উপজীব্য 'বসন্ত' পালাগানেরই অনুরূপ; কতকগুলি গানও উহা হইতে গৃহীত।

শ্রাবণগাথা

এ পালাগানটির কাঠামো শেষবর্ষণের মতোই সমুখের ও পিছনের ভূমিকায় বিভক্ত। রাজা, নটরাজ, সভাকবি প্রভৃতি মানব পাত্রপাত্রীর মধ্যে গদ্যসংলাপ আছে। রাজা ও নটরাজ দুজনে মিলিয়া আদর্শ দর্শক ও ব্যাখ্যাতা; সভাকবি যেন প্রাকৃতজনের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন।

ইহার ভাব-উপজীব্য বা তত্ত্ব নূতন নয়। বৈশাখের রুদ্রমূর্তিই পরিণামে শ্রাবণের রসিক বরবেশে তপস্বিনী ধরণীর পাণিপ্রার্থিরূপে উপস্থিত, এবং তাঁহাদের মিলনের বাসরঘরের প্রান্তে বালক শরতের আবির্ভাব।[১]

ঋতুনাট্যের নৃত্যের সঙ্গে নৃত্যনাট্যের নৃত্যের একটা প্রভেদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঋতুনাট্যে রসোদ্‌বোধনের বহু পন্থার মধ্যে নৃত্য একটি; প্রধান পন্থা সংগীত, নৃত্যকে বাদ দিলেও রসের একেবারে হানি হইত না। নৃত্যনাট্যে নৃত্যই প্রধান পন্থা; তাহাকে বাদ দিয়া রসোদ্বোধন একেবারেই অসম্ভব; অন্য কথায় বলিতে গেলে, নৃত্যনাট্যে নৃত্য যেমন অপরিহার্য, ঋতুনাট্যে সেরূপ নহে; ঋতুনাট্যে নৃত্য নটরাজের লীলাকে প্রকাশের উপায় মাত্র, কিন্তু নৃত্যনাট্যে নটরাজ ও নৃত্য অভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

---

১ আবার কুমারসম্ভবের রূপক ও আইডিয়া।

ঋতুচক্র

রবীন্দ্রনাথের নাটকের তিনটি ধাপ আছে।

প্রথম ধাপে কতকগুলি নাটক যাহাতে রঙ্গমঞ্চের সবটা জায়গা জুড়িয়া মানব পাত্রপাত্রী; প্রকৃতি তাহাতে অল্পই স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় ধাপে কতকগুলি নাটক, প্রত্যক্ষত যাহার পাত্রপাত্রী প্রকৃতি—মানুষের কথা তাহাতে কেবল ব্যঞ্জনাতেই ধ্বনিত। মাঝখানে একটা ধাপ আছে, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতি ধীরে ধীরে মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে—ইহাকে মানব ও প্রকৃতির সীমান্তপ্রদেশ বলা চলিতে পারে; প্রথম ধাপের মানবীয় গুরুত্ব কমিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখনো তৃতীয় ধাপের প্রাকৃতিক প্রাধান্য শুরু হয় নাই। প্রকৃতি এখনো পটভূমিতে পড়িয়া আছে। কিন্তু সে পটভূমি নির্জীব ও অর্থহীন নহে। এই নাটকগুলি পড়িলে মনে হয়, কবির নাট্যজগতে একটি প্রধান চরিত্র প্রবেশের মুখে, এখনো তাহার সবটা পরিস্ফুট হইয়া ওঠে নাই; এখনো সে নেপথ্যের আড়ালে, কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার দূরাগত পায়ের শব্দ, ওহাড়নীর আভাস, চুলের সুগন্ধ, সুরের মূর্ছনা বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। এইসব নাটকে প্রকৃতি পটভূমিতে আছে বটে, কিন্তু সে নিজে পটভূমি নয়—কবির ইঙ্গিত পাইলেই মানবচরিত্রকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়া নিজে রঙ্গমঞ্চের সবটা জায়গা জুড়িয়া বসিবে। তৃতীয় ধাপের নাটকে প্রকৃতির তরুলতা, নদী, বায়ু, চন্দ্র, মেঘ এবং ঋতুপর্যায় যেমন মূর্তি গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে, এখনো তেমন ঘটে নাই; এখনো প্রকৃতি মানব-পরিবেশের বাহিরে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই আছে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে আভাসে ইঙ্গিতে তাহার ভাববিনিময় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, মানুষের সুখদুঃখের ছায়া তাহার দর্পণে বিম্বিত, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষায় সে সচেতন; কেবল মানুষের জীবনের মধ্যে যেসব বস্তু নিরর্থক বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতির সহিত পরিপূরক ভাবে দেখিলে তাহা অর্থদ্যোতক হইয়া ওঠে; মানুষ যে স্বয়ংপূর্ণ নয়—এমন কথা ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়িয়া যায়, এবং বিদ্যুৎ-বিকাশের ক্ষণিকতায় দেখিতে পাওয়া যায় মানুষ ও প্রকৃতি মিলিয়াই জগৎটা সম্পূর্ণ।

একমাত্র মানব-পরিবেশের ধ্যানেই মানব-জীবনের রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে, এমন কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন দম্ভ আছে; মানব-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আতিশয্যজাত সংকীর্ণতা হইতে ইহার উৎপত্তি। সৌভাগ্যবশত ভারতীয়

কবিদের চিত্তকে এই উগ্র সূক্ষ্মতা বিদ্ধ করিতে পারে নাই। প্রাচীনদের মধ্যে কালিদাস ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। শকুন্তলার তপোবন কেবল প্রাকৃতিক পটভূমি মাত্র নয়—তাহার প্রাকৃতিকত্ব রক্ষা করিয়াও কবি তাহাকে সজীব সহৃদয় করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

'আমি মনে করি, রাজসভায় দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে যে চিনিতে পারেন নাই, তাহার প্রধান কারণ, সঙ্গে অনসূয়া প্রিয়ংবদা ছিল না।' [১]

কিন্তু একথা মনে করাও অসংগত নয় যে, তপোবনবিচ্যুত শকুন্তলাকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই দুষ্যন্ত তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন কবি হয়তো ইহাই বলিতে চান যে, প্রকৃতির সহিত মিলিয়াই মানুষ সম্পূর্ণ, প্রকৃতি হইতে খণ্ডিত মানুষ নিরর্থক—এত নিরর্থক যে তাহাকে চিনিতেই পারা যায় না।

শকুন্তলাতে প্রকৃতির বিশেষত্ব এই যে তাহা সজীব সহৃদয়, কিন্তু তাহা প্রকৃতিই রহিয়া গিয়াছে—তাহাকে মানবরূপ দিয়া রূপক নাটকের পাত্রপাত্রী সাজানো হয় নাই।

'...তপোবন-প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতর যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপক নাট্য রচিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া, এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া—এ তো অন্যত্র দেখি নাই।' [২]

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ধাপের নাটকে প্রকৃতি প্রকৃতি থাকিয়াই সজীব, সহৃদয়, এবং মানবজীবনের মধ্যে গভীর অর্থদ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে, তাঁহার তৃতীয় ধাপের অধিকাংশ নাটক রূপক নাটকের ঠাটে রচিত, তাহাতে প্রকৃতির মুখে কথা ও গান বসানো হইয়াছে।

দ্বিতীয় ধাপে নয়খানি নাটক আছে—অচলায়তন, বিসর্জন, শারদোৎসব, ডাকঘর, রক্তকরবী, রাজা, ফাল্গুনী, এবং রাজা ও রাণী, তপতী। তপতীকে স্বতন্ত্র নাটক বলিয়া ধরিতে হইবে।

১ কাব্যের উপেক্ষিতা, 'প্রাচীন সাহিত্য'।
২ শকুন্তলা, 'প্রাচীন সাহিত্য'।

এই কয়খানি নাটক মনোযোগ দিয়া পড়িলে দেখা যাইবে—ইহাদের ভিতর দিয়া বৎসরের ঋতুচক্র ঘুরিয়া আসিয়াছে—এবং আবর্তন গতানুগতিক মাত্র নয়—প্রত্যেক নাটকের ভাববস্তুর সঙ্গে এক-একটি ঋতুর ভাবসংযোগ রহিয়াছে। অর্থাৎ নাটকের মানব-পাত্রপাত্রীর জীবনে যে লীলা চলিতেছে প্রকৃতির পরিবেশে সেই একই ভাবের লীলা—প্রকৃতি ও মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরিপূরক, ভারতীয় কবির প্রকৃতির নখদন্ত হইতে জীবরক্তের ধারা ঝরিয়া পড়ে না।

অচলায়তন নাটকের ঘটনাকাল গ্রীষ্ম, ইহার অন্ত্যভাগে নববর্ষার সমাগম।

বিসর্জন বর্ষাকালের নাটক ; ইহার নাটকীয় চরম মুহূর্ত শ্রাবণের শেষ দুইদিনে সংঘটিত ; শেষতম দৃশ্যটির সময় শরতের প্রথম প্রভাত।

শারদোৎসব, বলা বাহুল্য, শরৎকালের নাটক—কিন্তু সে-শরৎ আগমনীর শরৎ, অর্থাৎ ঋতুর প্রথম অংশ। ডাকঘরও শরৎকালের নাটক বটে। কিন্তু সে-শরতে বিজয়ার বিষাদের সুর লাগিয়াছে, কখন শরৎ অজ্ঞাতসারে হেমন্তের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

রক্তকরবীর সময় হেমন্তের শেষ এবং শীতের প্রারম্ভ ; ইহাকে পৌষমাস বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

বসন্তকালের নাটক রাজা ও রাণী, রাজা এবং ফাল্গুনী।

এমনি করিয়া এই কয়খানি নাটকের ভিতর দিয়া ঋতুচক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত হইয়া আসিয়াছে।

এইবারে দেখা যাক, নাটকগুলিতে মানবলীলা ও ঋতুলীলার ভাবের কি রাখী-বিনিময় হইয়াছে।

গ্রীষ্ম-বর্ষা : অচলায়তন

অর্থহীন ক্রিয়াকর্ম ও বৃথা আচারের আবর্তনে অচলায়তনের অধিবাসীদের মন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। বাহিরে গ্রীষ্মের কঠোরতায় যে লীলা চলিতেছে অচলায়তনিকদের মনেও সেই একই লীলা। গ্রীষ্ম যতই দুঃসহ হোক তার পরে বর্ষার স্নিগ্ধতা আছে একথা সত্য বটে, কিন্তু গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দুঃসহতার মধ্যে মনে হয় বুঝি ইহার আর শেষ নাই, বুঝি ইহাই প্রকৃতির একমাত্র বিধান, বুঝি ইহাই আদি ও অন্ত।

মহাপঞ্চকের ঠিক ইহাই মনের কথা। সে অচলায়তনের ক্রিয়াকর্ম আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে বড়ো আর কিছু জানে না—এই গণ্ডীর বাহিরে যে একটা বৃহৎ জগৎ আছে তাহাও বোধ করি ভালো করিয়া মানে না। সে আচারের তাপে শুষ্ক হইয়া একটি সজীব রুদ্রাক্ষে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই শুষ্ক রুদ্রতারও একটি শক্তি আছে; মহাপঞ্চকের সংকীর্ণ নিষ্ঠা তাহাকে সেই শক্তি দান করিয়াছে; এই শক্তির বলেই গুরু যখন অপ্রত্যাশিত পথে অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিয়া আসিলেন—তখন একমাত্র মহাপঞ্চকই গুরুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে সাহস করিয়াছে।

মহাপঞ্চক গুরুকে বলিতেছে :

'মহাপঞ্চক। আমি এই আয়তনের আচার্য—আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখনি ওই ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এসো আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্ছে।...

মহাপঞ্চক। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পারো, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পারো, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বাররোধ করে এই বসলুম, যদি প্রয়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম শোণপাংশু। এ পাগলটা কোথাকার রে! এই তরোয়ালের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা একটু ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক। কিসের ভয় দেখাও আমায়! তোমরা মেরে ফেলতে পারো, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম শোণপাংশু। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই—আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা! এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে?

দ্বিতীয় শোণপাংশ। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না?

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।'

মহাপঞ্চক মূর্তিমান গ্রীষ্ম; গ্রীষ্মের শুষ্কতা ও শক্তি দুই-ই তাহাতে আছে; আচারের অনুবর্তন তাহাকে সংকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ফলেই সে সংহত হইয়া উঠিয়া শক্ত হইয়াছে। এই শক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়াই গুরু তাহাকে পছন্দ না করিলেও শ্রদ্ধা করিয়াছেন; কিন্তু উপাধ্যায় প্রভৃতি আর যেসব অভাজন এখানে আছে, যাহারা আচারপালনে কেবল ক্ষুদ্রই হইয়াছে, শক্তিমান হয় নাই—গুরু তাহাদের সঙ্গে বাক্যবিনিময় পর্যন্ত করেন নাই।

এই গেল গ্রীষ্মের একটা রূপ। তার পরে অচলায়তনের আচার্য। বাহিরের গ্রীষ্মের সঙ্গে তাঁহার অন্তরের সামঞ্জস্য আছে—তাঁহার হৃদয়ও শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি জানেন গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আছে; তিনি জানেন, জীবনে আচার আছে, আনন্দও আছে; বর্ষা আপন নিয়মে আসে—আনন্দ কেমন করিয়া আসে আচার্য জানেন না। অচলায়তনের ক্রিয়াকর্ম যে সমস্তই ব্যর্থ তাহা তিনি জানেন—এ সমস্ত ছাড়িয়া আনন্দের সন্ধান করা উচিত বুদ্ধির বলে তাহাও বুঝিতে পারেন—কিন্তু অভ্যাসের গণ্ডী তাঁহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আচার ও আনন্দ, অভ্যাস ও সহজ স্ফূর্তি, গ্রীষ্মের ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা ও নববর্ষার উদার স্নিগ্ধতার মধ্যে তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত। তাঁহার চরিত্রে ট্র্যাজেডির উপকরণ কিছু কিছু আছে। একদিকে তিনি মহাপঞ্চকের নিঃসংশয় সংকীর্ণতাকে ঈর্ষা করেন, আর একদিকে পঞ্চকের অকুতোভয় উদ্দামতাকে কামনা করেন।

আচার্য জানেন গ্রীষ্মের পরে বর্ষা অবশ্যই আসিবে—কিন্তু কেমন করিয়া আসিবে, কবে আসিবে জানেন না—শুষ্ক অচলায়তন ও শুষ্কতর হৃদয়ের উপরে নববর্ষা-সমাগমের আশায় তিনি অধীর উন্মুখ হইয়া আছেন।

আচার্য ব্রহ্মচারীদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:

'জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে? অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।'

এই কাতরোক্তিতে আছে বর্ষার আহ্বান, নূতন প্রাণের সরস বর্ষার আহ্বান। গুরু যখন আসিলেন তিনি একাধারে বাহিরের বর্ষা ও মনের বর্ষণ সঙ্গে করিয়াই আসিলেন। তাঁহার আগমনে অচলায়তন স্নিগ্ধ হইল—মন সরস হইল; বাহিরের বর্ষা ও রসের বর্ষণ পরস্পরের পরিপূরক হইয়া নূতন অর্থ লাভ করিল।

অচলায়তনের শুষ্কতার মধ্যে যুবক পঞ্চক নববর্ষার দূত। আয়তনের হৃদয়হীন মূঢ়তা তাহাকে নীরস করিয়া ফেলে নাই—আচারের অত্যাচার হইতে সে যে শুধু নিজেকে রক্ষা করিয়াছে তাহা নয়, অপর সকলকেও ইহার বিরুদ্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছে। রসের অভাবে আচার্যের হৃদয় যখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে পঞ্চক তখন নববর্ষার আহ্বান ধ্বনিত করিয়া ফিরিতেছে:

'তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা—আয় রে নবীন কিশলয়—তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শুনছ না, আকাশের ঘননীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে, আজ নৃত্য কর্ রে নৃত্য কর্।'

অচলায়তনিকদের মধ্যে একমাত্র পঞ্চকই জানে যে বর্ষাতেই মুক্তি, রসের বর্ষণেই অচলায়তনের শুষ্কতা দূর হইবে—এবং সে বর্ষা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। দাদাঠাকুরের সঙ্গে আলাপ উপলক্ষ্যে পঞ্চক বলিতেছে:

'ঠাকুর, আমি তো সেই বর্ষণের জন্যে তাকিয়ে আছি। যতদূর শুকোবার তা শুকিয়েছে, কোথাও একটু সবুজ আর কিছু বাকি নেই, এইবার তো সময় হয়েছে—মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে গুরু গুরু ডাক শুনতে পাচ্ছি। বুঝি এবার ঘননীল মেঘে তপ্ত আকাশ জুড়িয়ে যাবে, ভরে যাবে।'

এই যে শুষ্কতা তাহা কেবল গ্রীষ্মের নয়, রসাভাবকেই অচলায়তন সিদ্ধি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; এই যে বর্ষা তাহা কেবল ঋতুবিশেষের নয়, তাহা মনের, যে লক্ষ্যের দিকে অভিচালিত করিবার জন্য গুরুর আগমন আসন্ন; পঞ্চক সহজাত বুদ্ধির বলেই জানে যে সরসতাতেই মুক্তি, আনন্দই লক্ষ্য।

গ্রীষ্মের তাপ যখন চরমে ওঠে তখন বর্ষণ নামে। অচলায়তনের শুষ্কতা যখন এতদূর হইয়াছে যে বিনা দোষে বালক সুভদ্রকে কঠোর প্রায়শ্চিত্তের আসনে বসাইতে উদ্যত; চণ্ডক নামে শোণপাংশু যুবককে তপস্যা করিবার অপরাধে অচলায়তনের রাজা নিহত করিলেন, তখনই বর্ষণ নামিল। গুরু অচলায়তনে আসিলেন—সঙ্গে বর্ষণ আসিল, বাহিরে বর্ষাঋতু, মনে রসের বর্ষণ; মনে মুক্তির উদার গম্ভীর মেঘগর্জন।

আচার্য ও পঞ্চক দর্ভকপল্লীতে নির্বাসিত। এ দিকে অচলায়তনে গুরু প্রবেশ করিয়াছেন। গুরুর আগমন ও বর্ষার অবতরণ—পঞ্চক ও আচার্যের মনে একার্থক।

'পঞ্চক। আঃ দেখতে দেখতে কী মেঘ করে এল। শুনছ আচার্যদেব, বজ্রের পরে বজ্র। আকাশকে একেবারে দিকে দিকে দগ্ধ করে দিলে যে।

আচার্য। ঐ যে নেমে এল বৃষ্টি—পৃথিবীর কতদিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি—অরণ্যের কত রাতের স্বপন-দেখা বৃষ্টি।

পঞ্চক। মিটল এবার মাটির তৃষ্ণা—এই যে কালো মাটি—এই যে সকলের পায়ের নিচেকার মাটি।'

গুরু আচার্যের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য দর্ভকপল্লীতে আসিয়াছেন। আচার্য তাঁহাকে বলিলেন :

'আচার্য। বাঁচালে প্রভু, আমাকে রক্ষা করলে। আমার সমস্ত চিত্ত শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে—আমাকে আমারই এই পাথরের বেড়া থেকে বের করে আনো। আমি কোনো সম্পদ চাইনে—আমাকে একটু রস দাও।

দাদাঠাকুর। ভাবনা নেই আচার্য, ভাবনা নেই—আনন্দের বর্ষা নেমে এসেছে—তার ঝর্‌ঝর্ শব্দে মন নৃত্য করছে আমার। বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখতে পাবে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপছে কারা? এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জনে আনন্দ। আজ মাথার উষ্ণীষ যদি উড়ে যায় তো উড়ে যাক, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো ভিজে যাক—আজ দুর্যোগ একে বলে কে। আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক না—আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।'

বর্ষায় তো মুক্তি আসিল—কিন্তু অচলায়তনের কি ব্যবস্থা করিলেন? তিনি মহাপঞ্চককে বিদায় দিলেন না—কেবল পঞ্চককে আয়তনের আচার্য করিয়া দিলেন। মহাপঞ্চক জীবনের কঠোরতার প্রতীক—পঞ্চক প্রতীক রসের; জীবনের পক্ষে দুটিরই প্রয়োজন সমান। আবার মহাপঞ্চক ও পঞ্চক সহোদর ভ্রাতা। এই সম্বন্ধের দ্বারা কবি বলিতে চান যে কঠোরতা ও সরসতার মধ্যে সত্যকার বিরুদ্ধতা নাই। বরঞ্চ প্রচ্ছন্ন প্রেমের সম্বন্ধই আছে, নাড়ীর যোগ আছে; কেবল দৃষ্টিদোষের জন্যই তাহাদের পরস্পর-বিরোধী মনে হয়, এবং দৃষ্টির অস্বাভাবিকতা ঘুচিয়া গেলে তাহাদের সহোদরত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে। অচলায়তনিকরা রসের দিকটা একেবারে

উপেক্ষা করিয়া কঠোরতার সাধনায় হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছে—সাধনার এই হেরফের ঘুচাইবার জন্যই গুরুর আবির্ভাব। গ্রীষ্মকালের খরতাপে এই নাটকের আরম্ভ, নববর্ষার স্নিগ্ধতায় ইহার অবসান; গ্রীষ্ম ও বর্ষা, কঠোরতা ও সরসতা, মহাপঞ্চক ও পঞ্চক মিলিয়া মানবজীবনের সাধনার পরিপূর্ণ রূপ।

বর্ষা-শরৎ: বিসর্জন

বিসর্জন বর্ষাকালের নাটক—কেবল তাহার নাটকীয়তার চূড়ান্ত শ্রাবণের শেষরাত্রে, বর্ষাকালের শেষরাত্রে ঘটিয়াছে; পরের দিন অর্থাৎ শরতের প্রথমে ইহার অবসান।

বিসর্জনের মতো মানবহৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ নাটকে বর্ষার লীলা-প্রকাশের অবসর অত্যন্ত অল্প—যেটুকু বা আছে তাহাও যেন কবি তেমন-ভাবে গ্রহণ করেন নাই। জয়সিংহের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব বর্ষার মেঘাড়ম্বরে, অবিশ্রাম বর্ষণে, বিদ্যুৎ-চমকে, বজ্রাঘাতে ও গর্জনের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার সুযোগ ছিল। জয়সিংহের হৃদয়ের সরসতা ও আবেগ বর্ষার স্নিগ্ধতা ও শ্যামশ্রীর দোসর। বিসর্জন নাটকে কবি এই সুযোগ গ্রহণ না করিলেও রাজর্ষি উপন্যাসে করিয়াছেন:

'তাঁহার [জয়সিংহের] আরো সঙ্গী ছিল। মন্দিরের বাগানের অনেকগুলি গাছকে তিনি নিজের হাতে মানুষ করিয়াছেন, তাঁহার চারিদিকে প্রতিদিন তাঁহার গাছগুলি বাড়িতেছে, লতাগুলি জড়াইতেছে, শাখা পুষ্পিত হইতেছে, ছায়া বিস্তৃত হইতেছে, শ্যাম বল্লরীর পল্লব-স্তবকে যৌবনগর্বে নিকুঞ্জ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জয়সিংহের এসকল প্রাণের কথা, ভালোবাসার কথা বড়ো কেহ একটা জানিত না; তাঁহার বিপুল বল ও সাহসের জন্যই তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

মন্দিরের কাজকর্ম শেষ করিয়া জয়সিংহ তাঁহার কুটিরের দ্বারে বসিয়া আছেন। সম্মুখে মন্দিরের কানন। বিকাল হইয়া আসিয়াছে। অত্যন্ত ঘন মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। নববর্ষার জলে জয়সিংহেব গাছগুলি স্নান করিতেছে, বৃষ্টিবিন্দুর নৃত্যে পাতায় পাতায় উৎসব পড়িয়া গিয়াছে, বর্ষাজলের ছোটো ছোটো শত শত প্রবাহ ঘোলা হইয়া কলকল করিয়া গোমতী নদীতে

গিয়া পড়িতেছে—জয়সিংহ পরমানন্দে তাঁহার কাননের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে মেঘের স্নিগ্ধ অন্ধকার, বনের ছায়া, ঘনপল্লবের শ্যামশ্রী, ভেকের কোলাহল, বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ঝরঝর শব্দ—কাননের মধ্যে এইরূপ নববর্ষার ঘোরঘটা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ জুড়াইয়া যাইতেছে।'[১]

বিসর্জন নাটকে এসব কিছুই নাই—বোধকরি নাটকে ইহার স্থানও নাই; রাজর্ষির জয়সিংহের প্রকৃতি-প্রীতি বিসর্জনে অপর্ণার প্রতি প্রেমে রূপান্তরিত হইয়াছে; রাজর্ষির প্রকৃতি বিসর্জনের অপর্ণা।

ধ্রুবকে হত্যা-চেষ্টার অপরাধে রঘুপতির নির্বাসনদণ্ড হইয়াছে—তখন রঘুপতি রাজাকে বলিলেন :

আমি বিপ্র তুমি শূদ্র, তবু জোড়করে
নতজানু আজ আমি প্রার্থনা করিব
তোমা কাছে, দুইদিন দাও অবসর
শ্রাবণের শেষ দুইদিন। তার পরে
শরতের প্রথম প্রত্যূষে, চলে যাব
তোমার এ অভিশপ্ত দগ্ধ রাজ্য ছেড়ে,
আর ফিরাব না মুখ।

বিসর্জন নাটকে শ্রাবণের এই শেষ দুইদিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রাবণের শেষরাত্রে, বর্ষার অন্তিম প্রহরের অন্ধকারে ঝড়বৃষ্টি হইতেছে; মন্দিরে রঘুপতি জয়সিংহের জন্য উদ্‌গ্রীবভাবে অপেক্ষা করিতেছেন—জয়সিংহ রাজরক্ত আনিতে গিয়াছে। এখানে রঘুপতির অন্তরে যে ঝড় বহিতেছে বাহিরের ঝড় তাহার অনুরূপ, আবার বর্ষার অন্তিম প্রহর যেমন ঝড়ে জলে আপনাকে একেবারে নিঃশেষ করিয়া দিতে কৃতসংকল্প, তেমনি জয়সিংহের এতদিনের দ্বন্দ্বেরও আজ অবসান হইয়াছে—সে রাজরক্ত উপলক্ষ্যে নিজের রক্তপাত করিতে কৃতসংকল্প।

রাত্রির বিষম দুর্যোগে রঘুপতি জাগ্রতা দেবীর তাণ্ডব দেখিতেছেন—নিজের বলি সংগ্রহ করিবার জন্য যেন তিনি জাগিয়া উঠিয়াছেন।

এতদিনে, আজ বুঝি জাগিয়াছে দেবী।
ওই রোষ-হুহুংকার। অভিশাপ হাঁকি
নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছে

---

১ রাজর্ষি, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তিমিররূপিণী। ওরা ওই বুঝি তোর
প্রলয়-সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্ব-মহাতরু

জয়সিংহ আত্মরক্তদান করিলেন। জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতির চৈতন্য হইল; রক্তপানপুষ্ট মূঢ় দেবীপ্রতিমাকে গোমতীর জলে নিক্ষেপ করিল।

পরদিন শরতের প্রথম দিবসটি নাটকের শেষ দিন। গুণবতী দেবী বলি লইয়া প্রবেশ করিলেন, তিনি দেবীকে পাইলেন না, কিন্তু স্বামীকে নূতন করিয়া লাভ করিলেন, গোবিন্দমাণিক্যও সেই সময়ে পূজার্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রঘুপতির জয়সিংহকে আর পাইবার উপায় নাই বটে, তিনি অপর্ণার মধ্যে নূতন করিয়া জয়সিংহকে পাইলেন। যে-শরতের প্রথম প্রত্যূষে রঘুপতির অভিশপ্ত দগ্ধরাজ্য ছাড়িয়া যাইবার কথা ছিল, সেই প্রত্যূষে রক্তপিপাসু দেবীই এই রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। শরৎকাল দেবীর, যিনি সকলের মাতা, আগমনের সময়, কবি শরতের প্রথম প্রত্যূষটির উপরে জোর দিয়া, এই দিনটিকেই নাটকের চূড়ান্ত করিয়া, ইহাই যেন বলিতে চান যে, এতদিন পরে জীবজননীর আগমন হইল, এবং তাঁহার আগমনের পূর্বেই শ্রাবণের শেষ দুর্যোগের মধ্যে জীবরক্তপায়ী যে পাষাণকে লোকে মাতা বলিয়া মনে করিত, সে ত্রস্তভাবে পলায়ন করিল।

শরৎপ্রারম্ভ: শারদোৎসব, ঋণশোধ

শারদোৎসব ও তাহার রূপান্তর ঋণশোধ শরৎকালের নাটক। সে শরৎও আবার শরতের প্রারম্ভ, শেষ নয়। শরৎ একসঙ্গে আগমনী ও বিজয়ার কাল, আনন্দের ও বিষাদের। এই দুইখানি নাটকে শরৎপ্রারম্ভের আগমনীর আনন্দের সুর—শরৎশেষের বিজয়ার বিষাদের সুর আছে ডাকঘর নাটকে, যদিচ ইহাও শরৎকালেরই নাটক।

শারদোৎসব-ঋণশোধে কবির প্রধান বক্তব্য এই যে, জগতের কাছে আমরা সর্বদা প্রেমের ঋণ বহন করিতেছি, শরৎকালে সেই ঋণশোধের পালা; শরতের প্রকৃতির মধ্যে কবি ঋণশোধের সেই ছবি দেখিতে পাইয়াছেন। অন্তরে এই ঋণশোধের ভাবটি জাগ্রত করিতে হইলে আগে বাহিরে শরতের সঙ্গে রঙে ও ভাবে এক হইতে হইবে—তবেই ভিতরে বাহিরে সত্য একাত্মকতা স্থাপিত হইবে।

'বিজয়াদিত্য। মন্ত্রীর মনে এই বড়ো ক্ষোভ যে, রাজত্ব পাবার যে পিতৃঋণ, সে শোধ করার জন্যে আমার মন নেই।

শেখর। আমার মস্ত দোষ এই যে, আমি কেবল স্মরণ করাই, এই যে বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।

বিজয়াদিত্য। অমৃতের বদলে অমৃত দিয়ে তবে তো সেই ঋণ শোধ করতে হয়। তোমার হাতে সেই শক্তি আছে। তোমার কবিতার ভিতর দিয়ে তুমি বিশ্বকে অমৃত ফিরিয়ে দিচ্ছ। কিন্তু আমার কী ক্ষমতা আছে, বলো। আমি তো একমাত্র রাজত্ব করি।

শেখর। প্রেমও যে অমৃত, মহারাজ। আজ সকালের সোনার আলোয় পাতায় পাতায় শিশির যখন বীণার ঝংকারের মতো ঝলমল করে উঠল, তখন সেই সুরের জবাবটি ভালোবাসার আনন্দ ছাড়া আর কিছুতে নেই। আমার কথা যদি বলেন সেই আনন্দ আজ আমার চিত্তে অসীম বিরহবেদনায় উপচে পড়ছে।' [১]

সম্রাট বিজয়াদিত্য সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে রাজত্বের পিতৃঋণ শোধ করিবার জন্য রাজ্যের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন।

তিনি দেখিতে পাইলেন, এই ঋণশোধ-ব্যাপারে কেবল তিনিই পিছাইয়া ছিলেন—প্রকৃতি ও মানুষ প্রতিমুহূর্তে প্রেমের ঋণশোধ করিতে কতই না কষ্ট সহ্য করিতেছে।

'সন্ন্যাসী। ওকে [উপনন্দকে] সবাই ভালোবাসে, কেননা ও যে দুঃখের শোভায় সুন্দর।

শেখর। ঠাকুর, যদি তাকিয়ে দেখ তবে দেখবে, সব সুন্দরই দুঃখের শোভায় সুন্দর। এই যে ধানের খেত আজ সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে এর শিকড়ে শিকড়ে পাতায় পাতায় ত্যাগ। মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া থেকে যা-কিছু ও পেয়েছে সমস্তই আপন প্রাণের ভিতর দিয়ে একেবারে নিংড়ে নিয়ে মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে উৎসর্গ করে দিলে। তাই তো চোখ জুড়িয়ে গেল।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ উদাসী, প্রেমের আনন্দে উপনন্দ দুঃখের ভিতর দিয়ে জীবনের ভরা খেতের ফসল ফলিয়ে তুললে।' [২]

---

১ ঋণশোধের ভূমিকা।

২ ঋণশোধ।

উপনন্দও প্রেমের ঋণশোধ করিতেছে। তাহার গুরু বীণকার স্বরসেন লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণ রাখিয়া মারা গিয়াছেন—উপনন্দ স্বেচ্ছায়, সানন্দে, ছুটির আনন্দে-ভরা শরৎকালে প্রেমের ঋণের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইয়া পুঁথি নকল করিয়া ঋণশোধ করিতে উদ্যত।

'ঠাকুরদা। হায় হায়, তোমার মতো কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণশোধ করতে হয়। আর এমন দিনেও ঋণশোধ।...

সন্ন্যাসী। বল কি, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে? ওই ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখো তো! লেখো, লেখো বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি! তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ—তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ্ড করতে পারব না।' [১]

উপনন্দ সুন্দর, কেননা সে প্রেমের দুঃখ বহন করিতেছে; শরৎকালও যেমন ঋণশোধ করিতেছে, উপনন্দও তেমনি ঋণশোধে ব্যস্ত, প্রকৃতি ও মানুষের জীবনে একই ভাবের অনুবর্তন চলিতেছে।

শরতের ঋণশোধের ভাবটি জীবনের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইলে মিলনটা বাহির হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

'সন্ন্যাসী। বাবা, আজ যে তোমাদের সব সোনার রঙের কাপড় পরতে হবে।

ছেলেরা। সোনার রঙের কাপড় কেন ঠাকুর?

সন্ন্যাসী। বাইরে যে আজ সোনা ঢেলে দিয়েছে। তারই সঙ্গে আমাদেরও আজ অন্তরে বাইরে মিলে যেতে হবে তো—নইলে এই শরতের উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারব কি করে? আজ এই আলোর সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিলব বলেই তো উৎসব।' [২]

এ তো গেল কেবল বাহিরের মিল। ভিতরের মিল কি করিয়া হইবে? কবির দৃষ্টিতে শরতের মধ্যে একটা আসক্তিহীন উদার অকিঞ্চনতার ভাব আছে—এই ভাবটি মনের মধ্যে লাভ করিলে শরতের সঙ্গে অন্তরের একাত্মতা ঘটিবে।

১ শারৎদোসব।

২ শারদোৎসব।

'মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের মেঘ যে হাল্কা, তার কোনো প্রয়োজন নেই, তার জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী।

রাজা। একথা সত্য বটে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের শিউলিফুলের মধ্যে যেন কোনো আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে তেমনি সে ঝরে পড়ে।

রাজা। একথা মানতে হয়।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের কাশের স্তবক না বাগানের না বনের; সে হেলাফেলায় মাঠে ঘাটে নিজের অকিঞ্চনতার ঐশ্বর্য বিস্তার করে বেড়াচ্ছে। সে সন্ন্যাসী।

রাজা। একথা কবি বেশ বলেছে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরতে কাঁচা ধানের যে খেত দেখি, কেবল আছে তার রঙ, কেবল আছে তার দোলা। আর কোনো দায় যদি থাকে সেকথা সে একেবারে লুকিয়েছে।

রাজা। ঠিক কথা।

মন্ত্রী। তাই কবি বলেন, তাঁর শারদোৎসবের যে পালা সে ঐ রকমই হাল্কা, সে ঐ রকমই নিরর্থক। সে-পালায় কাজের কথা নেই, সে-পালায় আছে ছুটির খুশি।

রাজা। বাঃ এ তো মন্দ শোনাচ্ছে না। ওর মধ্যে রাজা কেউ আছে?

মন্ত্রী। একজন আছেন। কিন্তু তিনি কিছুদিনের জন্যে রাজত্ব থেকে ছুটি নিয়ে সন্ন্যাসীবেশে মাঠে ঘাটে বিনা কাজে দিন কাটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। বাঃ বাঃ, শুনে লোভ হয় যে। আর কে আছে?

মন্ত্রী। আর আছে সব ছেলের দল।

রাজা। ছেলের দল? তাদের নিয়ে কী হবে?

মন্ত্রী। কবি বলেন, ঐ ছেলেদের প্রাণের মধ্যেই তো আসল ছুটির চেহারা। তারা কাঁচা ধানের খেতের মতোই নিজে না জেনে, কাউকে না জানিয়ে, ছুটির ভিতরেই ফসলের আয়োজন করছে।' [১]

উপরের উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে, শরতের অন্তর্গত ভাবটি কি, এবং কেন সম্রাট্ বিজয়াদিত্য সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন। 'রাজা হ'তে গেলে সন্ন্যাসী

১ শারদোৎসবের ভূমিকা।

হওয়া চাই।' বিজয়াদিত্য রাজ্যকে যথার্থভাবে লাভ করিবার জন্যই সন্ন্যাসী হইয়াছেন। শুধু মানুষ রাজা নয়, ঋতুরাজ বসন্তও রবীন্দ্রনাথের মতে সন্ন্যাসী, সে বৈরাগী। সত্য কথা কি, রাজসন্ন্যাসীই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ রাজা।

শারদোৎসবে ছেলের দলের তাৎপর্য কি তাহাও এই অংশে আছে; এবং এত সম্রাট্ ও রাজা থাকিতে উপনন্দের মতো একটি বালক মাত্র ইহার নায়ক কেন তাহাও বোধ করি আর অস্পষ্ট নাই।

শরতের মধ্যে যে 'ছুটির খুশি'র কথা কবি বলিয়াছেন তাহার সঙ্গে সত্যকার কাজের কোনো বিরোধ নাই—কারণ, প্রেমের ঋণশোধ করিবার জন্য উপনন্দ যেমন পংক্তির পর পংক্তি লিখিতেছে অমনি ছুটির পর ছুটি পাইতেছে।

এই ছুটির খুশিতেই বিজয়াদিত্য সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়াছেন; কবিশেখর কিসের যেন সন্ধানে বহির্গত; ছেলের দল ঠাকুরদাকে লইয়া বেতসিনীর তীরে বাহির হইয়াছে; উপনন্দ গুরুর ঋণশোধে বাহির হইয়াছে; রাজা সোমপালের দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পড়িতে ইচ্ছা যায়; লক্ষেশ্বর-পুত্র ধনপতির নামতা ছাড়িয়া বেতসিনীর ধারে বেড়াইতে যাইতে ইচ্ছা করে; এমন কি লক্ষেশ্বরেরও এক-একবার বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাহির হইয়া পড়িতে মন ব্যাকুল হইয়া ওঠে।

শরৎশেষ ঃ ডাকঘর

ডাকঘর নাটকের ঘটনার সময় শরৎকাল, ইহাকে শরৎশেষ বা হেমন্তের প্রারম্ভ বলিয়াছি। ইহার ঘটনার সময় যে শরৎ তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাটকের মধ্যেই আছে—কিন্তু শরতের শেষভাগ এমন উল্লেখ নাই, আমার অনুমান মাত্র।

ডাকঘর নাটক বারংবার পড়িয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, শারদোৎসবের শরতের সঙ্গে কেমন যেন ইহার শরতের প্রভেদ আছে। শারদোৎসব শরৎ-প্রারম্ভের, ডাকঘর শরৎশেষের। যদি ইহা শরৎপ্রারম্ভের হইত, তবে ইহাতে পূজার উল্লেখ থাকিত—সে উল্লেখের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। ইহার স্বল্প কথোপকথনে, ঘটনার বিরলতায়, রোগীর পাণ্ডুমুখচ্ছবিতে, বর্ণনীয় বস্তুর স্বচ্ছতায় পাঠককে, আমাকে অন্তত, হেমন্তের আবহাওয়াকে মনে করাইয়া দেয়—

'দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে সকলেরই যখন খাওয়া হয়ে যায়, পিসেমশায় কোথায় কাজ করতে বেরিয়ে যান, পিসিমা রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, আমাদের খুদে কুকুরটা উঠোনের ঐ কোণের ছায়ায় ল্যাজের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমোতে থাকে—তখন তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং—ঢং ঢং ঢং!'

আবার :

'দুপুরবেলা যখন রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করে, তখন ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং—'

আবার :

'আকাশে খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়—তেমনি ঐ রাস্তার মোড় থেকে ঐ গাছের সারের মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল—কী জানি কী মনে হচ্ছিল।'

পুনরায় :

'আমাদের জানালার কাছে বসে সেই যে দূরে পাহাড় দেখা যায়, আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই।'

এই কথাগুলিতে এবং সমস্ত বইখানিতে অস্পষ্ট একটা হেমন্তের আভাস আছে। বিশেষ, ডাকঘরের বিষাদের সঙ্গে বিজয়ার বিষাদের একটা সাদৃশ্য অনুভূত হয়, আর আগমনীর আনন্দ যদি শরৎপ্রারম্ভের হয়, বাকি সমস্ত ঋতুটা বিজয়ার বিষাদের অশ্রুচ্ছায়ায় পরিম্লান।

'শরতের মধ্যে একটা ব্যাকুলতার ভাব আছে; মনটাকে অভ্যস্ত ঘরের গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া অনির্দিষ্ট দূরত্বের দিকে অভিক্ষেপ করিয়া দেয়। 'আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়।' কী চায় নিজেই সে জানে না। অমল জানে না সে কী চায়—কেবল একটা পরম ব্যাকুলতার ভাব তাহাকে উন্মনা করিয়া দিয়াছে। দইওয়ালার ডাক শুনিলে তাহার মন উদাস হইয়া যায়, পাহারাওয়ালার হাঁক শুনিলে তাহার মন উদাস হইয়া যায়, পথে পথিক দেখিলে তাহার নিরুদ্দেশের মুখে বাহির হইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে; এত কাজ থাকিতে ডাকঘরের কাজটি তাহার পছন্দ—যাহার কাজই হইতেছে কেবল পথে পথে চলিয়া বেড়ানো; নীল আকাশ দেখিয়া তাহার মনে হয়, সে হাত তুলিয়া তাহাকে ডাকিতেছে; ঠাকুরদার সঙ্গে সে ক্রৌঞ্চদ্বীপে, হাল্কা জিনিসের দ্বীপে, না জানি কোন্ সমুদ্রের তীরে চলিয়া যাইতে চায়। বিশিষ্ট কোনো স্থান তার লক্ষ্য নয়—সেটা

উপলক্ষ্যমাত্র; চলিয়া যাওয়াটাই তাহার লক্ষ্য। মনের এই ব্যাকুলতার ভাব, মানবচিত্তের এই চিরন্তনী ব্যাকুলতা শরতের মধ্যে আছে।

প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাহাকে চলিতেই হইবে, তাই শরতের হাসিকান্না কেবল আমাদের প্রাণপ্রবাহের উপর ঝিকিমিকি করিতে থাকে, ...তাই দেখি শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবলি চলি চলি করে।'...[১]

অমল মানুষের মনের সেই চলি-চলি ভাব; ঋতুর ব্যক্তিত্ব ও মানুষের ব্যক্তিত্ব এক হইয়া গিয়াছে।

একটি লক্ষ্য করিবার ব্যাপার আছে। রবীন্দ্রনাথের দুইখানি শরৎ-সম্বন্ধীয় নাটকেই নায়ক দুটি বালক, উপনন্দ ও অমল। কেন এমন হইল? শরতের সঙ্গে শৈশবের কি কোনো মিল আছে?

'আমার কাছে আমাদের শরৎ শিশুর মূর্তি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে।

তার কাঁচা দেহখানি; সকালে শিউলিফুলের গন্ধটি সেই কচি গায়ের গন্ধের মতো।...

শরতের রংটি প্রাণের রং।...এইজন্য শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে। ... বলিতেছিলাম শরতের মধ্যে শিশুর ভাব।...ছেলেদের হাসি-কান্না প্রাণের জিনিস, হৃদয়ের জিনিস নহে। প্রাণ জিনিসটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে, তাতে মাল বোঝাই নাই... ।'[২]

কবির মনে শরৎ ও শিশুর ভাব জড়িত হইয়া গিয়াছে; কবির কাছে শরৎ শিশু, আবার শিশু শরৎ। কাজেই শরৎকালের নাটক লিখিবার সময়ে স্বভাবতই কবি দুটি বালককে নায়ক করিয়াছেন—যাহাদের শৈশব এখনো ভালো করিয়া কাটে নাই।

শরতের চলি-চলি ভাবটা বয়স্ক মানুষের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা পড়ে না, কারণ শিক্ষা, সংস্কার ও সংসারের দায়িত্বে তাহার মনের উপর একটা স্থূল আবরণ পড়িয়া গিয়াছে—বালকের স্থূলহস্তাবলেপহীন মনে সেইজন্যই এই 'চলি-চলি'র বিশুদ্ধ রূপটি চোখে পড়ে।

---

১ 'শরৎ', 'পরিচয়'।

২ 'শরৎ', 'পরিচয়'।

শীতকাল : রক্তকরবী

রক্তকরবী শীতকালের নাটক। ইহার পুরোভূমিকায় যক্ষপুরী, পটভূমিকায় ফসল-কাটার মাঠ; যক্ষপুরীর বীভৎস গর্জনকে ছাপাইয়া মাঝে মাঝে ফসল কাটার গান কানে আসে—আর এই দুই ভূমিকার মধ্যে সেতুবন্ধের ব্যর্থ প্রচেষ্টা নন্দিনীর।

আগের কয়খানি নাটকে ঋতুর ভাবে ও মানুষের ভাবে যেমন মিল রক্তকরবীতে তেমনি অমিলটি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ; এখানে ঋতুর ভাবে ও মানুষের ভাবে দ্বন্দ্বটাই দেখানো হইয়াছে; এই দুই বিপরীত শক্তিকে, মাঠ ও খনি, ফসল কাটা ও খনি খোদাই, গর্জন ও সঙ্গীত, রঞ্জন ও রাজা, প্রেমের লীলা ও প্রাণের প্রচণ্ডতাকে দুই হাতে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে গিয়া নন্দিনী পিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যক্ষপুরীর খনিখোদাই শব্দে একটু ছেদ পড়িলেই দূর হইতে শোনা যায় :

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে
আয়, আয়, আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে
মরি হায়, হায়, হায়।

এই গানটিই, এই ভাবটিই রক্তকরবী নাটকের পটভূমি-সংগীত, কখনো তাহা শোনা যায়, কখনো যায় না, কিন্তু নাটকের পটভূমিতে নিরন্তর ইহা নিঃশব্দে ধ্বনিত হইতেছে।

ঋতুর ও মানুষের দ্বন্দ্বটাই নাটকের লক্ষ্য করিবার মতো, শীতকাল ফসল কাটার সময়—আবার তাহা খোদাই কাজের পক্ষেও প্রশস্ত; একদিকে নবান্নের পরিপূর্ণ আহ্বান, আর একদিকে ধ্বজাপূজার মদিরাপিচ্ছিল বীভৎসতা; একদিকে মাটির তলাকার মৃত সোনা, আর একদিকে সোনার রঙের ফসল; একদিকে যক্ষপুরীর জালে বিধৃত প্রাণের প্রচণ্ডতা, অন্যদিকে নির্বাধ প্রান্তরের অনায়াস উদারতার মধ্যে প্রেমের লীলা; রাজা ও রঞ্জন; —অথচ রহস্য এই যে, রাজা ও রঞ্জন উভয়েই এক ধাতুতে গড়া, আর উভয়ে এক ধাতুতে গড়া বলিয়াই দুজনেরই প্রতি নন্দিনীর আকর্ষণ।

নাটকটির মূলে একটা দ্বন্দ্ব আছে এবং সেই দ্বন্দ্বের আলোড়নে নন্দিনীর মন্থরকাতর প্রেম ব্যথায় রক্তিম হইয়া রক্তকরবী রূপে ফুটিয়া উঠিয়া ফাটিয়া পড়িয়াছে।

বসন্ত : রাজা ও রানী, রাজা, ফাল্গুনী, তপতী

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ রাজার মতো ঋতুরাজ বসন্ত সন্ন্যাসী ; বাহিরে তাহার ঐশ্বর্য, অন্তরে তাহার বৈরাগ্য ; 'অন্তরে তাহার বৈরাগী গায়' ; যে কেবল বাহিরের সম্পদে মুগ্ধ হইল সে কিছুই দেখিল না ; যে ভিতরের উদাসীকে দেখিল, সে-ই দেখিল। কিন্তু বসন্তের এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের মনে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। যে-বয়সে তিনি রাজা ও রানী লিখিতেছিলেন তখন বসন্তের ভিতর-বাহিরের দ্বন্দ্ব তাঁহার কাছে স্পষ্টভাবে ধরা দেয় নাই, অর্ধগোচরভাবে অবশ্যই ছিল।

বিক্রমদেব ও সুমিত্রার সম্বন্ধের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে, বিক্রমদেবের প্রচণ্ড আসক্তিই সুমিত্রাকে পাইবার পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তার কারণ, বিক্রমদেব বসন্তের বাহিরটাকে কেবল দেখিয়াছেন, সেখানে ঐশ্বর্য এবং ভোগরতি, অন্তরে যেখানে বৈরাগ্য ও আসক্তিহীনতা সেখানে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই ; তিনি প্রেমের বিলাসকেই দেখিয়াছেন, প্রেমের আত্ম-বিসর্জনপরতাকে দেখেন নাই ; কাজেই তিনি প্রেমে তৃপ্তি পান নাই, সুমিত্রাকে পাইয়াও পান নাই ; বিক্রমদেবের প্রচণ্ড আসক্তিই ঢেউ তুলিয়া আকাঙ্ক্ষিত পদ্মটিকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে। এই নাটকে বসন্তের ভাবটি কবির কাছে অর্ধগোচর ; সচেতন ভাবে প্রত্যক্ষ নয়।

রাজা ও রানীর রূপান্তর তপতী সুপরিণত বয়সে লেখা, তখন কবির মনে ঋতুর ভাবের ক্রমবিকাশ স্পষ্টরূপ ধরিয়াছে, কাজেই রাজা ও রানীর চেয়ে তপতীতে বসন্তের আইডিয়াটি পরিণততর ; সত্য কথা বলিতে কি, তপতীর কাহিনী আইডিয়াটির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

কবি লিখিয়াছেন :

'সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটেই রাজা ও রানীর মূল কথা।

'রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি

ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—এই মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।' [১]

রচনার দোষে ভাবটি পরিস্ফুট হয় নাই ইহা সত্য নয়, ভাবটি পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়াই রচনার দোষ হইয়াছে। মানব-জীবন ও বসন্তের মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবে যে ঐক্য আছে তাহা স্পষ্টভাবে ধরিতে পারিলে নাটকের ঘটনাস্রোত স্বাভাবিক পরিণামের দিকেই যাইত—অযথা কুমার ও ইলার প্রেম-কাহিনীর অসংগতির মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিত না। তপতীতে এই দোষ কবি শুধরাইয়া লইয়াছেন; ভাবটি পরিস্ফুট হওয়াতে রচনা অন্তত এই দোষপরিমুক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রাজা এবং ফাল্গুনীতে বসন্তের আইডিয়াটি পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, এবং কবিজীবনের শেষ পর্যন্ত সেই আইডিয়ার কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই।

রাজা

রাজা নাটককে বসন্তোৎসব নাম দেওয়া চলিতে পারে। বসন্তের সত্যকার রূপটি কি? শারদোৎসবে দেখিয়াছি কবি বলিয়াছেন, 'রাজা হ'তে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।' শরতের মধ্যে সন্নাসের ভাব যদি থাকে তবে ঋতুরাজ বসন্ত একেবারে সন্ন্যাসী—সে রাজসন্ন্যাসী; তাহার যা-কিছু ঐশ্বর্য তাহা বাহিরে, অন্তরে সে ত্যাগের মহিমায় অকিঞ্চন। বসন্ত সম্বন্ধে ইহাই রবীন্দ্রনাথের পরিণত ধারণা; পরবর্তী নাটকে কাব্যে সংগীতে এই ধারণাই পরিণতি লাভ করিয়াছে, আর পরিবর্তিত হয় নাই।

এই নাটকে দুটি রাজা আছেন, এক রাজা যাঁহার নাম অনুসারে বইখানির নামকরণ, দ্বিতীয় ঋতুর রাজা বসন্ত। দুজনের মধ্যেই কবি ভাবের ঐক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। ঋতুরাজের অনন্ত ঐশ্বর্য, কিন্তু অন্তরে তাহার রিক্তসম্পদ্ সন্ন্যাস। অপর রাজারও বাহিরে অনন্ত রূপ, অসংখ্য মূর্তি, ঐশ্বর্যের অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরের অন্ধকার ঘরের মধ্যে তিনি একক, রূপহীন, তিনি অরূপরতন।

১ তপতী, ভূমিকা।

এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ
ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।
সে যে উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে
ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে
দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।

যে এই বসন্তকে সত্যভাবে দেখিতে পাইয়াছে সে একই সঙ্গে বাহিরের উজ্জ্বল সাজ ও অন্তরের বৈরাগীর গেরুয়া দেখিয়া ধন্য হইয়াছে। যে হতভাগ্য কেবল বসন্তের বাহিরের রূপটাই দেখিল তাহার দুর্ভাগ্যের আর অবধি নাই।

রানী সুদর্শনা এমনি একজন হতভাগিনী। তিনি ঋতুরাজের বাহিরটাই কেবল দেখিয়াছেন; তিনি রাজার বাহিরের ঐশ্বর্য দেখিবার জন্য লুব্ধ; বাহিরের সৌন্দর্যের চেয়ে গভীরতর কোনো সত্য তিনি স্বীকার করেন না; তাই তিনি ছদ্মবেশী সুপুরুষ সুবর্ণকে রাজা বলিয়া মনে করিলেন। ইহা তাঁহার লোভের দৃষ্টি।

দাসী সুরঙ্গমার গভীরতর দৃষ্টি আছে। রাজা তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। সে জানে রাজাকে বাহিরে দেখিবার নয়—দেখিলে ভুল হইবে, সে জানে রাজাকে অন্ধকার ঘরের মধ্যে দেখিতে হয়। একসময়ে রাজার প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল—কিন্তু এখন সে একপ্রকার ভক্তি করিতে শিখিয়াছে। তাহার চোখে রাজা কেমন? রানীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলিতেছে:

'হাঁ, তাই বলব—সুন্দর নয়! সুন্দর নয় বলেই এমন অদ্ভুত এমন আশ্চর্য! যখন বাপের কাছ থেকে কেড়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল তখন সে ভয়ানক দেখলুম। আমার সমস্ত মন এমন বিমুখ হ'ল যে কটাক্ষেও তার দিকে তাকাতে চাইতুম না। তার পরে এখন এমন হয়েছে যে যখন সকালবেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁর পায়ের তলায় মাটির দিকেই তাকাই—আর মনে হয়, এই আমার ঢের, আমার নয়ন সার্থক হয়ে গেছে।'

সুরঙ্গমার দৃষ্টিও চূড়ান্ত দৃষ্টি নয়—ইহা ভক্তির দৃষ্টি, সে রাজার পায়ের তলাকার মাটির দিকেই তাকায়, মুখের দিকে নয়; ইহা প্রেমের দৃষ্টি নয় এবং প্রেমের দৃষ্টি নয় বলিয়াই সে রাজাকে যথার্থতম ভাবে বুঝিতে পারে নাই।

এই নাটকে কেবল ঠাকুরদা গোড়া হইতে রাজাকে সত্যভাবে জানেন—কারণ, তাঁহার দৃষ্টি ভালোবাসার দৃষ্টি—তিনি নিজেকে রাজার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাই যখন তিনি গান করেন—

এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ
ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।—

তখন তাহা একাধারে ঋতুরাজ ও তাঁহার রাজার যথার্থ পরিচয় বহন করে। তাই ঠাকুরদা বলেন, 'আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।' অর্থাৎ তাঁহার রাজার বাহিরে পদ্মের কোমলতা ও সৌন্দর্য, আর ভিতরে বজ্রের বিবিক্ত কঠোরতা।

কবি বলিতে চাহেন, ভালোবাসার দৃষ্টিতেই কেবল জগতের ও জগৎপতির সত্য পরিচয় পাইবার উপায়; যে সেই দৃষ্টি লাভ করিয়াছে তাহার কাছে বাহিরের ঐশ্বর্য ও ভিতরের বৈরাগ্য যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তবে অভিজ্ঞতাটি অনেক দুঃখে লাভ করিতে হয়; রাণী সুদর্শনার এই দুঃখের অভিজ্ঞতার দৃষ্টিলাভের ইতিহাসই 'রাজা' নাটকের প্রাণবস্তু।

ইহার আগে দেখিয়াছি, মানুষের জীবনলীলার অনুরূপ কবি প্রকৃতির লীলাতে দেখিয়াছেন। এখানে কিন্তু অর্থদ্যোতনা গভীরতর। এখানে আর মানুষের লীলা নয়—স্বয়ং জগৎপতির লীলার অনুরূপ প্রকৃতির মধ্যে কবি দেখিতে পাইয়াছেন। বিশ্বরাজের অন্তরে বাহিরে ভাবের যে আপাত-বিরোধ, ঋতুরাজের প্রকৃতির মধ্যেও যেন তারই প্রতিধ্বনি; সেইজন্যই বিশেষ করিয়া বিশ্বরাজের রঙ্গমঞ্চের পটভূমিকারূপে ঋতুরাজকে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। পটভূমিকায় ও পুরোভূমিকায় ভাবের ঐক্য ঘটিয়া গিয়াছে।

অন্তর ও বাহিরের যে বিরোধ, ঐশ্বর্য ও সন্ন্যাসের যে বিরোধ তাহা আপাতবিরোধ মাত্র। ঋতুরাজ যথার্থ ধনী বলিয়াই বসন্তের ক্ষণিক উৎসবশেষে ঐশ্বর্যের প্রচুরতাকে নিঃশেষে উড়াইয়া দিয়া কখন একদিন অকস্মাৎ বৈশাখের বীতরাগ গীতহীন শুষ্কতৃণ মাঠের মধ্য দিয়া দগ্ধতাম্র দিগন্তের দিকে এমন অনায়াসে যাত্রা করিতে পারে।

সে যে উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে
ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে

তুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।

বিশ্বরাজের লীলাও অনুরূপ। বাহিরে তাঁহার আলোয় আলোময়—তাহার মধ্যে একটি অন্ধকার ঘরে রাণীর সঙ্গে তাঁহার মিলন; বাহিরে তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য, কিন্তু রানী তাঁহাকে চোখে দেখিতে পান না; বাহিরে তাঁহার অসংখ্য রূপ, অন্ধকার ঘরে রানীর কাছে তিনি অরূপ; তাঁহার ধ্বজার পদ্মের মধ্যে বজ্র আঁকা, তিনি বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদূনি কুসুমাদপি; যে তাঁহার বিরুদ্ধে সাহস করিয়া লড়াই করিতে অগ্রসর হয়, তাহাকেই তিনি সম্মান দেন; তিনি নিজের রাজতক্ত বিদ্রোহী রাজাদের ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ লোকদের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সঞ্চরণ করেন; তিনি নিজের প্রিয়তমা রানীকে অন্ধকার ঘরের নির্বিঘ্নতা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ধুলার উপরে বিশ্বজনের সম্মুখে নিরবগুণ্ঠন নগ্নতার মধ্যে নিক্ষেপ করেন। কারণ, সুদর্শনার প্রভু

'কোনো বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়।' [১]

ফাল্গুনী

ফাল্গুনী ফাল্গুন মাসের নাটক। ইহার পটভূমিকা ও পুরোভূমিকায় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এক হিসাবে পূর্বোক্ত সবগুলি নাটকের চেয়ে ইহার গুরুত্ব বেশি। পূর্বোক্ত নাটকগুলিতে কবি মানুষের লীলা ও প্রকৃতির লীলাতে ঐক্য দেখিয়াছেন; রাজা নাটকে বিশ্বরাজ ও ঋতুরাজের লীলাতে ঐক্য ধরা পড়িয়াছে; ফাল্গুনীতে আর কেবল ঐক্য মাত্র নয়, প্রকৃতির লীলাই যেন মানুষের লীলাকে বুঝিবার উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানবজীবনের সমস্যাকে জাগাইয়া তুলিবার সোনার কাঠি যেন প্রকৃতির শিয়রের তলে রহিয়াছে। এ কথাটির উপরে একটু জোর দিতে চাই। কারণ, আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন মানুষকে বুঝিবার সাধনা করিলেও প্রত্যক্ষত চরম সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই; পরোক্ষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন মাত্র; তিনি প্রকৃতিকে মানুষের বিকল্প, দোসর করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, এবং প্রকৃতির লীলার মধ্যেই মানুষের লীলার ছবি যেন দেখিতে পাইয়াছেন।

১ অরূপরতনের ভূমিকা।

তাঁহর শেষের জীবনের কাব্যসাধনা প্রকৃতিকে মানুষের বিকল্পরূপে দাঁড় করাইতে নিযুক্ত; প্রকৃতির শান্তিসরোবরে সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ ক্ষুদ্র খণ্ড মানবজীবন স্নিগ্ধ হইয়া অখণ্ড পূর্ণতায় প্রতিফলিত হইয়াছে, কবি তাহাই নির্নিমেষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন; প্রত্যক্ষত মানবজীবনের দিকে তাকাইবার আকাঙ্ক্ষা এইভাবে পূরণ করিয়া লইয়াছেন। মানুষের বিকল্প প্রকৃতি হইয়া উঠিবার ইতিহাসে ফাল্গুনী একটি পতাকাস্থান, বা মোড় ঘুরিবার মুখ। বলাকা ও ফাল্গুনী সমসাময়িক; ইহার পর হইতে কাব্যে নাট্যে সঙ্গীতে মানবমুখী কবি প্রকৃতিমুখী হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিমুখিতাও মানবমুখিতা; কারণ, প্রকৃতি মানুষেরই বিকল্প বা symbol।

'ফাল্গুনী নাটকের গঠনপ্রণালী দেখিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইবে। ইহাতে চারটি অঙ্ক, আর প্রতেক অঙ্কের প্রারম্ভে একটি করিয়া গীতিভূমিকা। প্রত্যেক অঙ্কের নাটকীয় পাত্রদের মনোভাবকে গীতিভূমিকার প্রকৃতির সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার এত গুরুত্ব বেশি যে এক-একবার মনে হয়, ফাল্গুনীতে প্রকৃতি আর পটভূমি মাত্র নয়, ইহাই যেন পুরোভূমি, মানুষের লীলাটাই যেন পটভূমিতে গিয়া পড়িয়াছে। ইহা ফাল্গুনীর পক্ষে সর্বতোভাবে সত্য না হইলেও পরবর্তী অধিকাংশ গীতিনাট্য ও কাব্য সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে প্রযোজ্য।

'রাজা। এ নাটকে গান আছে নাকি?

কবি। হাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।'[১]

গীতিভূমিকার ও নাটকের অঙ্কের একটা তালিকা দেওয়া গেল:

নবীনের আবির্ভাব। যুবকদলের প্রবেশ॥ প্রবীণের দ্বিধা। সন্ধান॥ প্রবীণের পরাভব। সন্দেহ॥ প্রত্যাগত যৌবনের গান। প্রকাশ॥

এবার দেখা যাক গীতিভূমিকায় ও নাটকে কি করিয়া মিলিয়া গিয়াছে।

'রাজা। গানের বিষয়টা কি?

কবি। শীতের বস্ত্রহরণ।

রাজা। এ তো কোনো পুরাণে পড়া যায়নি।

কবি। বিশ্বপুরাণে এই গীতের পালা আছে। ঋতুর নাট্যে বৎসরে

---

১ ফাল্গুনীর ভূমিকা।

বৎসরে শীত বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্তরূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন।

রাজা। এ তো গেল গানের কথা, বাকিটা ?

কবি। বাকিটা প্রাণের কথা।

রাজা। সে কি রকম ?

কবি। যৌবনের দল একটা বুড়োর পিছনে ছুটে চলেছে। তাকে ধরবে বলে পণ। গুহার মধ্যে ঢুকে যখন ধরল তখন—

রাজা। তখন কি দেখলে ?

কবি। কি দেখলে সেটা যথাসময়ে প্রকাশ হবে।

রাজা। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয় কি আলাদা নাকি ?

কবি। না মহারাজ, বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলেছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।' [১]

এইভাবে গীতিভূমিকায় ও নাটকে, প্রকৃতি ও মানুষের জীবনে, গানের বিষয়ে আর প্রাণের বিষয়ে ঐক্য সংঘটিত হইয়াছে।

ফাল্গুনীর যুবকের দল চিরন্তন বুড়াকে ধরিবে বলিয়া পণ করিয়াছিল—জীবনের রহস্যগুহার ভিতর হইতে সে যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন দেখা গেল সে চিরন্তন নবীন ; সে আর কেহ নয়, যুবকদলের নবীন সর্দার—শীতের হিমল গুহাটার ভিতর হইতে ঠিক এমনি ভাবেই বসন্ত বাহির হইয়া আসে।

এই যে বসন্ত, এই যে যৌবন, দুটিই এক ; ইহা বাস্তব নয়, বসন্ত ও যৌবনের আদর্শায়িত রূপ। বয়সের যৌবন একবার মাত্র আসিয়া চলিয়া যায়—আর এ যৌবন ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসে, দুঃখের মধ্য দিয়া যখন সে আসে তখন আর যায় না।

ফাল্গুনীর ভূমিকায় যে রাজা আছেন তাঁহার একটি চুল পাকিয়াছিল, তাহাতেই তিনি বৈরাগ্যসাধনের আয়োজন করিতেছিলেন। এমন সময় কবি আসিয়া পাকা চুলটাকে লক্ষ্য করিয়া শুধাইলেন :

'কবি। ওটাকে আপনি ভাবছেন কি ?

রাজা। যৌবনের শ্যামকে মুছে ফেলে শাদা করার চেষ্টা।

১ ফাল্গুনীর ভূমিকা।

কবি। কারিকরের মতলব বোঝেন নি। ঐ শাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রং লাগবে।

রাজা। কই রঙের আভাস তো দেখিনে।

কবি। সেটা গোপনে আছে। শাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।

রাজা। চুপ, চুপ, চুপ কর, কবি, চুপ কর।

কবি। মহারাজ, এ যৌবন ম্লান যদি হল তো হোক না। আর এক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।'[১]

পৃথিবীর যৌবন যেমন শীতের অভিজ্ঞতায় জর্জরিত হইয়া তবেই বসন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করে, মানুষের যৌবন তেমনি জীবনের দুঃখের অভিজ্ঞতা অতিক্রম করিয়া, শাদা চুলের তুষারপাত পার হইয়া নূতন আকারে দেখা দেয়—কবি যাহাকে বলেন চিরযৌবন, যাহা কখনো পুরাতন হয় না—কিংবা যাহা একমাত্র সত্য যৌবন।

কবি সেই যৌবনকে বলিতেছেন আসক্তিহীন যৌবন। সেই যৌবনই সত্যভাবে জীবনকে এবং শিল্পকে ভোগ করিতে জানে, কারণ সে ত্যাগ করিতেও শিখিয়াছে। কবি রাজাকে বলিতেছেন, এই নাটক দেখিবার জন্য তাহাদের আহ্বান করিবেন, যাহাদের চুলে পাক ধরিয়াছে।

'রাজা। সে কি কথা কবি?

কবি। হাঁ, মহারাজ, সেই প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফল্‌তে চায়।'[২]

নাটকের প্রারম্ভে যুবকদলের যে যৌবন তাহা আদৌ আসক্তিহীন নয়, কারণ তখনো তাহাদের দুঃখের অভিজ্ঞতা বাকি আছে। চতুর্থ দৃশ্যে যখন তাহাদের ভালোবাসার পাত্র চন্দ্রহাস গুহার মধ্যে চলিয়া গেল, সন্দেহ ও রাত্রির দ্বিগুণিত অন্ধকারে ভালোবাসার পাত্রকে হারাইয়া যৌবনের আর এক রূপ মাত্র তখনই তাহাদের চোখে পড়িল। এই অভিজ্ঞতারই তাহাদের প্রয়োজন ছিল।

'চলার মধ্যে যদি কেবল তেজ থাকত তাহলে যৌবন শুকিয়ে যেত। তার মধ্যে কান্না আছে, তাই যৌবনকে সবুজ দেখি।

১ ফাল্গুনীর ভূমিকা।
২ ফাল্গুনীর ভূমিকা।

এই জায়গাটাতে এসে শুনতে পাচ্ছি জগৎটা কেবল 'পাবো', 'পাবো' বলছে না, সঙ্গে সঙ্গেই বলছে 'ছাড়বো', 'ছাড়বো'।

সৃষ্টির গোধূলিলগ্নে 'পাবো'র সঙ্গে 'ছাড়বো'র বিয়ে হয়ে গেছে রে—তাদের মিল ভাঙলেই সব ভেঙে যাবে।'

যেমন যৌবন সম্বন্ধে তেমনি বসন্ত সম্বন্ধেও :

'এবার আমাদের বসন্ত-উৎসবে এ কী রকম সুর লাগছে ?

এ যেন ঝরা পাতার সুর।

এতদিন বসন্ত তার চোখের জলটা আমাদের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল।

ভেবেছিল আমরা বুঝতে পারব না, আমরা যে যৌবনে দুরন্ত।

আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলোতে চেয়েছিল।'

এখানে আসিয়া রাজা নাটকের বসন্তে ও ফাল্গুনীর বসন্তে মিলিয়া গিয়াছে :

'ঠাকুরদা। আজ আমাদের নানা সুরের উৎসব—সব সুরই ঠিক একতানে মিলবে।

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে ?
দেখিসনে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে'।

এ যে ফাল্গুনীর ঝরাপাতার সুর।

'বাউল। সে [চন্দ্রহাস] বললে, যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ।'

এ কি রকম বসন্ত ? একই সঙ্গে ঝরাপাতার সুর, কান্নার সুর, আবার লড়াইয়ের সংবাদ ! বিস্ময়ের কিছু নাই। এ বসন্ত যাঁহার প্রতীক তাঁহার ধ্বজায় যে পদ্মের মাঝখানে বজ্র অঙ্কিত।

ফাল্গুনীর যৌবনের দল দুঃখের অভিজ্ঞতার পরে যখন চন্দ্রহাসকে পাইল, ভালোবাসার পাত্রকে পাইল, তখনি যথার্থ পাওয়া; তাহারা চুল না পাকাইয়াও নিরাসক্ত যৌবনের তটভূমিতে আসিয়া পৌঁছিল।

এই নাটকে এক অন্ধ বাউল আছে, একসময়ে সে চোখে দেখিতে পাইত, এখন সে অন্ধ। চন্দ্রহাস তাহার কাছেই বুড়ার সন্ধান পাইয়াছে। সেই বুড়া যখন প্রকাশ পাইল, দেখা গেল সে চিরযৌবন। এই নিরাসক্ত যৌবনের সন্ধান কেবল সে-ই দিতে পারে চোখে দেখার উপরে যাহার ভরসা নাই। রাজা নাটকের রাজাও চোখে দেখিবার নহেন, বরঞ্চ চোখে দেখিতে গেলেই ভুল হইয়া বসে।

এখানেও ভাবের দিকে উভয়ত্র ঐক্য। ফাল্গুনীর নিরাসক্ত যৌবন, যাহা বসন্ত বই আর কিছু নয়, তাহা চোখে দেখিবার নয়। রাজা নাটকের রাজা, যাঁহার প্রতীক বসন্ত, তাঁহাকেও চোখে দেখিবার নয়। দুই নাটকেই দেখি, ঋতুরাজ ও বিশ্বরাজ, মানুষের যৌবন ও পৃথিবীর যৌবন নানা দিক দিয়া ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে, কাজেই নানা ভাবে তাহাদের মধ্যে লক্ষণের একত্ব দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ প্রকৃতি, মানব ও ভগবান আর সমান্তরাল না থাকিয়া একটা আর-একটার উপরে আসিয়া পড়িতেছে, অলক্ষ্যে কথন্ মিশিয়া গিয়া এক বলিয়া মনে হইতেছে, পরস্পরের সান্নিধ্যে নূতনতর অর্থ লাভ করিতেছে—এ এক বিচিত্র লীলা!

কিন্তু ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, এই তিনটির মধ্যে প্রকৃতির গুরুত্বই কবির কাছে বেশি—অন্তত সেই গুরুত্বের দিকেই কবির সাধনা ও শিল্প অগ্রসরশীল।

মূল কাহিনীর রূপান্তর

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনেক নাটকের মূল কাহিনী গ্রন্থান্তর হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধজাতক বা ঐ-জাতীয় প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তাঁহার মূল গল্প সংগৃহীত। কাব্যনাট্য বলিতে আমরা যে-শ্রেণীর রচনা বুঝি তন্মধ্যে কেবল 'সতী'র গল্পাংশ একটি মারাঠি ব্যালাড হইতে এবং 'মালিনী'র গল্পাংশ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'দি স্যানস্ক্রিট বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অব্ নেপাল' নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত। 'লক্ষীর পরীক্ষা'র গল্পাংশ কবির স্বকল্পিত। অবশিষ্ট সমস্তগুলির মূল কাহিনী মহাভারতের অন্তর্গত।

সাহিত্যিকগণ অনেক সময়েই তাঁহাদের রচনার মূল প্রাচীন গ্রন্থ হইতে লইয়া থাকেন এবং নিজের প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে পরিবর্জন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং নূতন অর্থারোপ করিয়া থাকেন। এই সব প্রক্রিয়ার দ্বারা পুরাতন কাহিনী তাঁহার স্বকীয় হইয়া ওঠে এবং এই স্বকীয়তার মধ্যে কবির বিশেষ পরিচয় থাকিয়া যায়। মূল কাহিনীটা অনেক পরিমাণে বাঁশের কঞ্চি-খানার মতো, তাহাকে অবলম্বন করিয়া যে বল্লরী বিতানিত হয়, সেটাই সমালোচকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মহাভারত হইতে কালিদাস শকুন্তলার কাহিনী লইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার শকুন্তলা ও মহাভারতকারের শকুন্তলা স্বরূপত ভিন্ন। মূল কাহিনীকে পরবর্তী কবি যে কেবল নাট্যরূপ দিয়াছিলেন তাহাই নয়, ওই নাট্যরূপের মধ্যে কবির স্বরূপও রহিয়া গিয়াছে। শকুন্তলা নাটকে প্রেমের যে বিচিত্র পরিণাম গ্রথিত, প্রেমকে যে সন্তানমুখী লক্ষ্যে পরিচালিত করিয়া সার্থকতা দেওয়া হইয়াছে তাহা একান্তভাবে কালিদাসীয়। ওখানেই কালিদাসের নিজস্ব পরিচয়।

প্রাচীন কবিগণের সহিত অর্বাচীন কালের কবিগণের প্রধান প্রভেদ এই-খানেই। বেদব্যাস বা বাল্মীকির চেয়ে কালিদাস যে প্রতিভায় উচ্চতর স্তরের ছিলেন এমন নয়। রামায়ণ ও মহাভারতে মহাকবিগণের ব্যক্তিত্বের সন্ধান করিলে হতাশ হইতে হইবে, অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের কালিদাসের কাব্যে কালিদাসের পরিচয় পাওয়া অসম্ভব নয়। আবার আরও অর্বাচীন কালের রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নাটক কালিদাসের শকুন্তলার চেয়ে উৎকৃষ্ট স্তরের রচনা এমন দাবি নিশ্চয় কেহ করিবেন না। কিন্তু চিত্রাঙ্গদায় যে রস আছে, শকুন্তলায় তাহার স্ফুরণ হয়

নাই, শকুন্তলার মূল কাহিনীতে তাহার একেবারেই অসদ্ভাব। শকুন্তলা ও চিত্রাঙ্গদা ঘটনাবিন্যাসে এক না হইয়াও জীবনতত্ত্ব-বিচারে অভিন্ন নয়। দুই-ই প্রেমের বিকাশের, প্রেমের পরিণামের এবং সন্তানজন্ম দ্বারা প্রেমের সার্থকতার কাব্য। কিন্তু তবু কত প্রভেদ! চিত্রাঙ্গদা মনের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বেদনাকে অনুভব করিয়াছে শকুন্তলায় তাহা অজ্ঞাতপ্রায় ছিল, মূল কাহিনীতে কি শকুন্তলার, কি চিত্রাঙ্গদার কোথাও তাহা নাই।

প্রাচীন ও অর্বাচীন কাব্যে মূল প্রভেদটা এইখানে, একটিতে কবির পরিচয় আছে, অপরটিতে নাই বা থাকিলেও নিতান্ত প্রচ্ছন্ন। এমন কি, প্রাচীন ও অর্বাচীন গীতি-কবিতা সম্বন্ধেও ইহা সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য নহে। তবে এখানে আমাদের মুখ্য আলোচনার বিষয় কাব্য ও নাটক। হোমারের কাব্যে আর সকলকেই পাই কেবল হোমারকেই পাই না। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'তে দান্তেকে সর্বাগ্রে পাই—বস্তুত তাঁহার ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই সমগ্রটি হুলিয়া রহিয়াছে। মিল্‌টন যতই নিরপেক্ষতার ভান করুন 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যে তাঁহার পিউরিটান রুচি ও সৌন্দর্যবিলাসী কবিপ্রকৃতি দুই-ই বিদ্যমান। সত্য কথা এই যে, 'প্যারাডাইস লস্টে'র যে দ্বন্দ্ব তাহা দেব-দানবে নয়, মিল্‌টনের দ্বিধাগ্রস্ত প্রকৃতির মধ্যে, তাঁহার পিউরিটান স্বভাব ও কবিপ্রকৃতির মধ্যে। প্রাচীন কাব্য প্রধানত জগন্ময় (Objective), অর্বাচীন কাব্য প্রধানত মন্ময় (Subjective)—পৃথিবীর কাব্যপ্রবাহ জগন্ময়তা হইতে মন্ময়তার অভিমুখে চলিয়াছে।

এখন এই মন্ময়তার প্রভাবে এবং ফলে অর্বাচীন কাব্যে অনেক বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে, প্রাচীন কাব্যে যাহার অস্তিত্ব ছিল না বলিলেও হয়, হয়তো বীজাকারে মাত্র ছিল।

প্রাচীন কবিগণ জগৎ ও জীবনের রাজপথগুলির যাত্রী ছিলেন; গলি, উপগলি ও অন্ধিসন্ধির সন্ধান বড় রাখিতেন না। কাব্যের চরিত্রগুলিকেও তাঁহারা মোটা তুলিতে আঁকিতেন, ছায়াতপের দ্বারা সূক্ষ্ম বর্ণবিলাস ফুটাইবার দিকে তাঁহাদের ঝোঁক ছিল না। অর্বাচীন কালের কবিরা সংসারের রাজপথ ছাড়িয়া গলিঘুঁজি বাহিয়া মানবচিত্তের সূক্ষ্ম রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রাচীনদের এ-সব সূক্ষ্ম কাজের দিকে মন ছিল না। খুব সম্ভব তখনকার সমাজও এ জন্য প্রস্তুত ছিল না। নূতন জায়গায় আসিয়া পড়িলে প্রথমে রাজপথ ও প্রকাণ্ড দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখিতেই সময় যায়। গলিঘুঁজির জ্ঞান বিশেষ পরিচয়ের পরে আসে। প্রাচীন কবিগণ এ-সংসারে নূতন অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন। হোমার রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিন হাজার বৎসর আগেকার লোক, ব্যাস-বাল্মীকি আরও আগেকার, কত হাজার বৎসর কে জানে। তাঁহারা যে-জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে-জগৎ কবির দৃষ্টিতে নূতন ছিল। জীবনের রাজপথগুলি এখন সুপরিচিত ; তাই কবি ও শিল্পীরা ক্রমেই অধিকতর সংকীর্ণ পথে, অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত পথে, অচলিত পথে যাত্রা করিয়াছেন।

রাজপথ সরল, ও প্রশস্ত ; গলিপথ কেবল সংকীর্ণ নয়, সে পথে গন্তব্য স্থলে পৌছিতে হইলে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে হয়, গলিপথের গতি সূক্ষ্ম ও জটিল। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্—মহাভারতের অন্তর্গত গান্ধারীর আবেদনের মূল কাহিনীতে গান্ধারী দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করিবার জন্য আবেদন করিতেছেন—সে আবেদন কত প্রত্যক্ষ, কত স্পষ্ট, কত সংক্ষিপ্ত ও সরল !

"এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে আপনি ঐ কুলপাংশুল দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করুন। হে নরনাথ! আপনি পুত্রবৎসলতাবশত তৎকালে বিদুরবাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই কুলান্তক ফল উপস্থিত হইয়াছে। শান্তি, ধর্ম, ও মন্ত্রিবর্গের পরামর্শানুসারে আপনার যেরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহা যেন অবিকৃত ভাবেই থাকে ; অসমীক্ষ্যকারিতা আপনার নিতান্ত দোষাবহ। ক্রূরহস্তে নিপতিতা হইলে রাজলক্ষ্মী ক্ষণধ্বংসিনী হয় ; কিন্তু সরলের রাজশ্রী পুরুষপরম্পরাক্রমে পুত্রপৌত্রগামিনী হইয়া থাকে।"

এই সরল ও সংক্ষিপ্ত বাক্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর সুদীর্ঘ সূক্ষ্মবেদনাময় বহু অনুভূতির শাখাপ্রশাখা-জালরচিত উক্তির তুলনা করিলেই প্রভেদটা কোথায় বুঝিতে পারা যাইবে।

মূল কাহিনীর ধৃতরাষ্ট্রের উত্তর অনুরূপ স্থূলার্থবোধক। "প্রিয়ে! যদি বংশনাশ হয়, তাহা নিবারণ করিতে পারিব না ; কিন্তু পুত্রেরা যে-রূপ ইচ্ছা করিতেছে, তাহার অন্যথা না হউক; পাণ্ডবদিগের সহিত পুনরায় তাহাদগকে দ্যূতারম্ভ করিতে হইবে।

এ-ধৃতরাষ্ট্র পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার ব্যক্তি। প্রাচীন যুগের মানুষেরা পাথর ছুঁড়িয়া মারিত। ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি প্রস্তরযুগের যোদ্ধাদের অস্ত্রের মতোই স্থূল, কারুকার্যহীন, গুরুভার এবং প্রত্যক্ষফলদায়ী। এমন মোটাতুলির ছবি একালের পাঠক সহ্য করিবে না। একালের পাঠক অনেক দেখিয়া, অনেক ঠেকিয়া সহজরসের নাস্তিকে পরিণত হইয়াছে, তাহার

সন্দেহ ঘুচিতেই চায় না, কজেই অনেক কলাকৌশল, অনেক ছল-ছলনা অবলম্বন করিয়া কবিকে সন্তর্পণে পথ চলিতে হয়। অর্বাচীন কবিদের কাজ বড় কঠিন।

এ তো কালের ধর্ম। অর্বাচীন কালের কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কালের ধর্ম বা বিশেষ স্বভাবের পরিচয় তো থাকিবেই। কিন্তু কেবল ওই-টুকু থাকাই যথেষ্ট নয়, কারণ ইহা তো কালের সামান্য লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবিলক্ষণও থাকা আবশ্যক—এবং অবশ্যই আছে।

চিত্রাঙ্গদা ও বিদায়-অভিশাপ অল্পদিন ব্যবধানে রচিত। এ দুইটি কাব্যনাট্যে কবি নরনারীর প্রেমের বিকাশ, পরিণাম ও সম্ভাবিত দ্বন্দ্বের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই এ-দুটির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিবর্জনাদি ব্যাপারে তাঁহাকে যে পন্থা অনুসরণ করিতে হইয়াছে—পরবর্তী কালের কাব্যনাট্যে তাহা সম্ভব হয় নাই।

পরবর্তী কালের গান্ধারীর আবেদন, নরকবাস, সতী ও কর্ণকুন্তীসংবাদে ধর্মাধর্মের বৈচিত্র্য-পরীক্ষাই কবির লক্ষ্য। ধর্মের স্বরূপকে ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই এই-সব কাব্যে মূলের পরিবর্তন, পরিবর্জনাদি করিতে হইয়াছে। মালিনী কাব্যনাট্যে এই দুটি সূত্র, প্রেম ও ধর্ম গ্রন্থিযুক্ত হইয়া গিয়াছে, কাজেই তাহার ব্যবস্থা আবার বিচিত্রতর, পূর্বোক্ত দুটি হইতেই ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের নিগূঢ় কল্পনা মানবহৃদয়ের মর্ম-প্রবেশিনী দৃষ্টি, তুরীয় রুচি, সূক্ষ্ম সমবেদনা এবং ঘনপিনদ্ধ ভাষা—এ সমস্তই তাঁহার একান্ত নিজস্ব, "মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তার ছবি।" এখন রবীন্দ্রনাথের কালের ধর্মের সহিত তাঁহার নিজস্ব কবিধর্ম যুক্ত করিলেই তাঁহার কাব্যের, এ-ক্ষেত্রে তাঁহার কাব্যনাট্যের স্বরূপ জানিতে পারা যাইবে।

বিদায়-অভিশাপ

কচ ও দেবযানীর উপাখ্যানকে রবীন্দ্রনাথ বিদায়-অভিশাপ নামে অভিহিত করিয়াছেন। মহাভারতীয় মূল কাহিনীকেও কিঞ্চিৎ ভিন্নার্থে বিদায়-অভিশাপ বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কচের প্রণয়লাভে হতাশ দেবযানী বিদায়কালে তাহাকে শাপ দিয়াছে যে,

যে বিদ্যার তরে,
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার

সম্পূর্ণ হবে না বশ, তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

ক্ষুব্ধ নারীচিত্তের আশাভঙ্গকে সম্পূর্ণ মার্জনা করিয়া কচ তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছে যে—

আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে,
ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য সমাপ্ত। এইখানেই দেবযানীর বিদায়-ব্যথার রক্তিম দিগন্তে চিরকালের মতো কচ অস্তমিত হইল। কিন্তু মূল কাহিনীর সমাধান পৃথক্‌রূপ। দেবযানী তাহাকে শাপ দিল যে, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার অপরাধে তাহার সঞ্জীবনী বিদ্যা ফলবতী হইবে না। এই শাপের প্রতিবাদে কচ দেবযানীকে অভিশাপ দিয়া বলিল যে—"তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহা নিষ্ফল হইবে এবং অন্য কোনো ঋষিকুমারও তোমার পাণিগ্রহণ করিবে না।" এইরূপে শাপ-প্রতিশাপে সমাপ্ত মূল কাহিনী দ্বিগুণ অর্থে বিদায়-অভিশাপ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেবযানীর শাপের প্রত্যুত্তরে কচের বরদান।

রবীন্দ্রনাথ কচকে যে মহত্ত্ব দিয়াছেন মূলে তাহা নাই, সেখানে দেবযানী ও কচ দুইজনেই প্রগল্‌ভ। অবস্থা বিচার করিলে দেবযানীকে ক্ষমা করা যাইতে পারে, কিন্তু বিদ্যালাভান্তে স্বদেশে প্রস্থানোন্মুখ কচের কলহপরায়ণতা আদৌ পুরুষোচিত নয়। এই পৌরুষ রবীন্দ্রনাথের দান। বিশেষ, মূল কাহিনীর কচ দেবযানীর অশেষ উপকারের জন্য তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ, তাহার প্রতি প্রেমপরায়ণ নয়, কাজেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করাতে কচের দিক হইতে কোনোরূপ ত্যাগের মহিমা প্রকাশ পায় নাই। রবীন্দ্রকাব্যের কচ গোপনে দেবযানীর প্রতি প্রণয়াসক্ত, কিন্তু কর্তব্যপাশ এমন করিয়াই তাহাকে বাঁধিয়াছে, প্রণয়িনীর আশা পরিত্যাগ করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর নাই। অথচ মূল কাহিনীতে কচ দেবযানীকে গুরুপুত্রী ও সহোদরা জ্ঞান করিয়াছে, তাহাদের বিবাহের বাধা সামাজিক, নৈতিক নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উভয়ের বিবাহের প্রধান বাধা নৈতিক, কর্তব্যবুদ্ধি কচকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে, বাহিরের কোনো বাধা তাহার নাই বলিলেও চলে। বাহ্যবাধানিরপেক্ষ প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে পরিত্যাগ করাতে কচের চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশিত। এ-সব কথা স্মরণে রাখিলে বুঝিতে

পারা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের কচ মূল কচ হইতে অধিকতর মহিমান্বিত।

দেবযানীচরিত্র-অঙ্কনে খুব বেশি কৃতিত্বের দাবি রবীন্দ্রনাথের নাই। মূলের দেবযানী হইতে বিদায়-অভিশাপের দেবযানী অধিকতর ছলাকলাময়ী, মনের বেদনাকে সূক্ষ্মসঙ্কেতময় ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তিও তাহার অধিক, মনোভাবের প্রতিবিম্বরূপে তপোবনপ্রকৃতিকে অঙ্কিত করিয়া দেখাইবার ক্ষমতা তাহার নূতন—এ সমস্তই আধুনিক কালোচিত লক্ষণ। কোনো প্রাচীনকালিনীর পক্ষে ইহা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু এ-সমস্ত দেবযানী-চরিত্রের অনুষঙ্গ মাত্র, তাহার চরিত্রের ভিত্তি দুর্জয় নারীপ্রকৃতি, দুর্দাম প্রণয়পিপাসা, সে প্রগল্‌ভা এবং আশাভঙ্গহেতু নিষ্ঠুরা। প্রাচীন কাব্যে অঙ্কিত সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতির দলভুক্তা সে নয়। এই কারণেই সে বিশিষ্ট, নিঃসঙ্গপ্রায় বলিয়াই সে একান্তভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্রৌপদী অবস্থান্তরে পড়িলে এরূপ হইতে পারিত। গ্রীক নাটকের মীডিয়া ও ক্লাইটেমনেস্ট্রা তাহার উপমাস্থল। মূলে বর্ণিত দেবযানীর অভিমান ও দৈত্যরাজকন্যা শর্মিষ্ঠাকে দাসীত্বে নিয়োগ, সপত্নীরূপে তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য এবং যযাতিকে নিজের পাণিগ্রহণ করিতে অভিনব যুক্তিপ্রয়োগ, এ-সব গুণ 'আদর্শ' নারী-চরিত্রের যোগ্য নয়, এ সমস্তই অর্বাচীন কালোচিত, দেবযানী প্রাচীনতম 'মডার্ণ উওম্যান'। বেচারা যযাতির অপরাধ কি? কূপমধ্যে নিপতিত দেবযানীর হাত ধরিয়া সে উঠিয়াছিল। অমনি দেবযানী বলিয়া বসিল—তুমি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, এখন গ্রহণ না করিলে চলিবে কেন?

দেবযানীর প্রাণধর্মের প্রাচুর্য মূলেই আছে। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বর্জন করেন নাই, কেবল কিঞ্চিৎ নরম করিয়াছেন মাত্র। সুকুমার কাব্যকলার স্বর্ণপিঞ্জরে ঢুকিয়া বনের দুরন্ত বিহঙ্গী কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে, কিঞ্চিৎ সংযত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিদায়কালীন দায়িত্বহীন অভিশাপবাণীতে প্রাণধর্মের প্রবলতা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

চিত্রাঙ্গদা

মহাভারতের আদিপর্বে 'অর্জুনের চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ' নামে অধ্যায়টি ক্ষুদ্র। ইহা হইতে কেবল এইটুকু জানিতে পারা যায় যে, তীর্থপর্যটন উপলক্ষ্যে অর্জুন মণিপুরে উপস্থিত হইয়া রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদাকে বনমধ্যে দেখিতে

পাইলেন। পরে তাহার পরিচয় পাইয়া মণিপুররাজের নিকট গিয়া চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিবার অভিলাষ জানাইলেন। রাজা বলিলেন, তাঁহার পুত্র হইবার কথা ছিল, তৎস্থলে কন্যা জন্মিয়াছে; যদি তাহার গর্ভজাত পুত্র মণিপুর রাজ্যের বংশধর হইবার প্রতিশ্রুতি লাভ করে, তবে অর্জুন বিবাহের অনুমতি পাইতে পারে। রাজা এইরূপ জানাইলে, অর্জুন বাঞ্ছিত অঙ্গীকার করিয়া চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিলেন।

এই সামান্য কাহিনীটুকুর উপরে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কাব্য স্থাপিত। মূলের ঘটনা একটি কাহিনীর কঙ্কাল, রবীন্দ্রনাথ কঙ্কালে প্রাণদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাকে রূপান্তর দিয়াছেন। দেবযানীর মতো চিত্রাঙ্গদাও 'মডার্ণ উওম্যান', তবে প্রভেদ এই যে, মূলের দেবযানী বেগশালী ব্যক্তিত্বময়ী, মূল চিত্রাঙ্গদায় ব্যক্তিত্বের চিহ্নমাত্রও নাই। মূলের নামরূপটিকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি জটিল, বিচিত্রভাববহুল চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

বস্তুত, এই কাব্যখানির পক্ষে মূল কাহিনী প্রায় অবান্তর, কারণ রামজন্মের পূর্বে রামায়ণের মতো কাহিনীটি মনে পড়িবার আগেই কবির মনে কাব্যের ভাবটি উদিত হইয়াছিল; ভাবটিকে ঝুলাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে যখন তিনি একটি অবলম্বন সন্ধান করিতেছিলেন তখন কাহিনীটি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। কবি বলিতেছেন—

'এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল, সেই সঙ্গে মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেকদিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল।' [১]

এইবারে ভাবটি সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

'কেন জানি না হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে, সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার স্ব-রূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এযে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহবিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে

১ সূচনা, চিত্রাঙ্গদা, র-র, তৃতীয় খণ্ড।

ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চরিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।'[১]

এই সূচনা-অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে চিত্রাঙ্গদা কাব্যের প্রকৃত মূল কোথায়। এই কাব্যের মদন ও বসন্ত চরিত্রদ্বয় আসিল কোথা হইতে, চিত্রাঙ্গদার বর্ষকালস্থায়ী রূপলাভের বরপ্রাপ্তি ঘটিল কোন্ প্রয়োজনের সূত্রে, আবার সেই দেবদত্ত সৌন্দর্যের ছদ্মবেশ ছিন্ন করিয়া চিত্রাঙ্গদাই বা কোন্ সাহসে মুক্তিলাভ করিল—সমস্তই সংক্ষেপে এই সূচনাটিতে বিবৃত আছে। বস্তুত চিত্রাঙ্গদা কাব্যের প্রকৃত মূল মহাভারতীয় উপাখ্যানে নয়, কালিদাসের শকুন্তলা কাব্যে—একথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই বলিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের কচ ও অর্জুন দুইজনেই কর্তব্যপরায়ণ বীরপুরুষ। অর্জুনের কর্তব্যবুদ্ধি, ক্ষাত্রধর্ম সুখাবেশে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেও মণিপুর-প্রজাগণের প্রয়োজনের মুহূর্তে জাগিয়া উঠিয়াছে।

দেবযানীর মতো রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদাও প্রগল্‌ভা ও দুর্দম ইচ্ছাশক্তি-শালিনী নারী। কিন্তু অভীষ্টলাভ হওয়াতে দেবযানীর মতো ইচ্ছাশক্তির চরমে যাইবার আবশ্যক তাহার ঘটে নাই, কিন্তু প্রয়োজন হইলে সে যে দেবযানীর সঙ্গে তাল রাখিয়া সঙ্কল্পের শেষসীমা পর্যন্ত যাইতে প্রস্তুত—তাহার প্রমাণ তাহার চরিত্রেই আছে। শকুন্তলা কাব্যে ও চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যে সাদৃশ্য থাকিলেও শকুন্তলা-চরিত্র ও চিত্রাঙ্গদা-চরিত্র ভিন্ন কালধর্মের সৃষ্টি। পুত্রের প্রশ্নের উত্তরে শকুন্তলা বলিয়াছিল—বৎস, তোমার অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা করো। অনুরূপ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা অনুরূপ উত্তর দিত কিনা সন্দেহ। দেবযানী তো নিশ্চয়ই দিত না। তাহারা অর্বাচীন, তাহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগের মানুষ, আর শকুন্তলা সেই প্রাচীন কালের মানুষ, যখন সপত্নীজনের সেবা করিয়া নারীকে পতিগৃহের আদর্শ হইয়া উঠিতে হইত।

গান্ধারীর আবেদন

গান্ধারীর আবেদন সম্বন্ধে বক্তব্য আগেই প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে, মূলে ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় আসল প্রভেদটা

১ সূচনা, চিত্রাঙ্গদা, র-র, তৃতীয় খণ্ড।

কোথায়। মূলে যাহা স্থূল, সংক্ষিপ্ত এবং প্রাচীনকাব্যধর্মী—রবীন্দ্রনাথ তাহাতে সূক্ষ্মতা, জটিলতা ও অর্বাচীন কাব্যধর্ম আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি মূলের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। গান্ধারীর চরিত্র উভয়ত্রই সমরূপ। ধর্মভীরুতা গান্ধারীচরিত্রের স্বরূপ। পুত্রেরা যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে জননীকে প্রণাম করিলে তিনি কখনো বলেন নাই যে তোমার জয় হোক, সর্বদাই বলিতেন ধর্মের জয় হোক। এইরূপ ধর্মনিষ্ঠ জননীর পক্ষেই অধর্মাচারী পুত্রের নির্বাসনপ্রার্থনা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের রচনাতে মূলের এই স্বরূপটি সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।

কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

মহাভারত মহাকাব্যে কর্ণের ন্যায় ট্র্যাজিক চরিত্র আর আছে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও সে অধিরথস্থতপুত্র নামে খ্যাত। অর্জুনের যশে সে ঈর্ষিত, অথচ রাজকুলে জন্ম নহে বলিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত। দুর্যোধনের অনুগ্রহে সে রাজপদ পাইয়াছে, অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার বহুপ্রতীক্ষিত সময় আসন্ন। কিন্তু যে দৈব জন্মমুহূর্তে তাহার অদৃষ্টে ট্র্যাজেডির বীজ বপন করিয়া দিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে নূতন সুযোগ পাইয়া কুন্তীর মুখে তাহাকে জানাইয়া দিল যে, অর্জুন তাহার ভ্রাতা। নিষ্ঠুর নিয়তি তাহাকে ও অর্জুনকে মুখোমুখি করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইল না—উভয়ের ভ্রাতৃসম্পর্ক জ্ঞাপন করিয়া দিল—এমন না হইলে যে ট্র্যাজেডির চরম হয় না।

মহাভারতকার কর্ণ-চরিত্রের ট্র্যাজেডিকে স্থূল ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—ঘটনাবিন্যাসের অপেক্ষা সূক্ষ্মতর উপায় অবলম্বন করেন নাই। প্রাচীন কবিদের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক শিল্পরীতি। রবীন্দ্রনাথ কেবল ঘটনাবিন্যাসই করেন নাই, তাহার চিত্তের ভাবনাবিন্যাসকেও দেখাইয়া দিয়াছেন। এইরূপে ঘটনা ও ভাবনার টানাপোড়েনে রবীন্দ্রনাথের কর্ণ মূলের চেয়ে জটিল, অধিকতর ভাবগ্রাহী—অর্থাৎ আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে।

মূলে দেখিতেছি যে, কর্ণ কৃতঘ্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে ভাবিয়াই কুন্তীর অনুরোধে কৌরবপক্ষ ত্যাগ করিতে সম্মত হয় নাই। কর্ণ বলিতেছে—

'যাহারা স্বামীর নিকট কৃতকার্য হইয়া তাঁহার কার্যকাল উপস্থিত হইলে

উপেক্ষা করে, সেই সকল ভর্তৃপিণ্ডাপহারী পাতকিগণের ইহলোক বা পরলোকে সম্পত্তিলাভ হয় না। অতএব হে আর্যে! আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের হিতার্থ স্বীয় সাধ্যানুসারে তোমার পুত্রগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া সৎপুরুষোচিত অনৃশংস কার্যানুষ্ঠান করিব, আপনার বচনানুরূপ কার্য অর্থকর হইলেও তদনুষ্ঠানে কদাপি সম্মত হইব না।'

পরিষ্কার উত্তর, কিন্তু এ-রকম উত্তর কেবল প্রাচীন কাব্যেই সম্ভবপর ছিল। রবীন্দ্রনাথ অন্নঋণ, প্রভুর প্রতি কর্তব্যের বন্ধন, ক্ষাত্রধর্ম প্রভৃতির উপরেই কর্ণ-চরিত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু তদতিরিক্ত যে ট্র্যাজিক ব্যঞ্জনার আরোপ করিয়াছেন, তাহা একান্তই আধুনিক। আর, ওইটুকু আছে বলিয়াই কর্ণকে কেবল বীর বলিয়া সম্ভ্রম করি না, দুরদৃষ্ট বলিয়াই আপন মনে করি। জন্মমুহূর্ত হইতেই সে দুরদৃষ্টের স্রোতে ভাসমান।

রবীন্দ্রনাথের কর্ণ বলিতেছে—

আজি এই রজনীর তিমির-ফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
চরম বিশ্বাস-ক্ষীণ ব্যর্থতায় লীন
জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম, হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়
সে-পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।

এ-উক্তি নিতান্তই আধুনিক কালোচিত, ইহা একপ্রকার 'অহৈতুক বিষাদ', ইহা হ্যামলেটের বিষাদ বা হ্যামলেটিয়ানা।

মহাভারতের কুন্তী কর্ণকে পরিচয় দিতে আসিয়াছেন কি উদ্দেশ্যে? যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপুত্র-নাশের আশঙ্কাতেই তিনি কর্ণকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিতে আসিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অর্জুনের হাতে কর্ণেরও যে জীবননাশের আশঙ্কা আছে তাহাতে তিনি বড় উদ্বেলিত নহেন। কর্ণ যেমন অভয় প্রদান করিলেন যে, অর্জুন ভিন্ন কুন্তীর অপর চার পুত্রের প্রাণনাশ করিবেন না—অমনি কুন্তী আশ্বস্ত চিত্তে ফিরিয়া চলিলেন। বোধ করি, অর্জুন সম্বন্ধে তাঁহার মনে তেমন উদ্বেগ ছিল না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কুন্তী কেবল স্বার্থবোধেই কর্ণকে ফিরাইয়া লইতে আসেন নাই। তাহার প্রতি যে অন্যায় হইয়া গিয়াছে, সেই অন্যায়ের প্রতিকার করাও তাঁহার একটি উদ্দেশ্য ছিল। এই কানীন পুত্রটির বিচ্ছেদে তাঁহার মাতৃহৃদয়ে দুঃখের অন্ত ছিল না। মূল কুন্তীচরিত্রে সে-ভাব আছে মনে হয় না।

তারপরে মূলের কুন্তী যেমন অবাধে আত্মপরিচয় এবং কর্ণের জন্মরহস্য বলিতে পারিয়াছে তাহা এ-যুগে আর সম্ভবপর নয়। কুন্তী বলিয়াছে—তুমি আমার কানীন পুত্র, আমি কন্যাবস্থায় সর্বাগ্রে কুন্তীরাজভবনে তোমাকে প্রসব করিয়াছি। ভুবনপ্রকাশক ভগবান্ দিনকর আমার গর্ভে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছেন।

অত্যন্ত প্রাঞ্জল, এতটুকু সঙ্কোচ বা দ্ব্যর্থ নাই। এ-সব বিষয় এমন করিয়া প্রকাশ কোনো আধুনিকের পক্ষে সম্ভব নয়—প্রাচীনেরা পারিতেন, তখনকার সমাজকে এতপ্রকার সুকুমার সংস্কারে আচ্ছন্ন করে নাই, সবই খোলাখুলি ছিল। এখনকার সমাজে গাত্রাবরণ, বাক্যাবরণ ও মনের আবরণ সবই তখনকার চেয়ে অনেক অধিক। মহাভারতকার যে-কথাটা এত সহজে এবং এত সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন তাহাই প্রকাশ করিতে রবীন্দ্রনাথকে অনেক সংযম, অনেক আভাস-ইঙ্গিত প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, তৎসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বিষয়টাকে অকথিত রাখিয়া পাঠকের অনুমানের উপরে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। এই রুচিবোধের সৌকুমার্যের কতক আধুনিকযুগীয়, কতক রবীন্দ্রনাথীয়। এ-বিষয়ে তিনি কেবল আধুনিক নন, আধুনিক যুগের চরম দৃষ্টান্তস্থল। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ ও কুন্তী দুই জনেই মূলানুগ থাকিয়াও অর্বাচীন কালের মহাকবির স্পর্শে আধুনিক যুগোচিত সৌকুমার্য, সূক্ষ্মতা ও ভাববিন্যাসের জটিলতা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কর্ণের হ্যামলেটী মনোবৃত্তি-সুলভ 'অহৈতুক বিষাদ' বিশেষ ভাবে আধুনিক যুগের ধর্ম।

নরকবাস

মহাভারতের বনপর্বে সোমক নৃপতির বৃত্তান্ত আছে। এই বৃত্তান্তে আছে যে, সোমক রাজার জন্তু নামে একমাত্র পুত্র ছিল। একদিন সোমক পুত্রের ক্রন্দন শুনিয়া ঋত্বিকসহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, একটি পিঁপড়া তাহাকে কামড়াইয়াছে। তখন সোমক ঋত্বিককে বলিলেন

—একমাত্র পুত্র হইবার কি জ্বালা! কিছুতেই শান্তি পাওয়া যায় না। ঋত্বিক বলিলেন যে, যজ্ঞাগ্নিতে জন্তুর বসার দ্বারা আহুতি প্রদান করিলে শতপুত্রলাভ হইবে। রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন। যথাশাস্ত্র যজ্ঞাগ্নিতে জন্তুর মেদের আহুতি প্রদত্ত হইলে সোমকের শতপত্নী শতপুত্র লাভ করিলেন। জন্তুও প্রধান মহিষীর গর্ভে পুনরায় জন্মিল।

তারপরে যথাকালে প্রথমে ঋত্বিকের ও পরে সোমকের মৃত্যু হইল। সোমক স্বর্গে গমন করিবার সময়ে নরকে ঋত্বিককে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নরকবাসের কারণ জানিতে ইচ্ছা করিয়া অবগত হইলেন যে, সেই যজ্ঞ করাইবার পাপে তাহার এই দশা ঘটিয়াছে। তখন সোমক ধর্মরাজকে বলিলেন—হে ধর্মরাজ! আমার যাজককে এই নরক হইতে বিমুক্ত করুন, আমি স্বয়ং এই নরকাগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিব; ইনি আমার গুরু, আমারই নিমিত্ত এই নরকানলে দগ্ধ হইতেছেন। যম কহিলেন—হে রাজন! একজনের কর্মফল অন্যে ভোগ করিতে পারে না। ঐ দেখ, তোমার সমুদয় সৎকর্মের ফল বিদ্যমান রহিয়াছে। সোমক কহিলেন—এ-ব্রহ্মবাদী ব্যক্তিব্যতিরেকে আমি পবিত্রলোক ভোগ করিতে বাসনা করি না; স্বর্গেই হউক আর নরকেই হউক, আমি ইঁহার সহিত একত্র বাস করিতে বাসনা করি। ইঁহার ও আমার কর্মসকল সমান, অতএব আমাদের দুইজনের পুণ্যাপুণ্যফল সমান হউক। যম কহিলেন—যদি তোমার এইরূপ অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে উহার সহিত সমকাল নরক ভোগ কর, পরিশেষে তোমরা উভয়েই সদ্গতি লাভ করিবে।

ইহাই মূল কাহিনী। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বস্ত ভাবে মূলকে অনুসরণ করিয়াছেন। সোমকের স্বর্গবাস-ইচ্ছা পরিত্যাগ ও স্বেচ্ছায় নরকবাস-ব্রত গ্রহণ মূলানুগ। নূতনের মধ্যে নরকচারী প্রেতগণের সৃষ্টি।

মূলগল্প কাহিনী আকারে কথিত। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে নাট্যরূপ ও নাটকীয়তা দান করিয়াছেন। সোমকের মৃত্যুর পরে স্বর্গগমন-কালে নরকের প্রেতগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে—এখানেই নাটকের ঘটনার স্থান। রবীন্দ্রনাথের নরকের বর্ণনাটি নূতন এবং মনস্তত্ত্বসঙ্গত, প্রেতগণ বলিতেছে,

স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদলোক,
এ নরকপুরী। নিত্য নন্দন-আলোক

দূর হ'তে দেখা যায়, স্বর্গযাত্রীগণে
অহোরাত্রি চলিয়াছে, রথচক্রস্বনে
নিদ্রা তন্দ্রা দূর করি ঈর্ষাজর্জরিত
আমাদের নেত্র হতে। নিম্নে মর্মরিত
ধরণীর বনভূমি, সপ্ত পারাবার
চিরদিন করে গান, কলধ্বনি তার
হেথা হতে শুনা যায়।

একদিকে স্বর্গ, আর একদিকে মর্ত্য, মাঝখানে স্বর্গ হইতে মর্তে যাতায়াতের পথের পার্শ্বে বিষাদলোক নরকপুরী, ঈর্ষাই এখানকার ধর্ম।

এই নরকলোকে সোমক ও ঋত্বিক প্রেতগণের কৌতূহল মিটাইবার আশায় তাহাদের মর্ত্যলীলা এবং ঋত্বিকের নরকে আসিবার কারণ বিবৃত করিয়াছে। তাহাদের প্রদত্ত বিবরণে নাটকীয় লক্ষণ অবিরল। মূল কাহিনার কাঠামো রবীন্দ্রনাথের রচনায় অবিকৃত আছে সত্য, সোমকের স্বেচ্ছায় স্বর্গলাভ-ত্যাগের সঙ্কল্পও মৌলিক—তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বও অল্প নহে। সে কৃতিত্ব কল্পনার ঐশ্বর্যে ও ভাষার গাঢ়বন্ধ সংহতিতে।

বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া

কালমৃগয়া ও বাল্মীকি-প্রতিভার মূল কাহিনী রামায়ণের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ মূল হইতেই তাঁহার নাটক দু'খানির বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মূলের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ এতই শিথিলভাবে যুক্ত, অবান্তর বিষয় এত প্রবেশলাভ করিয়াছে যে, এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক, নাটক দুটি কিংবদন্তীর উপরে নির্ভর করিয়া লিখিত বলিলেও চলে।

মালিনী

রবীন্দ্রনাথের মালিনী নাটকের মূলকাহিনী রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'দি স্যানস্ক্রিট বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অব্ নেপাল' গ্রন্থের 'মহাবস্তুবদান' অধ্যায়ের অন্তর্গত। এই কাহিনীটি পূর্বোল্লিখিত কাহিনীগুলির মতো সুপরিজ্ঞাত নহে বলিয়া সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

এক প্রত্যেক-বুদ্ধ বারাণসীতে ভিক্ষার্থ গিয়াছিল। কিন্তু ভিক্ষা না পাইয়া যখন সে ফিরিয়া আসিতেছে তখন একটি বালিকা তাহাকে নিজের বাড়িতে লইয়া আসিয়া সেবার দ্বারা খুশী করিল। প্রত্যেক-বুদ্ধের মৃত্যুর পরে তাহার সমাধির উপরে একটি স্তূপ রচনা করিয়া দিয়া বালিকাটি মাল্য ও সুগন্ধের দ্বারা তাহাকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিত। বালিকাটি প্রার্থনা করিত, প্রত্যেক পরবর্তী জন্মে সে যেন পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার প্রার্থনা সফল হইল। পরবর্তী জন্মে সে বারাণসীর রাজা কৃকির কন্যারূপে মাল্যচিহ্ন ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম হইল মালিনী। মালিনী কাশ্যপ ও তাহার শিষ্যগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ্য দ্বারা তাহাদের তৃপ্তিসাধন করিল। রাজসভাতে ব্রাহ্মণগণের অসীম ক্ষমতা। তাহারা মালিনীর আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে তাহার প্রতি নির্বাসনদণ্ড-দানের আদেশ দিতে বাধ্য করিল। মালিনী এক সপ্তাহের অবকাশ চাহিয়া লইল। এই সময়ের মধ্যে তাহার পাঁচশত ভ্রাতা, রাজ-অমাত্যগণ, সেনাপতিগণ ও নাগরিকগণ সকলেই আর্যধর্মে দীক্ষা লইল। তাহারা মালিনীকে নিজেদের আধ্যাত্মিক ত্রাতারূপে স্বীকার করিল। তাহারা রুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে অভিযান করিল—ভীত ব্রাহ্মণগণ আসিয়া রাজার আশ্রয় লইল। তাহাদের অনুরোধে মালিনীর নির্বাসনাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইল বটে, কিন্তু তাহারা সকল দুর্গতির মূলস্বরূপ কাশ্যপকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে দশজন সৈন্যকে পাঠাইয়া দিল। ইহারা কাশ্যপ কর্তৃক দীক্ষিত হইল। পরে আরও অধিকসংখ্যক লোক কাশ্যপের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলে তাহারাও আর্যধর্মে দীক্ষিত হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা বুঝিল আর লোক পাঠান বৃথা—কারণ তাহারা বিপক্ষের দলবৃদ্ধিমাত্র করিতেছে। তাহারা নিজেরাই উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত অগ্রসর হইল। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহারা কাশ্যপের আশ্রমের দিকে যাত্রা করিল। কাশ্যপ পৃথ্বী দেবীকে আবাহন করিয়া ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিল। পৃথ্বী একটি তাল গাছ উন্মূলিত করিয়া ব্রাহ্মণ-গণের দিকে নিক্ষেপ করিল—তাহার ফলে সকলে পিষ্ট হইয়া প্রাণে মরিল।

ইহাই মালিনী নাটকের মূল কাহিনী। এই কাহিনী পড়িলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, রবীন্দ্রনাথের মালিনী নাটকের সহিত ইহার সংযোগ নিতান্তই আংশিক। মালিনী কাশীরাজের কন্যা। সে নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। কাশ্যপ তাহার গুরু। রাজকন্যার নবধর্মগ্রহণে রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ

অসন্তুষ্ট হইয়া রাজার নিকটে আবেদন করিয়া তাহার নির্বাসনদণ্ডের আদেশ আদায় করিয়া লইয়াছে এবং এই আদেশের ফলে রাজ্যের একদল মালিনীর প্রতি সমবেদনাশীল হইয়া উঠিয়াছে। মূল কাহিনীর সহিত নাটকের এইটুকু মাত্র মিল। বাকি অংশে যাহার ফলে ঘটনা নাটক হইয়া উঠিয়াছে—সমস্তই কবি কর্তৃক উদ্ভাবিত।

সুপ্রিয় ও ক্ষেমঙ্কর চরিত্র কবির মৌলিক পরিকল্পনা। ইহারাই তো বিদ্রোহী ব্রাহ্মণগণের নেতা। বিদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ রাজকন্যার আনুগত্য স্বীকার করিলে অসহায় ক্ষেমঙ্কর পররাজ্য হইতে সৈন্যসংগ্রহের আশায় প্রস্থান করিল—রাখিয়া গেল সুপ্রিয়কে। ইহার পরে যাহা ঘটিল পাঠকগণ জানেন। মালিনীকে বাদ দিলে সুপ্রিয় ও ক্ষেমঙ্করই নাটকের প্রধান দুইটি চরিত্র—আর নাটকের প্রথম অংশের ব্রাহ্মণ-বিদ্রোহের ঘটনাকে ছাড়িয়া দিলে নাটকের উপসংহারে ক্ষেমঙ্কর কর্তৃক সুপ্রিয়কে হত্যা নাটকের প্রধান ও চূড়ান্ত ঘটনা।

এই ঘটনাটি সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

‘এমন সময়ে স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্য-বোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হ'ল দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।...অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেকদিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হ'ল।’ [১]

কবির উল্লিখিত স্বপ্নাখ্য ঘটনা হইতে শেষতম দৃশ্যটিকে পাইলাম—মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এক বন্ধু কর্তৃক অপর বন্ধুকে হত্যা। এখন এই দুই বন্ধুর নামকরণ করিয়া—স্বপ্নের ইঙ্গিত অনুসারে ঘটনাস্রোতের উজানে গেলেই সুপ্রিয় ও ক্ষেমঙ্করের কাহিনীকে পাওয়া যাইবে। মূল কাহিনীর সহিত স্বপ্নলব্ধ ঘটনার যোগ করিলেই নাটকটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। কেবল বাকি থাকে নাটকের অন্তর্লোকের সংবেদন। সে-সংবেদন মালিনী নাটক গ্রথিত হইবার অনেক আগে হইতেই বাষ্পরূপে কবির মনে একটা আশ্রয়

১ র-র, ৪র্থ খণ্ড, মালিনী, সূচনা।

খুঁজিতেছিল। মালিনীর মূল কাহিনী কবির দৃষ্টিতে পড়িবামাত্র এই ভাব রূপপরিগ্রহ করিল। অনেক শিল্পী রূপ হইতে ভাবে যান, আবার অনেকে ভাব হইতে রূপে গিয়া পৌঁছেন। এই রকমে শিল্পলোকে 'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা' চলিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত ভাব হইতে যাত্রা করিয়া রূপে গিয়া উপনীত হইয়া থাকেন। যে-ভাব হইতে মালিনী নাটকের রূপে গিয়া কবি পৌঁছিয়াছেন তাহার স্বরূপ-ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—

'আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশঙ্করের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকারতত্ত্ব নয় সে, মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসেনি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করেনি। সত্য যার স্বভাব, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক, সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপপ্রকাশ হতে পারে।...এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা সেইটেতেই এর কাব্যরস।' [১]

কাজেই দেখা যাইতেছে, মূল কাহিনী, স্বপ্নলব্ধ কাহিনী এবং এই ভাব-সংবেদন—এই তিনটিকে একত্র গ্রথিত করিলে মালিনী নাটকের সম্পূর্ণ রূপ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, মূল কাহিনীর অতি-প্রাকৃত অংশ, স্থূলত্ব এবং কাশ্যপ কর্তৃক শত্রুগণের হত্যার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বর্জিত হইয়া নাটকখানি স্ফটিকশিলার নির্মলতা ও দীপ্তি লাভ করিয়াছে।

নৃত্যনাট্য শ্যামা

নৃত্যনাট্য শ্যামার কবিপ্রদত্ত পূর্বতন রূপ 'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত 'পরিশোধ' কবিতা। দুইটিরই মূল কাহিনী রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থের মহাবস্তুবদান অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে।

১ র-র, ৪র্থ খণ্ড, মালিনী, সূচনা।

তক্ষশিলাবাসী বজ্রসেন নামে এক বণিক বারাণসীর এক মেলাতে অশ্ব-বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। পথে তাহার সর্বস্ব খোওয়া যায় ও সে নিজে আহত হয়। যখন সে ভাঙা এক মন্দিরে ঘুমাইতেছিল নগরপাল কর্তৃক সে চোর বলিয়া ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার মতো হয়। এমন সময়ে নগরের বারাঙ্গনা-প্রধানা শ্যামার চোখে সে পড়ে। বজ্রসেনের পুরুষোচিত সৌন্দর্যে সে আকৃষ্ট হয়। শ্যামা তাহাকে রক্ষা করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিল। বারাণসীর এক শ্রেষ্ঠীপুত্র শ্যামার রূপে মুগ্ধ ছিল। শ্যামার ইচ্ছায় ও তাহার পরিচারিকার কৌশলে উক্ত শ্রেষ্ঠীপুত্র নিজের অজ্ঞাতসারে বজ্রসেনের পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলে বজ্রসেন মুক্তি পায়।

শ্যামা বজ্রসেনকে ভালোবাসিত, বজ্রসেনও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। কিন্তু উক্ত শ্রেষ্ঠীপুত্রের মৃত্যুর কারণ জানিতে পারায় তাহার মনে শান্তি ছিল না, সে শ্যামাকে ক্ষমা করিতে পারে নাই। একদিন উভয়ে যখন ভ্রমণে বাহির হইয়াছে তখন সে শ্যামাকে মদ্যপানে অচেতন করিয়া গলা টিপিয়া জলে ডুবাইয়া ফেলিয়া রাখিয়া আসে। তাহার ধারণা হইয়াছিল শ্যামা মরিয়াছে। উক্ত স্থানের নিকটেই শ্যামার মা উপস্থিত ছিল। তাহার চেষ্টায় শ্যামা প্রাণে বাঁচিয়া উঠিল। বাঁচিয়া উঠিয়া তক্ষশিলানিবাসিনী এক ভিক্ষুণীর সাহায্যে বজ্রসেনকে সে প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইল।

ইহাই মূল কাহিনী। পরিশোধ কবিতায় ও নৃত্যনাট্যে মূল ঘটনার বিশেষ পরিবর্তন সাধিত না হইলেও নরনারীর ভাবনায় বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রথমত শ্রেষ্ঠীপুত্র উত্তীয় জানিয়া শুনিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে। নিষ্ফল প্রেমের পরিণামস্বরূপ সফল মৃত্যুকে সে আনন্দে গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, বজ্রসেনের দ্বিধা নূতনভাবে কবি কর্তৃক চিত্রিত হইয়াছে। শ্যামাকে সে ভালোবাসে—কিন্তু সেই ভালোবাসার অন্তরায় উত্তীয়ের মৃত্যু। শ্যামাকে আঘাত ও বর্জনের পরে সে যে অনুশোচনা অনুভব করিয়াছে তাহাতে তাহার চরিত্র একরূপ ট্র্যাজিক মহত্ত্ব পাইয়াছে। প্রণয়পীড়িত শ্যামা যখন তাহাকে শেষবারের জন্য প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল—তখন নিজের ক্ষমাহীনতায় ধিক্কৃত হইয়া বজ্রসেন গাহিয়াছে—

প্রিয়ারে নিতে পারিনি বুকে
প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু
পাপেরে ডেকে এনেছি।

জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে-অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজন-শরণ প্রভু॥

প্রেম ও পাপ, বিচার ও ক্ষমার মধ্যে দোদুল্যমান বজ্রসেনের চরিত্র অশ্বত্থপত্রশীর্ষে কম্পমান শিশিরবিন্দুর মতো অসহায় এবং করুণার পাত্র। ইহা সর্বতোভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব, মূলে ইহার কিছুই নাই।

শ্যামার ধর্মাধর্মবিবর্জিত প্রেমের সর্বস্বভাবও রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত। যাহার জন্য শ্যামা নীতিধর্ম এমন অনায়াসে লঙ্ঘন করিল তাহাকে হারাইতে বাধ্য হইয়া শ্যামার পাপের প্রতি নয়, শ্যামার মুগ্ধ নারীহৃদয়ের প্রতি সুকৌশলে কবি পাঠকের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আগেই বলিয়াছি যে, ঘটনার পরিবর্তনে নয়, পাত্রপাত্রীর ভাবনার পরিবর্তনেই মূলের সহিত কবিকৃত কবিতাটি ও নৃত্যনাট্যের প্রধান পার্থক্য।

রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়যোগ্যতা

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির অভিনয়যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণের দেখিবার সুযোগ বড় হয় না, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কখনো কদাচিৎ অভিনীত হয়, কাজেই অভিনয়কালে এগুলি কি রকম দাঁড়াইবে সে বিষয়ে সাধারণের ধারণা নাই। শুধু তাহাই নয়, এগুলিকে রঙ্গমঞ্চে না দেখিবার ফলে সাধারণের মনে এই ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে—রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয়যোগ্যতা তেমন নাই। কথাটার বিচার হওয়া আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটকের রঙ্গমঞ্চখ্যাতি হয় নাই এ কথা সত্য নহে। 'চিরকুমার-সভা' ও 'শেষরক্ষা' পেশাদার রঙ্গমঞ্চে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। একসময়ে 'রাজা ও রাণী' এবং 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র নাট্যীকৃত রূপ রঙ্গমঞ্চের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। পরবর্তী কালে 'বিসর্জন' কিছু পরিমাণে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। তবু স্বীকার করিতে হয় যে, পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সহিত রবীন্দ্র-নাটকের যোগাযোগ আত্মিক নয়, আকস্মিক। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক একসময়ে যে-রকম জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, রবীন্দ্র-নাটক কখনো তেমন দাবি করিতে পারে নাই। আবার, তাঁহাদের নাটকের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের যোগ অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক, জলের সঙ্গে জলচরের যোগের মত; রবীন্দ্রনাথের নাটক সাঁতার-জানা মানুষ, জলে নামিলে ভাসিতে পারে, কিন্তু বেশ বোঝা যায়, ডাঙাই তাহার স্বাভাবিক ক্ষেত্র।

নাটকের অভিনয়যোগ্যতার মূলে থাকে রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা। শেক্সপীয়র, মলিয়ের, ইবসেন, শ' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ ঘটনাচক্রে রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রে স্থাপিত হইয়া উক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ'-র অভিজ্ঞতা পূর্বোক্ত তিনজনের ন্যায় অঙ্গাঙ্গী না হইলেও অকিঞ্চিৎকর নয়। বিশেষ, নাটক লিখিবার আগে দীর্ঘকাল শ' জনসভায় বক্তৃতা করিয়া যে-অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, শ্রোতাদের যে-পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাকে কাজে লাগাইয়া দিয়াছেন। এইজন্যই দেখা যাইবে যে, তাঁহার নাটকের অনেক পাত্রপাত্রী যেন পাবলিক স্পীকার বা গণবক্তা।

গিরিশচন্দ্রকে তো বাংলাদেশের পেশাদার রঙ্গমঞ্চের স্রষ্টা বলিলেই চলে। আবার, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন

পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সহিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ-কথা কোনোভাবেই প্রযোজ্য নহে। বাল্যকাল হইতে ঘরোয়া রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করিয়াছেন, ঘরোয়া বা আধা-ঘরোয়া রঙ্গমঞ্চে তাঁহার নাটকের প্রধান পাত্র-রূপে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, পরবর্তী কালে বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ যে-সব Convention বা সংস্কারকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অনেকগুলিই রবীন্দ্র-নাথ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও পরিকল্পিত সন্দেহ নাই; রবীন্দ্রনাথের দ্বারা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ প্রভাবিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, তিনি নিজে কখনো পেশাদার রঙ্গমঞ্চের দ্বারা অর্থাৎ গণচিত্তের আশা আকাঙ্ক্ষার সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। ইহা গৌরব করিবার বিষয় নয়, নাট্যকারের পক্ষে ইহা একটি অবাঞ্ছিত অপূর্ণতা; শেক্সপীয়র সমকালীন রঙ্গমঞ্চকে যেমন প্রভাবিত করিয়াছিলেন, তেমনি নিজেও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি রঙ্গমঞ্চনিরপেক্ষ নাট্যকার হইলে শেক্সপীয়রীয় মহত্ত্ব লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। গীতিকবি বা ঔপন্যাসিক গণ-সংঘাত হইতে দূরে অবস্থান করিয়া শিল্পসৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে তেমন বিবিক্তভাবে অবস্থান সম্ভব নয়; তেমন ব্যবধান ঘটিলে তাহার শিল্পসৃষ্টি অপূর্ণ হইতে বাধ্য।

গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবনের ইতিহাস ও বিবর্তনের মধ্যে যে একটি মিল আছে এ-কথা আগে অনেকবার বলিয়াছি। এখানে সেই প্রসঙ্গে আরো কিছু বলা যায়। গ্যেটে অনেকগুলি অভিনয়যোগ্য নাটক রচনা করিয়াছেন। (এখানে ফাউস্টের কথা বলিতেছি না।) সে-সব নাটকের প্রাথমিক আত্মপ্রকাশের রঙ্গমঞ্চ ছিল Weimer ডিউকের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ। এই রঙ্গমঞ্চের আদর্শেই ও প্রভাবেই গ্যেটের অধিকাংশ নাটক লিখিত—গ্যেটের নাটকের আলোচনাপ্রসঙ্গে এ-কথা কিছুতেই ভুলিলে চলিবে না। কিন্তু উক্ত রঙ্গমঞ্চকে প্রকৃত অর্থে পাবলিক স্টেজ বলা উচিত হইবে না। যে অর্থে শেক্সপীয়রের রঙ্গমঞ্চ পেশাদার রঙ্গমঞ্চ ছিল সে অর্থে নিশ্চয়ই নয়। ইহা একটি অভিজাত রাজপরিবারের সখের সামগ্রী—ইহার গুণপনা, আবশ্যকতা ও উপকারিতা অস্বীকার না করিয়াও অনায়াসে বলা চলে যে, এ-রঙ্গমঞ্চ সাধারণ দর্শক, নাট্যকার ও অভিনেতার মধ্যে সার্থক ও স্বাভাবিক যোগাযোগ ঘটাইয়া পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিতে পারে নাই। এখন, এই রঙ্গমঞ্চটি গ্যেটের নাটকের আদর্শ ছিল বলিয়াই গ্যেটের কোনো নাটকই নাট্যশিল্পের মানদণ্ডে উৎকৃষ্ট নয়। গ্যেটের নাটকগুলি সাহিত্য হিসাবে

অপূর্ব। তাহাতে কাব্যরস, মানবজীবনের অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র নরনারীর সমবায় আছে সত্য। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নাটক ততোধিক কিছু। সেই ততোধিক কিছুর সৃষ্টি হওয়া একমাত্র সম্ভব সাধারণ রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে।

এবারে রবীন্দ্রনাট্য-প্রসঙ্গে আসা যাইতে পারে। রবীন্দ্র-নাটকের কাব্য-রস, মানবরস, ও বিচিত্র নরনারীর লীলাকে স্বীকার করিয়াও বলা চলে যে, সেগুলি পূর্ণাঙ্গ নাট্যশিল্প নয়। কেন নয়, এতক্ষণে বুঝিতে পারার সম্ভাবনা। এগুলি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অনির্বচনীয় জাদুমন্ত্রের দ্বারা পুষ্ট হইয়া ওঠে নাই। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জাদুপূত হইলেই যে উচ্চশ্রেণীর নাট্যশিল্পসৃষ্টি হয় এ-কথা বলিতেছি না, বলিতেছি যে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রভাবের বাহিরে কখনো পূর্ণাঙ্গ নাট্যশিল্পসৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের নাটক অসাধারণ, কিন্তু ঐ অসাধারণত্বেই তাহার ত্রুটি, সাধারণের নিকট কিছু পরিমাণে নতি স্বীকার করিলে তবেই এগুলি পূর্ণাঙ্গ নাট্যশিল্প হইয়া উঠিতে পারিত। কাজেই, আমার আশঙ্কা এই যে, দেশে যতই শিক্ষা বিস্তারিত হোক, রুচি যতই উন্নত হোক, রবীন্দ্র-নাটক কখনো সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বস্তু হইয়া উঠিবে না। এগুলি অত্যন্ত বেশিভাবে এককের সৃষ্টি। নাটক যৌথ শিল্প, তাহাতে যদি উগ্রভাবে এককের সৃষ্টি হয়, তবে তাহার একঘরে হইয়া থাকার আশঙ্কাই প্রবল।

রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়যোগ্যতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তব্য এবারে বলিতেছি। নাট্যশিল্প প্রধানত তিনটি মূল উপাদানকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট হইয়া থাকে —বক্তৃতা, আবৃত্তি ও কথোপকথন। এ-তিনটিই নাট্যশিল্পের চেয়ে পুরাতন। এই তিনের সমাবেশেই নাট্যশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সব সময়ে যে তিনেরই সমান সমাবেশ হইয়া থাকে এমন নয়। যুগভেদে, সামাজিক অবস্থাভেদে এবং লেখকের প্রতিভাভেদে সমাবেশের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। শেক্সপীয়রের নাটকে তিনেরই সমাবেশ দৃষ্ট হয়। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে বক্তৃতা ও আবৃত্তির প্রাধান্য। কোরাস-পুরোধা ও অন্য পাত্রপাত্রীর সংলাপের মধ্যে কখনো কখনো কথোপকথনের ছাঁচটি ব্যবহৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সংস্কৃত নাটকের মাঝে মাঝে যে শ্লোকগুলি আছে সেগুলি আবৃত্তির ছাঁচে ঢালাই করা।

শীয় (শ'-র) নাটকের প্রধান আদর্শ কথোপকথন, অবশ্য অনেক স্থলে বক্তৃতার ছাঁচও দৃষ্ট হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক প্রধানত বক্তৃতার আদর্শকেই গ্রহণ করিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে বক্তৃতার আদর্শ আছে, আবার কথোপকথনের স্থচারু দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

রবীন্দ্র-নাটকের আদর্শ কি? তিনি বক্তৃতাত্মক আদর্শকে প্রায় সমূলে পরিহার করিয়াছেন। তাঁহার নাটকীয় ভাষার ছাঁচ—হয় আবৃত্তি, নয় কথোপকথন। এখানেও আবার একটি ভাগ করা চলে। তাঁহার পদ্যে লিখিত নাটকের ছাঁচে আবৃত্তির ঢঙ, আর গদ্যে লিখিত নাটকের ছাঁচে কথোপকথনের ঢঙ। এ-দু'টি সরাসরি নিয়ম না হইলেও, যথাসম্ভব এই ধারাকেই তিনি অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ, গান্ধারীর আবেদন, চিত্রাঙ্গদা, মালিনী প্রভৃতি কাব্য-নাট্যের রস আবৃত্তির রস। এ-সব নাটকের ক্ষেত্রে ততোধিক আশা করা উচিত হইবে না। মনোরম কণ্ঠে যথাযথ আবেগ সঞ্চার করিয়া এই-সব নাটক অভিনীত হইলে বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারে বলিয়া আমার ধারণা। যে-ক্ষেত্রে যাহা করা উচিত নয়, তাহাই করিয়া মানুষে অনেক সময় ঠকে। 'মালিনী' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা—ইহাতে আবৃত্তিরস নাট্যরসে গিয়া পৌছিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়াই রঙ্গমঞ্চ যে ইহার আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র এমন মনে করি না। বেতার রঙ্গমঞ্চ ইহার যোগ্যতর স্থান। কিন্তু মনে হয় যে, ইহার প্রশস্ততম স্থান 'টেলিভিশন' রঙ্গমঞ্চ। বেতারে শুধু আবৃত্তিকেই পাওয়া যাইবে, দৃশ্য-অংশ বাদ পড়িয়া যাইবে, 'টেলিভিশনে' সেই ত্রুটির সংশোধন হইবে। অথচ টেলিভিশনের রঙ্গমঞ্চ সাধারণ রঙ্গমঞ্চ নয়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ অভিনয়-কালে সহস্র দর্শকের মতামতের দ্বারা অদৃশ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত। টেলিভিশন-রঙ্গমঞ্চ সে-প্রভাবমুক্ত। তাহা এককের বিলাসক্ষেত্র; আর রবীন্দ্রনাথের নাটকও যে অত্যন্ত একাগ্রভাবে এককের সৃষ্টি। কাজেই সেক্ষেত্রে দুইয়ের সার্থক যোগাযোগ হইবে বলিয়া ধারণা।

বাল্মীকি-প্রতিভার গানগুলি সুরে গেয় হইলেও তাহার ছাঁচটা আবৃত্তি-মূলক। এ-কথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করিয়াছেন।

ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্যের মূল ছাঁচ অবশ্য বক্তৃতা, আবৃত্তি বা কথোপকথন নয়, এমন কি সঙ্গীতও নয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। এগুলির মূল ছাঁচ নৃত্য। অর্থাৎ 'দেহ গানে'র ভাষাতেই এগুলির যথার্থ রসোদ্বোধন। কাজেই আগে যে-তিনটি ছাঁচের কথা বলিয়াছি নৃত্যনাট্য ও ঋতুনাট্যের বিচার সে-আদর্শে করা চলিবে না।

একজন বিখ্যাত ইংরাজ মনীষী মালিনী নাটকের সঙ্গে গ্রীক ট্র্যাজেডির ঐক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সে বোধ করি এই জন্যই যে, আবৃত্তির আদর্শে ঢালাই করা গ্রীক ট্র্যাজেডির সঙ্গে আবৃত্তিমূলক মালিনীর মিল তাঁহার চোখে পড়িয়া থাকিবে। অভিনয়ের ক্ষেত্রকে যদি প্রশস্ততর করিয়া লইয়া আবৃত্তিকেও তাহার অন্তর্গত করি, তবে মালিনীর মতো কাব্যনাটকের অভিনয়যোগ্যতা সম্বন্ধে আর সন্দেহের কারণ থাকে না। দেশে শিক্ষাবিস্তার ও রুচির উন্নয়নের সঙ্গে এই ব্যাপারটাই ঘটিবে বলিয়া আমার ধারণা। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটক, যেমন কাব্যনাটকগুলি, আবৃত্তিমূলক অভিনয়ের দ্বারা, বেতারে, টেলিভিশনে এবং বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর আসরে একটি মনোহর পদবী লাভ করিবে, কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চের নিত্যকার ভোজ্য হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয় না। এই-সব রবীন্দ্র-নাটক যখন উল্লিখিত পদবী লাভ করিবে তখন আমাদের রসাস্বাদনের একটা নূতন ক্ষেত্র-সৃষ্টি হইবে এবং যোগ্য অভিনেতাদেরও আত্মপ্রকাশের একটা নূতন পন্থা পাওয়া যাইবে।

গদ্যনাটকাশ্রিত কথোপকথনমূলক রীতি সম্বন্ধে বর্তমান খণ্ডে কিছু বলা উচিত হইবে না, ভবিষ্যতে বলিব, আশা রহিল।

নির্ঘণ্ট

বিষয় ও পত্রাঙ্ক

বিষয় ও পত্রাঙ্ক

বিষয় ও পত্রাঙ্ক

বিষয় ও পত্রাঙ্ক

বিষয় ও পত্রাঙ্ক

বিষয় ও পত্রাঙ্ক

বিষয় ও পত্রাঙ্ক

বিষয় ও পত্রাঙ্ক